পারীর পতন

পারীর পতন

১৯৪২-এর স্টালিন-প্রাইজ প্রাপ্ত উপন্যাস

ইলিয়া এরেনবুর্গ

অনুবাদ করেছেন

অনিলকুমার সিংহ



ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৩০ চৌরঙ্গী রোড : কলিকাতা

তৃতীয় খণ্ড
প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫০
প্রকাশক
সুনীলকুমার সিংহ
ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা
মুদ্রাকর
কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮-ই ডেকার্স লেন
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট
মাখন দত্তগুপ্ত
ব্লক নির্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১ কলেজ স্ট্রীট
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৬১-১ হ্যারিসন রোড
কলিকাতা
দাম চার টাকা

তিন খণ্ডে সমাপ্ত



তৃতীয় খণ্ড

নিষ্প্রদীপ শহরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছে লুসিয়ঁ...অত্যন্ত অস্বাভাবিক চলার গতি, যেন কোন অপরিচিত পথ দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলেছে। ঝির ঝির করে জল পড়ছে হালকাভাবে। প্লেন গাছের কালো কালো পাতার মাঝখানে রহস্যজনকভাবে আলো জ্বলছে...ছোট ছোট নীল আলো। লুসিয়ঁর মেজাজ মোটেই ভাল নেই। দু-একদিন আগে পর্যন্ত সে ভেবেছিল যে যুদ্ধ হবে না; একমাত্র তার বাবাই মন্ত্রিত্ব-সংকট ঘটানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু এখন কী আশ্চর্য! গুজব রটে গেছে যে ম্যাজিনো লাইনের ধারে ইতিমধ্যেই গোলাগুলি চলছে। আগামীকাল বিকেলেই লুসিয়ঁকে সৈন্য-সংগ্রহ কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু কিসের জন্যে যুদ্ধ করতে যাবে সে? পোলাণ্ডের মসিয়ঁ বেকের জন্যে? তার বাবার কথা মত 'মানবিক মর্যাদার' জন্যে? সে তো মরেও যেতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও আরও মারাত্মক জিনিস আছে। ট্রেঞ্চ, কর্পোরালের ইতর ব্যবহার আর একটানা চল্লিশ মাইল মার্চ...এসবের চেয়ে অপ্রীতিকর আর কি হতে পারে?

তাছাড়া কী সাংঘাতিক বিরক্তিকর!

লুসিয়ঁ শব্দ করে হাই তুলল। একটি মেয়ে তাকে ডাকছে, 'এ্যাই, ফূর্তি করবে নাকি একটু?' লুসিয়ঁ হাসল। ওরা কালক্ষেপ করছে না একটুও...গ্যাস-মুখোশ পরে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত রূপজীবীরা।

'তোমরা দেখছি যে যার কাজকর্মে লেগে গেছ ঠিকমত।' লুসিয়ঁ বলল। ওদের দলের মধ্যে থেকে একজন মেয়ে মুখ খুলে গালাগালি করল বিশ্রী রকম।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে মদের দোকানে গিয়ে ঢুকল লুসিয়ঁ। লোকগুলো একধার থেকে চিৎকার করছে আর মদ গিলছে। দোকানের কর্ত্রীর চোখে জল। সশব্দে গ্লাশগুলো সে তুলে দিচ্ছে খরিদ্দারদের হাতে।

'আপনার স্বামীর কী খবর?'

'আজ চলে গেছেন তিনি।'

একজন সব্‌জিওলা 'রাম্‌' খেতে খেতে চিৎকার করে উঠল, 'না, না, তোমায়

বলতে হবে না যে এই যুদ্ধের দরকার আছে কি নেই। জাহান্নমে যাক পোলরা!'

একসঙ্গে সবাই সায় দিল শব্দ করে।

'যদি ইংরেজরা যুদ্ধ করতে চায়, করুকগে তারা!'

'আর একথা তো সবাই জানে যে তেসা দশ লক্ষ ফ্রাঁ হাতিয়েছে।'

আলোচনার মধ্যে লুসিয়ঁ অংশ গ্রহণ করল না। মদ খেতে খেতে সে শুধু নিঃশব্দে গজরাতে লাগল। তারপর সে দেখা করতে গেল জেনীর সঙ্গে। তাকে বিদায় জানানো দরকার। আর দরকার কয়েক হাজার ফ্রাঁ। আগামীকাল সে সারাদিন মদ খাবে। তাছাড়া সৈন্য হলেও কিছু টাকা তার সঙ্গে থাকা দরকার। সৈনিকের সামান্য মাইনেতে তার চাহিদা মিটবে না।

জেনীকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাল। তবু লুসিয়ঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কার্পণ্য করল না সে। তার কাছে সমস্ত কিছু অদ্ভুত মনে হচ্ছে। স্বাধীনতা রক্ষা করতে যুদ্ধে যাচ্ছে লুসিয়ঁ কিন্তু এদিকে পারী ধ্বংস হয়ে যাবে; গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাবে লুভ্র্-এর অস্তিত্ব! লুসিয়ঁর গলা জড়িয়ে ধরে জেনী বলল, 'প্রত্যেককে কিছু না কিছু করতে হবেই। আমি তোমার জন্যে কতকগুলো গরম কাপড়জামা কিনে এনেছি...'

পশমের পটি দেওয়া জামা দেখে কিছুটা বিরক্ত হল লুসিয়ঁ, 'শ্রীমতী, এ হল একজন অফিসারের সাজপোষাক। আমি হলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন সৈন্য মাত্র। তাছাড়া এতো কেবল সেপ্টেম্বর মাস। শীত আসতে আসতে শেষ হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।'

'লুসিয়ঁ, তোমার গ্যাস-মুখোশ আছে তো? জার্মানরা আজ হয়ত পারীর ওপর হামলা করবে। আমি একটা আনতে গিয়েছিলাম কিন্তু বিদেশী বলে দিল না ওরা। ওষুধের দোকানী একরকম জিনিস দিয়েছে আমায়; গ্যাস আক্রমণ হলেই রুমালে ছিটিয়ে নিতে হবে সেই ওষুধ। এই সেই ওষুধ।'

'শিশিটা কিন্তু খুব চমৎকার। 'কোটি'র সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করলেই পারো? আমি বলি—দীর্ঘজীবী হোক এই সুগন্ধ। ট্রেঞ্চের মধ্যে উকুনরা খুব সুগন্ধ বিলোবে, কি বল?'

ভাঙা গলায় 'পারী আজো সেই পারীই আছে' গানটা গাইতে আরম্ভ করল লুসিয়ঁ। কানে আঙুল দিল জেনী; ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হয়ে এল তার মুখের ভাব।

'লুসিয়ঁ, সত্যি করে বল, ভয় পেয়েছ তুমি ?'

'না, না, শুধু বিরক্তি লাগছে এই যা।'

'কিন্তু ন্যায় তো আমাদের দিকে ?'

দোকানে বসে শুধু শুধুই চার গেলাশ মদ টানেনি সে। এবার সে চিৎকার করে হেসে উঠল। তার স্বাভাবিক ম্লান মুখ লাল হয়ে উঠল ধীরে ধীরে।

'ন্যায় ? এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো, আমি সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমায়।'

বিছানা থেকে ঝালর দেওয়া চাদরটা তুলে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর চাপাল লুসিয়ঁ। তারপর জেনীর টুপিটা মাথায় দিয়ে, বুকের ওপর হাত রেখে বিড়বিড় করতে শুরু করল :

'বৎসগণ, ব-নে ও তেসার ঘাড়ে পবিত্র আত্মা এসে ভর করেছে। বীর শহীদ বেককে সাহায্য করতে চলেছি আমরা। পার্থিব জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সেই ব্যক্তিটি তেসেন-এ বসে বসে মেরীমাতাকে স্বপ্নে দেখেছেন! সাধু সেবাস্টিয়ান—যিনি এ জগতে মার্শাল গোয়েরিং নামে খ্যাত—তাঁর সঙ্গে তিনি বিয়ালোভেজ্স্কি বনে একসঙ্গে উপবাস করেছেন। কিন্তু এখন মহাপুরুষটি বেকের কাছ থেকে ডানজিগ কেড়ে নিতে চান। পাপীর দল, অনুতপ্ত হও! পল তেসা মানবপুত্রকে ত্রাণ করতে আসছেন। আমেন!'

জেনী কিছুই বুঝতে পারল না। বেক কে ? আর তেসেনই বা কোথায় ? জেনী কখনো দৈনিকপত্রিকা পড়ে না, আর রাজনীতি সম্পর্কেও কোন ধারণা নেই। কিন্তু সে এটুকু বুঝল যে লুসিয়ঁর এই ভাঁড়ামির মধ্যে একটা বিরাট দুঃখ লুকিয়ে রয়েছে। নিঃশব্দে বসে বসে তারা কফি খেল। এক সময়ে ভয়ে ভয়ে জেনী জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না যে এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ ?'

'কি স্বাধীনতা ?'

'জানি না। সাধারণত স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তাই। ধরো খবরের কাগজে খুশিমত লেখা লিখতে পারা।'

লুসিয়ঁ হাই তুলল, 'গতকাল জোলিও ছিল 'লাল', আজ সে বরফের মত শাদা। কাল হয়ত দেখব সে ঘোর বেগুনী। কী বিরক্তিকর।'

খানিকটা চিন্তা করে জেনী বোকার মত বলল, 'তাহলে তো বিপ্লবের দরকার।'

রীতিমত চটে উঠল লুসিয়ঁ। এই কথাটার জন্যে সে কত হাঙ্গামাই না

সয়েছে। 'মেজোঁ দ্য কুলতুর'-এ যোগ দিয়েছে, প্রবন্ধ লিখেছে, বই ছাপিয়েছে আর বাবার সঙ্গে তর্ক করেছে। আর এখন এই বোকা মার্কিন মেয়েটা বিপ্লবের কথা বলতে আসছে তাকে।

'তোমরা নিজেরাই একটা বিপ্লব করো। আমরা চার চারবার বিপ্লব করেছি নিজেদের দেশে। আমি যা করবার তা করেছি। এখন যাও, তৈরী হও, শুতে যেতে চাই আমি।'

রাত্রে সাইরেনের কান্না শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠল লুসিয়ঁ। জেনী ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, ড্রেসিং গাউনের চওড়া আস্তিনের মধ্যে দিয়ে হাতগুলো গলাতে পারছে না পর্যন্ত। লুসিয়ঁ পাশ ফিরে শুলো। তার ভারী বয়ে গেছে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে! জেনী তাকে অনেকবার নীচের তলায় নিয়ে যাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত কে একজন দরজায় ধাক্কা দিল, 'বেরিয়ে আসুন।'

'চুলোয় যাও!' লুসিয়ঁ জবাব দিল।

'আমি এয়ার রেড ওয়ার্ডেন।'

অবশেষে তারা নীচে নামল। নীচের ঘরে ডোরা-কাটা পায়জামা পরা উস্কোখুস্কো পুরুষ আর অর্ধ-নগ্ন স্ত্রীলোক...দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় যেন। দাড়ি-না-কামানো এয়ার রেড ওয়ার্ডেনটি বার বার চিৎকার করতে লাগল, 'চুপ! চুপ! যে যার গ্যাস-মুখোশ নিয়ে তৈরী থাকুন।' তার নির্দেশ পেয়ে ছোট্ট সহকারী ওয়ার্ডেনটি দেওয়ালে জল ছিটোতে লাগল। নিজের ছেলেমেয়েদের বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ করে আনতে আনতে একটি স্ত্রীলোক টেনে টেনে নিশ্বাস নিল। গুজব রটল যে পাশের রাস্তায় বোমা ফেটেছে একটা। জেনী তার রহস্যজনক ওষুধ আর ঝালর দেওয়া রুমালটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। ভীড়ের মধ্যে একটি মেয়ের কাঁধ দুটো কী আশ্চর্য সুন্দর! লুসিয়ঁ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আর ভীড় ঠেলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সরে গেল মেয়েটি।

'মাদাম, এ হল যুদ্ধের সময়।' লুসিয়ঁ ভীষণ চটে গেছে।

হিংসায়, ভয়ে আর লুসিয়ঁর সঙ্গ হারাবার দুঃখে চক্ চক্ করছে জেনীর চোখ দুটো। কিন্তু লুসিয়ঁ হাই তুলে চলেছে থেকে থেকে।

রাত্রের বিচিত্র ঘটনার জন্যে তার ভাল ঘুম হয়নি। সকালে লুসিয়ঁ অত্যন্ত ঘুম-ঘুম বোধ করছে, আর মেজাজটা চটে আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে হল্লা করছে একটি স্ত্রীলোক। তার মদের দোকান আছে একটা। লোকে সেই দোকানটাকে বিমান-আক্রমণ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।

'আমি নিজে গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব।' স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে চলেছে। 'ওরা বলছে ফ্রান্সকে মজবুত করে গড়ে তোলা দরকার। তাই যদি হবে তাহলে ব্যবসা বাণিজ্যে নাক ঢোকাতে আসবার কী দরকার? আমি দোকান খালি করব না, বুঝতে পারলে? মরে গেলেও না।'

লুসিয়ঁ তার কোঁচকানো টুপিটা তুলে দিতে লাগল।

'চমৎকার!' সে বলল, 'রাসীনের শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনাদের সমতুল্য বটে! নাগরিকগণ, অস্ত্র ধারণ করো।'

কী পুতুল নাচের খেলাই না চলেছে!

২

প্রতি রাত্রে সাইরেনের চিৎকারে পারীর লোকরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কেউ কেউ বলে তারা বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ী পর্যন্ত দেখে এসেছে। কিন্তু তেসা হেসে বলেছে, 'এটা শুধু একটা সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা। জার্মানরা সীমান্ত ডিঙিয়ে উড়ে আসা মাত্র আমরা সংকেতধ্বনি দিই। এ থেকে পারী আত্মত্যাগের শিক্ষা নিতে পারে।' বহুলোক রাজধানী ছেড়ে যাওয়াই সমীচীন মনে করল। বড় লোকদের অঞ্চল একেবারে জনশূন্য; শুধু নরমাণ্ডি আর ব্রিটানির উপকূলস্থ স্বাস্থ্যনিবাসে লোকের ভীড়। 'সৈন্যরা' পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এদিকে বুর্জোয়ারা দলবেঁধে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম মুখো।

মতিনি তার পরিবারকে ওভের্ঞ্-এ পাঠিয়ে দিল। 'কী চমৎকার জায়গা! একশো মাইলের মধ্যে একটা কলকারখানা নেই কোথাও।' সে বলল। নিজের সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা করে সে মন দিল অন্য একটি আরো জটিল কাজে। নিজের সমস্ত পুঁজি আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে শুরু করল। খবরটা দুকানের কানে যেতেই 'একজন অসৎ ফরাসী' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখে বসল সে। কিন্তু সেন্সারে আটক পড়ল সে প্রবন্ধ...সংবাদপত্রের দুটো শাদা কলমে ছেপে বেরুল শুধুমাত্র একজোড়া কাঁচির ছবি। দুকানের আক্রমণের কথা জানতে পেরে রাগে জ্বলে উঠল মতিনি; বলল, 'ও কি মনে করে

যে দাড়ি হয়ে উঠেছে? আমার নিজের সম্পত্তি, যা শুধুমাত্র আমার ছাড়া আর কারও নয়, তা আমি বাঁচাতে চাই। আমি ধ্বংস হয়ে গেলে ফ্রান্সের কি কিছু লাভ হবে?'

পলেৎ স্থির করল সে মধ্য-ফ্রান্সে মরভাঁতে তার খুড়িমার কাছে চলে যাবে। গ্যাস-আক্রমণে তার ভীষণ ভয়। তেসা কিন্তু বিচলিত হয়ে পড়ল। এই দুর্দিনে কোন স্ত্রীলোকের ভালবাসার সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত হওয়া ভয়ানক কথা!

'তুমি আমায় একলা ফেলে চলে যেতে চাও?' তেসা প্রতিবাদ জানাল।

'পল, আমি বীরাঙ্গনা নই।'

'তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ওরা এখানে উড়ে আসবে না। তলে তলে একটা বোঝাপড়া আছে। ওরা যদি পারী স্পর্শ করে, আমরা বার্লিনে বোমা ফেলব। এবং তাতে কোন সুবিধে হবে না ওদের।'

পলেৎ কেঁদে ফেলল, 'কেন, কেন তুমি এই যুদ্ধ ডেকে আনলে?'

'আমি?' বিরক্তিতে কেঁপে উঠল তেসার কণ্ঠস্বর। 'তুমি কী করে এ কথা বলছ? তুমি জানো আমি কেবলমাত্র একটা জিনিস চেয়েছিলাম এবং তা হল শান্তি। কিন্তু আমরা কি করব? উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ওরা।'

পলেতের কাঁদুনি থামল না, 'লোকগুলোকে মরতে পাঠাচ্ছ কেন তাহলে?'

'কেউই মরতে যাচ্ছে না। একমাত্র পোলরাই যুদ্ধ করছে...এটা তাদের ব্যাপার। এ হল ডানজিগ, স্ট্রাস্‌বুর্গ নয়, বুঝলে? অবশ্য ম্যাজিনো লাইনে কয়েকজন দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখ শান্তির সময়েও তো কত লোক রাস্তায় মারা যায়! তোমার বোঝা উচিত যে সব কিছু বদলে গেছে আজকাল। পুরনো দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে চলবে না। আগে যুদ্ধ বলতে যা বুঝতাম সে অর্থে এটা যুদ্ধ নয়। আমাদের আছে ম্যাজিনো লাইন, আর সিগফ্রিড লাইন আছে ওদের। কোন পক্ষই একচুলও এগোতে পারবে না। সুতরাং দু পক্ষই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আমার আমালি বলত, 'আলমারীর মধ্যে চিনেমাটির কুকুরের মত।' পোলরা আশ্চর্যরকম আত্মরক্ষা করছে। আমি চিরকালই বলেছি ওরা বীরের জাত। বসন্তকাল পর্যন্ত কিংবা আরো বেশী দিন ওরা যুঝতে পারবে। ইতিমধ্যে আমরা ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে নেব। তারপর জার্মানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবেই। সুতরাং আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বুঝলে?'

'যাই হোক, ভয়ানক ব্যাপার কিন্তু! বিশেষ করে এই নিষ্প্রদীপের সময়ে। আর রাতের দিকে সাইরেন বাজে ককিয়ে ককিয়ে।'

পলেতের অশ্রুসজল চোখ দুটো তেসার কাছে অনেক বেশী সুন্দর মনে হল। তার ছোট্ট পাখীর মত মাথাটা চেপে ধরল পলেতের বুকের মধ্যে।

'চলে যেও না, লক্ষ্মীটি! আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি। কী ভয়ানক কাজে জড়িয়ে পড়েছি, তা তুমি ভাবতেও পার না। আগামী কয়েকটি সপ্তাহের মধ্যেই সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তুমি তো বললে, কিছুই হবে না।'

তেসা হাসল, 'ছেলেমানুষি কোরো না। কিছু হবে না তো নিশ্চয়ই। ঘরোয়া ব্যাপারের কথা বলছি। চেম্বারের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অবশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করা কি ঝকমারি ব্যাপার জানো? কিন্তু এ সাধারণ পুলিশের কাজ নয়। একটা বড় রকমের আন্দোলন দরকার। আর দরকার নেপোলিয়ঁর মত একজন করিৎকর্মা লোক। আমরা অবশ্য ওদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবই শেষ পর্যন্ত।'

টান টান হয়ে উঠল তার মুখের রেখা। সে ভাবল, সে যেন তার নাগরিক কর্তব্য পালন করছে। কেউ কি জানে সে দেনিসকে কত গভীর ভাবে ভালবাসে? তবুও সে ফ্রান্সের শত্রুদের দলে যোগ দিয়েছে! তেসা তার সমস্ত অন্তর থেকে মুছে ফেলেছে তার পিতৃত্ববোধ।

হঠাৎ চাপা গলায় হেসে উঠল তেসা, 'একটা বড় মজার কথা বলছি শোন। ভাবতে পারো আগামীকাল আমি কি করব? তুমি কখনো বলতে পারবে না। সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে একটা পবিত্র ধর্মোৎসবে যোগ দিতে হবে। আমায় কখনো হাঁটু গেড়ে বসতে দেখেছো! কী রকম মজার ব্যাপার, না!'

পলেৎ জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। ছোটবেলা থেকে তেসা গির্জার চৌকাট ডিঙোয়নি। ধর্ম সম্পর্কিত সব কিছুই সে ঘৃণা করে এসেছে। যখনই সে কাউকে ঠাট্টা করতে চায়, সে বলে—'লোকটার গা থেকে ধূপের গন্ধ বেরুচ্ছে।' পাদ্রীদের দেখে সে বলে 'দাঁড় কাক'। এমনিভাবে বহুবার সে আমালিকে মর্মাহত করেছে।

তার মতে একমাত্র বুড়ীদেরই গির্জায় যাওয়া উচিত কিন্তু যখন পুরুষদের এমন

কি সৈন্যদের পর্যন্ত সে উপাসনা করতে দেখল তখন সে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল। গির্জার ভেতরকার সেই আবছা অন্ধকার এবং ম্লান মোমবাতি দেখে আমালির কফিনের চারপাশের সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়ল। হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ দেখাল তেসাকে। গায়কদের মৃদু কণ্ঠস্বর এবং রঙিন জানলা থেকে চুঁইয়ে পড়া সূর্যের আলো তাকে 'হৃত স্বর্গের' কথা মনে করিয়ে দিল। তেসা বুঝতে পারল সেই ভাষা, তার আমালি, তার ছেলেমেয়ে, তার শান্তি সমস্ত কিছু হারিয়েছে সে। অবশ্য এই উৎসব একটা কুসংস্কার মাত্র। কিন্তু মাঝে মাঝে এই ক্ষুদ্র হানাহানি থেকে বেরিয়ে নিজেকে ভুলে থাকতে অনেক ভাল লাগে। স্ফীতকায় ধর্ম-যাজকের দিকে তাকিয়ে দেখল। লাল শিরাগুলো তার মুখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। চোখ দুটো কেমন বিষণ্ণ আর ধারালো। অন্য সবার মত ধর্ম-যাজককেরও ভাবনা চিন্তা থাকার কথা। তাকেও পোপ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। জীবন হল এক ধরনের রাজনীতি। কিন্তু তার সমাপ্তিতে সেই মোমবাতি।

একটা ছোট্ট ঘণ্টা বেজে উঠল। হাঁটু গেড়ে বসল প্রত্যেকে। তেসা মনে মনে হাসল। এ যেন অভিনয় করতে বসেছে তারা। কিন্তু অন্যান্য সকলের সঙ্গে বসে আবার তাদেরই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

অনুষ্ঠান দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠল, বার বার শব্দ করে করে হাই তুলতে লাগল। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল তেসা...তারই পাশে দাঁড়িয়ে কালো পোষাক পরা একটি যুবতী। মেয়েটির কী চওড়া কপাল আর চকচকে পাতলা ঠোঁট! ঠিক যেন ব্রঁজিনোর ফ্লোরেনটাইন ছবির মত দেখতে। সেই জাতের মেয়ে যারা উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ভয়ানক রকমের উচ্ছ্বাসপ্রবণ।

হঠাৎ চোখে পড়ল ব্রতৈল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ে কেঁপে উঠে ঘন ঘন ঠোঁট নাড়তে লাগল, যেন প্রার্থনা করছে সে। বোকা লোকদের ধারণা যে ব্রতৈলের হার হয়েছে; কারণ সে জার্মানীর সঙ্গে একটা আপোষরফা চেয়েছিল। কিন্তু তেসার বিশ্বাস, ব্রতৈলের দিন আসছে। প্রত্যেকে অভিশাপ দিচ্ছে পপুলার ফ্রন্টকে। অর্থাৎ সরকারী পক্ষের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দক্ষিণপন্থীদের দিকে চলে যাবে। তাছাড়া যুদ্ধ চিরদিন চলবে না। হিটলারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে ব্রতৈল ছাড়া সে কাজ আর কে পারবে? সত্যিই, গোঁড়া ব্রতৈলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখাই বাঞ্ছনীয়।

অর্গানের সুর তেসাকে আবার বিষণ্ণ করে তুলল। কী চমৎকার অর্গান

বাজাতে পারে লোকটি! ১৯১৭ সালে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। জার্মান 'বিগ বার্থা' জাহাজ থেকে গোলা এসে লেগেছিল একটি গির্জায় এবং বহু লোক মারা গিয়েছিল। আজ এই মুহূর্তে যদি সেই রকম একটা বোমা এসে ফাটে? না, সে রকম কোন সম্ভাবনা নেই; ওরাই ভয় পাচ্ছে শুরু করতে। কেউই তো যুদ্ধ বাধাতে চায়নি। আসলে পোলরাই হল বন্য প্রকৃতির। জার্মানরা ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালাচ্ছে পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু ফরাসীদের শ্রদ্ধা করে তারা। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে আজও তারা কোন মীমাংসায় আসতে পারেনি। মুসোলিনীই পারত সবাইকে সংঘবদ্ধ করতে। কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়ল লোকে। এবং তারপর শুরু হয়ে গেল পুরোদস্তুর যুদ্ধ। জঙ্গলে যুদ্ধ চালাবার একটা পরিকল্পনা ছিল গামল্যাঁর মাথায়। মাইন পাতা ছিল সে জঙ্গলে। অকারণে কতকগুলো প্রাণ নষ্ট করা! লুসিয়ঁও তো মারা যেতে পারে। অবশ্য তার জন্যে একটা কেরানীর কাজ সংগ্রহ করে দেওয়াও সম্ভব ছিল। কিন্তু কোথায় উধাও হয়ে গেল হতচ্ছাড়াটা; খুঁজে বের করা গেল না তাকে। বড় দুঃখের কথা! সত্যিই বড় দুঃখের কথা! আচ্ছা, অর্গান বাজানো কি ওরা বন্ধ করবে না কোনদিন?

জেনারেল ভিসেকে দেখতে পেল তেসা। ভক্তিভরে উপাসনা করছে সে। শোনা যায় সে নাকি কমিউনিস্ট ফ্রুজের বন্ধু। কী অদ্ভুত! একটা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সে অথচ কেমন গ্রাম্য গণিকার মত উপাসনা করছে! কুমারী মেরীর গর্ভ-প্রবাসের কথা সে কি সত্যিই বিশ্বাস করে? করুক গে। ফ্রুজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেয়ে এতে বিশ্বাসী হওয়া অনেক ভাল।

অবশেষে উপাসনা শেষ হল। গির্জার আবছা আলোর পর শরতের ঝকমকে সূর্য এসে অভ্যর্থনা জানাল তাকে। বাদাম গাছগুলো ঝলমল করছে এক পশলা সোনার মত। সাঁজ এলিজের ওপর টুকরো টুকরো সূর্যের আলো ঝিকমিক করছে বিক্ষুব্ধ স্রোতের মত। মেয়েগুলোকে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে যেন। বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে সমস্ত বাড়ীর কাঁচের জানলায় কাগজের ফিতে লাগানোর ফলে কেমন অভিনব নক্শা সৃষ্টি হয়েছে। তেসা হাসল, ভাবল, 'আর এক রকম নতুন প্রসাধন সৃষ্টি হল তোমার জন্যে।'



৩

প্রচণ্ড বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে অক্টোবর মাস এল। তেসা রব তুলল পরিষদ ঘরের লবিতে, ‘ আমি গোড়া থেকে বলে আসছি পোলরা এক মাসও ঠেকাতে পারবে না। ওরা চোর আর মাতালের জাত! কিন্তু আমরা কিছু হারাইনি। বরং পূব দিকে হিটলার জিতেছে বলে জার্মানরা শান্ত হয়েছে। এখন তারা ম্যাজিনো লাইনকে অন্য চোখে দেখবে। আগামী ১৪ই জুলাই আমরা সারা রাত রাস্তায় নাচবো গাইবো...আলো ঝলমল করবে সমস্ত রাস্তায়। তোমরা দেখে নিও।’

বোমার বদলে আকাশ থেকে ইস্তাহার পড়ল। ধীরে ধীরে জেগে উঠল অভিজাত পল্লীর মানুষরা। মতিনি তার পরিবারকে ফিরে আসবার জন্যে চিঠি দিল—গাঁয়ে পড়ে থেকে এই বৃষ্টিতে ভিজে কী লাভ! তার স্ত্রী কেমন বিরক্ত হয়ে পড়েছে খাবার-দাবার না পাওয়ায়।

‘ভগবানই জানেন এসব কি হচ্ছে!’ তার স্ত্রী বলে, ‘সরকারের কী দরকার লোকের রান্নাঘরে নাক ঢোকাতে আসবার? কখন কি খেতে পাবে তাই জানে না লোকে। সোমবার মাংসের কাটলেট পাওয়া দায়; মঙ্গলবার গরুর মাংস বিক্রী করা বেআইনী; বুধবার মিষ্টি খাবার তৈরী করবে না কেউ। এর চেয়ে অপমান আর কী হতে পারে!’

কয়েকদিন ধরে কোথাও এক দানা কফি পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে পড়ল মতিনির স্ত্রী—‘সমস্ত দোকানে ঘুরে এলাম...এতটুকুও কফি নেই কোথাও। মনে হচ্ছে পোলদের জন্যেই আমাদের এই দুর্দশা। আমি জানি ইংরেজরা নিজেদের চা খাওয়া বন্ধ করেনি। তারা কোন কষ্ট স্বীকার করছে না। এ সব দালাদিএর দোষ। কোন কর্মের নয় লোকটা। একজন ইস্কুল মাস্টার বই তো না। প্রধান মন্ত্রী হলে কী হবে!’

আবার দোকানে কফি পাওয়া যেতে লাগল। মতিনির স্ত্রী থিতিয়ে গেল কিছুটা।

ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে উঠল। আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে মিতব্যয়ীরা দু হাতে খরচ করতে লাগল টাকা। রেস্তোরাঁগুলো ভরে উঠল লোকের ভীড়ে। ফেঁপে উঠল বড় বড় সৌখিন দোকানগুলো। মেয়েদের টুপিগুলো ফৌজী ঢঙে তৈরী

হতে লাগল। দোকানের জানলায় সাজানো ব্রোচ আর পিনের ওপর ট্যাঙ্ক আর ইউনিয়ন জ্যাকের প্রতিকৃতি ; মাদুলি আর রেশমের রুমালের গায়ে লেখা, 'সে ফ্রান্সের কোন এক জায়গায় রয়েছে।'

বিরক্তিকর 'ন' অক্ষরটার বদলে 'ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায়' কথাটা সবার মুখে মুখে ঘুরছে। দৈনিক পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে—'গতকাল ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায় জেনারেল সিকরস্কি সৈন্য সমাবেশ পরিদর্শন করেন।' জানলার নীচে বড় রাস্তার গাইয়েরা নাকী স্বরে গান গাইছে, 'ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায় মনে কোরো, মনে কোরো আমার ভালবাসার কথা।'

বিদেশী সাংবাদিকদের এক ভোজসভায় তেসা বক্তৃতা দিল, 'সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে দিন যে পারী ঠিক আগের মতই দিন কাটাচ্ছে। কামানের গর্জনের বদলে আমরা গান গাইছি, পারী আজও সেই পারীই আছে।'

লোকেরা বলতে লাগল, সৈন্যরা বিরক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে গ্রামোফোন রেকর্ড, ফুটবল, তাস, ডমিনো, ডিটেকটিভ গল্পের বই, সমস্ত কিছু সংগ্রহ করা হল। পতিপ্রাণা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর জন্যে পাঠাল উটের লোমের কোট, নেপোলিয়ন ব্রাণ্ডি আর শহরের শ্রেষ্ঠ রাঁধুনীর তৈরী ফলের মোরব্বা।

ভয় হয়েছিল হয়ত যুদ্ধের ফলে অনেক দুঃখ কষ্ট আসবে। কিন্তু শরৎকাল অনেক নতুন বৈচিত্র্য নিয়ে এল—নৈশ উৎসব, অভ্যর্থনা সভা, প্রদর্শনী, সাধারণের সাহায্যের জন্যে মেলা আর নীলাম। ভাগ্যবান পুরুষ গ্রঁদেলের দেখা সব জায়গাতেই পাওয়া গেল। তাকে বাদ দিয়ে কোন অভ্যর্থনা সভাই সম্পূর্ণ হয় না।

লড়াইয়ের গোড়ার দিকে গ্রঁদেল যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চেয়েছিল, 'আমি লড়াই করতে চাই।' তার সহকারী ডেপুটিরা প্রতিবাদ করল, 'এখানে তোমার থাকা আরও বেশী দরকার।' তার খ্যাতি এতদূর ছড়িয়ে পড়েছে যে দুকান হারানো দলিলের কথা তুলতে চাওয়ায় সবাই বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দিল, 'ব্যক্তিগত বাদবিসম্বাদ তুলে জাতীয় ঐক্য নষ্ট কোরো না।'

গ্রঁদেল তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা বোঝাপড়া করার ইচ্ছে গোপন রাখল না। সে বলল, 'পয়লা সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যা পর্যন্ত এই যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব ছিল। ব-নে টেলিফোনে সিয়ানোর সঙ্গে কথা বলেছিল। আমি চারজন প্রধান মন্ত্রীকেই একসঙ্গে মিলিত হবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমাদের দলের ডেপুটিরাও আমাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি

একটার মাথার ওপর দিয়ে আরেকটা ঘটে গেল! ইতিহাসই প্রমাণ করবে কে দোষী। কিন্তু এটা তর্ক করার সময় নয়। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এখন জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের থামা চলবে না।'

যুদ্ধ গ্রঁদেলকে তার আগেকার সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্তি দিল। নতুন করে সাজানো হল তাস। সে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। যখন সে যুদ্ধে জয়লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তখন তার গলায় একটা আন্তরিক আবেগ অনুভব করা যায়।

ডেপুটিরা গ্রঁদেলের দেশপ্রেম দেখে উৎসাহিত হল। মিলমালিকরা বলল, 'স্থিরচিত্ত'—অভিজাত মেয়েরা প্রেমে পড়ল তার। এমন সুপুরুষ আর সুবক্তা এই লোকটা যে ওকে দেখে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। মনে হবে তার সংযত স্বভাবের মধ্যে লুকিয়ে আছে আবেগের একটা উৎস।

এমন কি ব্রতৈলের সন্দেহ হল যে সে কোনও ফাঁদে পড়ছে না তো? লুসিয়ঁকে সে বিশ্বাস করত কারণ লুসিয়ঁ ছিল কল্পনাপ্রবণ। কিন্তু গ্রঁদেলের ব্যবহার কেমন নির্দোষ!

ব্রতৈলের চোখে এই যুদ্ধ একটা নাটক। সে শেষ পর্যন্ত ভাবতে চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। মাঝে মাঝে সে মনে মনে বলেছে, 'আমাদের এ যুদ্ধ জিততেই হবে।' কিন্তু তারপরেই মনে মনে হেসেছে ব্রতৈল। এই এক দল অপদার্থ ডেপুটির হাতে কর্তৃত্ব থাকলে এ যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। এই পার্লামেণ্টকে রদ না করে এবং বাচালদের কারারুদ্ধ না করে কি করে এই যুদ্ধ জিতবে ফ্রান্স? হতে পারে শত্রুর ঘা খেয়ে ফ্রান্স আবার নতুনভাবে গড়ে উঠবে।'

গ্রঁদেলের রগ দুটো শাদা আর চোখ কেমন বিষণ্ণ হয়ে এল। তার দিকে তাকিয়ে ব্রতৈল স্বগতোক্তি করল, 'আমার মত সেও উদ্বিগ্ন, চিন্তা-ভারাক্রান্ত।' যখন তারা দুজন ছাড়া আর কেউ রইল না, গ্রঁদেলের করমর্দন করে সে বলল, 'এস, অতীতের কথা ভুলে যাই আমরা।' ব্রতৈলের আর গ্রঁদেলের এক বছর ব্যাপী বিরোধের কথা কেউই জানত না। এখন তাদের মীমাংসার কথাও কেউ জানল না। সমস্ত ডেপুটিদের চোখে ও দেশের সামনে তারা চিরদিনই অন্তরঙ্গ বন্ধু। ব্রতৈল যখন গ্রঁদেলকে যুদ্ধ-শিল্পের দায়িত্বশীল মন্ত্রীত্বের পদে নিয়োগ করার কথা বলল তখন এতটুকু আশ্চর্য হল না কেউ।

ব্রতৈলের মনে আছে তেসাকে দিয়ে গ্রঁদেলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করানো কী কষ্টকর

কাজ! এমন কি এখনো হয়ত তেসা তার বিরুদ্ধে যেতে পারে। কিন্তু অতীতকে টেনে তোলার ইচ্ছা তেসার বর্তমানে নেই। লুসিয়ঁর সেই দলিল চুরির ঘটনাটা তার কেমন নীরস আর পুরনো মনে হয়। কে সন্দেহ করেছিল গ্রঁদেলকে?—ফুজে আর ছুকান। ফুজে তখন র‍্যাডিকাল পার্টি থেকে বহিষ্কৃত—মস্কো বোঝাপড়ার সময়ে চেম্বারলেনকে আক্রমণ করে ফুজে পারী আর লণ্ডনের মধ্যে একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছিল আর কি! ছুকান তখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তার তোতলামি সত্ত্বেও তার ধারণা সে গামবেতা...অন্য সকলের শত্রুতাই তার প্রাপ্য। ভীইয়ার বলল, 'ছুকান একটা পূতি-পড়া উগ্র জাতীয়তাবাদী!' ব্রতৈল তার বিরুদ্ধে মানহানির মোকর্দমা আনল। না, গ্রঁদেলের শত্রুরা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া সমস্ত কিছু অত্যন্ত সংযতভাবে দেখা দরকার। গ্রঁদেল কমিউনিস্টদের ঘৃণা করত...তাদের মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানত সে। জনসাধারণ ভাবত, গ্রঁদেল একজন 'বামপন্থী' কারণ ফ্রান্সের 'দুশো পরিবারের' বিরুদ্ধে সে কথা বলত...এবং মার্কিন ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে একটা পুস্তিকা লিখেছিল। আর যুদ্ধশিল্পের ক্ষেত্রে সমস্ত কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করাই সমীচীন। সুতরাং গ্রঁদেল তাদের একে একে গ্রেপ্তার করুক, মজুরদের কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে তাদের মজুরি কমিয়ে দিক। যদি সে ঠিকভাবে কাজ করতে পারে তাহলে সমস্ত দায়িত্বই তার...তেসা এবং র‍্যাডিকালরা সম্পূর্ণ নির্দোষ থেকে যাবে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্রতৈল গ্রঁদেলের মত লোকের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী ছিল না। এখন সে এবং তেসা দুজনেই সে কথা ভুলে গেল। যুদ্ধের সময়ে এই ক্ষুদ্র দলগত হীনতা থেকে ওপরে উঠতেই হবে। তেসা বলল, 'তোমার নির্বাচনকে আমি সমর্থন করি।'

দেসের বাদে সমস্ত বড় বড় শিল্পপতিরা গ্রঁদেলকে সমর্থন জানাল। মতিনি অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ হয়ে বলল, 'অন্তত সে শান্তিরক্ষা করতে পারবে। ঘরের মধ্যে এই অরাজকতার ভেতর কী করে যুদ্ধ চালানো সম্ভব? মজুররা কোন রকম আত্মত্যাগ করতে রাজী নয়। কথা দিয়ে তুমি তাদের বোঝাতে পারবে না। কড়া হাতে শাসন করতে হবে তাদের।'

কর্মচারী সংঘের সভাপতি মিয়েজার গ্রঁদেলকে অভিনন্দন জানাল। একদিন ছুকান ঘোষণা করল, 'মিয়েজার এখনো সুইজারল্যাণ্ড দিয়ে জার্মানদের বক্সাইট পাঠাচ্ছে। এটা নিছক কুৎসাপ্রচার। অবশ্য আমার নিজস্ব একটা

কর্মনীতি আছে।' তার কর্মনীতি অত্যন্ত সাধারণ। তার ধারণা, এই যুদ্ধ বার্লিনের বিরুদ্ধে নয় মস্কোর বিরুদ্ধে পরিচালিত করা উচিত। মিয়েজারের কর্মনীতি হল 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। যখন তেসা প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জার্মানীর বিরুদ্ধেই লড়ছি।' মিয়েজারও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উত্তর দিল, 'ধৈর্য ধরো। এ তো সবে প্রথম অঙ্ক চলছে।' যুদ্ধ শুরু হবার পর সে মাদ্রিদে রওনা হল...খবর রটল সে জার্মান দূতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে।

গ্রঁদেলকে নিয়োগ করার পর দেসের কিন্তু সত্যি সত্যিই চটল। সে বলল, 'এর জন্যে রাজনৈতিক চক্রান্তকারীর বদলে একজন যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ দরকার।' কিন্তু দেসেরের আগেকার প্রভাব এখন আর নেই। তার ব্যর্থ রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে ব্যবসায়ী মহলে কথাবার্তা চলে। ডেপুটিদের ধারণা, সে নিজেকে বোকা প্রমাণিত করেছে। পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন করে সে লীগ অব লেশন্‌স্‌-এর শূন্যগর্ভ প্রস্তাবের সাহায্যে যুদ্ধ থামাতে চেয়েছিল। ব্রতৈল প্রায়ই ঠাট্টা করে, 'ও আতর দিয়ে আগুন নিবোয়।' এমন কি তেসার চোখেও দেসের একজন অপদার্থ।

এক মাস কেটে গেল। দেখা গেল, গ্রঁদেল সত্যিই একজন পরিশ্রমী কর্মী। রিপোর্ট তৈরী আর উপদেশ ও নির্দেশ নেওয়ার ব্যাপারে রোজই তার ব্রতৈলের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

'এ হল দেসের আর কমিউনিস্টদের কীর্তি!' সে বলল, 'একটা নোংরা আস্তাবলের চেয়েও জঘন্য! কোন কিছু বিপদ ঘটবার আগেই আমাদের এই নোংরা পরিষ্কার করতে হবে।'

শুধু এক তৃতীয়াংশ মজুর 'সীন' কারখানাতেই বসে রইল। দেসের ভাবল একটা কৈফিয়ৎ নেওয়া দরকার। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে গিয়ে ঢুকল গ্রঁদেলের পড়ার কামরায়। টুপিটা হাতে নিয়ে কথা বলতে বলতে ছড়িটা ঘোরাতে লাগল দেসের। হাসতে হাসতে গ্রঁদেল তার ডেস্কের ওপরকার কাগজগুলো উল্‌টে চলল। বড় মজা লাগছে তার—একদা শক্তিশালী দেসের, তার সামনে বসে রয়েছে দরখাস্তকারীর মত!

দেসের নিশ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল। সে অসুস্থ; তার গুরুতর অসুস্থতার কথা তার নিজেরও অজানা নয়, যদিও কোন চিকিৎসা না করিয়ে সে মদ খেয়ে যাচ্ছে নির্বিবাদে। তার ব্যবসার মত তার ব্যক্তিগত জীবনও

অত্যন্ত উপেক্ষিত আর বিষণ্ণ। জিনেতের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাতের মধ্যেও কেমন করুণা আর দুশ্চিন্তার ছায়া। শহরের উপকণ্ঠে তার বাড়ীতে রাত কাটাতে কেমন একা একা মনে হয়......মনে হয় তার মনের মধ্যে যত রাজ্যের মৃত্যুর চিন্তা ঢেউ তুলছে। মরতে ভয় হয় দেসেরের। অনেকবার সে ভয়কে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। সে দেখতে পাচ্ছে, দেশ কি ভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নেমে চলেছে কিন্তু তার অক্ষমতায় সে নিজেই বিব্রত। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সে নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করেছিল। কিন্তু এখন সমস্ত খেলা থেকে বাদ পড়েছে সে। তার বক্তব্য ওরা সবাই শুনল কিন্তু কেউ একবার তার দিকে তাকালও না। বিধবা রাজমহিষীর মত তার অবস্থা......শেয়ার বাজারের পুঁথিগত সমজদার বা প্রাচীনকালের স্মৃতি-চিহ্নের মত অসহায় আর বিচিত্র! বাচাল মতিনি আর মিয়েজ্জার যে কয়েক লক্ষ টাকার জন্যে নিজের মাকে পর্যন্ত বেচতে পারে, তাদের দিকেই নজর দিতে ব্যস্ত রইল লোকে। দেসেরের প্রতি কোন লক্ষ্যই নেই তাদের।

এবার সে গ্রঁদেলকে বলল, 'আপনারা কী করে আশা করেন যে নভেম্বরের মধ্যে আমি আপনাদের মাল সরবরাহ করব? কোন মজুর নেই আমার হাতে। যুদ্ধ শুরু হল না কিন্তু এরি মধ্যে ভাল ভাল মজুররা লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে হাজির হয়েছে।'

'সত্যিই বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কী?' গ্রঁদেল বলল, 'আমরা মজুরদের বিশেষ কোন সুবিধা দিতে পারি না কারণ আমাদের দেশ হল কৃষিপ্রধান। তাহলে চাষীরা কী বলবে? মজুরদের দ্বিগুণ রোজগার করতে দিয়ে চাষীদের কি ময়দানে গিয়ে প্রাণ দিতে হবে? অত্যন্ত সহজ আর মৌলিক ন্যায়পরতা বাদ দিয়ে এ যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়।'

'চল্লিশ বছর বয়স যাদের তাদের সম্পর্কে কী করবেন? তারা তো যুদ্ধে যায়নি। মিস্ত্রিরা সকলে জানলা ধুচ্ছে ব্যারাকের।'

'মজুরদের মধ্যে আমরা বৈষম্যমূলক নীতি মানতে রাজী নই।'

'আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনার ইঞ্জিনের দরকার আছে কি নেই? আমি দেখতে চাই আপনারা কি করে বিনা এরোপ্লেনে যুদ্ধ চালান। যদি ইঞ্জিনের দরকার থাকে আমাকে মজুরের ব্যবস্থা করে দিন। গতকাল আবার ওরা দুশোজন মজুরকে ধরে নিয়ে গিয়েছে 'সীন' কারখানা থেকে।'

'ঠাণ্ডা মলম দিয়ে একটা মড়ক দূর করা যায় না। আজ আমাদের পপুলার ফ্রণ্ট সরকারের দাম কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হচ্ছে।' গ্রঁদেল বলল।

'পপুলার ফ্রণ্টের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?' দেসের ছড়িটা এমনভাবে নাড়াতে লাগল যেন গ্রঁদেলকে মারবার জন্যে তৈরী হচ্ছে সে, 'আর তাছাড়া আপনি নিজেও একজন পপুলার ফ্রণ্টের প্রতিনিধি।'

'আমার যতদূর মনে আছে মসিয়ঁ দেসের, পপুলার ফ্রণ্টের সাফল্যের জন্যে কোন টাকা খরচ করতে আপনি এতটুকুও পেছ-পা হননি।'

গ্রঁদেলের সুকুমার ভুরুওলা সুন্দর মুখ, খোদাই করা নাক আর ভাবহীন প্রায়-অস্পষ্ট হাসির দিকে তাকিয়ে মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল দেসের।

'আমারও মনে আছে। প্রত্যেকটা জিনিস আমার মনে আছে। সেই ফুজে-দলিল......' দেসের বলল।

গ্রঁদেলের একটা মাংসপেশী পর্যন্ত নড়ল না। হাসতে হাসতে সে বলল, 'যুদ্ধের সময়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অচল, তাই আমি আপনাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দেসেরের হাত থেকে টুপিটা পড়ে গেল, এক দমক কাশি এসে বিব্রত করে তুলল তাকে। গ্রঁদেল একটা রিপোর্ট পড়ার ভান করল।

সন্ধ্যার দিকে একটা ভোজ দিল গ্রঁদেল। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা, 'সৈনিকের আহার।' রূপদস্তার প্লেটে করে অতিথিদের 'সালামিস দ্য ফেঁজা' পরিবেশন করা হল...মগ থেকে তারা সবাই খেল সব চেয়ে সেরা পানীয় 'হস্‌পিস দ্য বোন'।

মুশ্‌ অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাল। লুসিয়ঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর সে অনেকদিন শারীরিক পীড়ায় ভুগছিল এবং আলপ্‌স্‌-এ গিয়েছিল শরীর সারাতে। এখনো অত্যন্ত সুন্দরী দেখায় তাকে কিন্তু ভাল করে দেখলে বোঝা যায় যে সে কেমন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। মনের অসুখ আর তার যন্ত্রণা তার সমস্ত গতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

অতিথিরা চলে যাবার পর গ্রঁদেল তার ডিনার-জ্যাকেট আর ওয়েস্টকোট খুলে ফেলল। ঝকঝকে শাদা শার্টের ওপর চোখে পড়ল পাতলা কালো ফিতে দুটো। সে স্ত্রীকে বলল, 'কর্নেল মোরো তোমার প্রসাদ পাবার জন্যে দারুণ উৎসুক। লোকটা খুব নামজাদা, ও জেনারেল স্টাফের কর্তা হলেও আমি এতটুকু আশ্চর্য হব না।'

গ্রঁদেল হাই তুলল। সারাদিন অত্যন্ত পরিশ্রম গেছে। ধীরে ধীরে পায়জামাটা বদলে ফেলল সে। হঠাৎ বলল, 'যাই হোক আমরা জিতবই।'

মুশ্ ওর ব্যাপারে কোনদিন মাথা গলাতে আসে না। এমন কি সেই বিশ্রী চিঠিটার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে সে। লুসিয়ঁর সঙ্গে তার শেষ দেখা তাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে দিয়ে গেছে। যুদ্ধ, ম্যাজিনো লাইন আর বিমান আক্রমণের কথা ও স্বামীর ভবিষ্যৎ তার কাছে পরদায় আঁকা নক্‌শার মত মনে হয়। কিন্তু আজ সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা মানে কারা?'

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল সে বোকার মত একটা কথা বলে ফেলেছে। তিরস্কৃত হবে বলে সে পেছন ফিরল। অত্যন্ত শান্ত হয়ে উত্তর দিল গ্রঁদেল, 'আমরা ফরাসীরা।'

গ্রঁদেল হল জুয়াড়ী। তার সারা জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে পড়ে সবুজ পরদার চারধারে ফিসফিসে কথা আর অস্ফুট চিৎকার। সেই ভয়ংকর কয়েকটা মাস ধরে সে এমনি নির্বোধের মতই কাজ করেছিল যার পর অনুতপ্ত হয়েছিল সে। আশি হাজার ফ্রাঁ সে হারিয়েছিল। তারপর ভের্ন তার সাহায্যে এল। কিলমানের সঙ্গে দেখা করিয়ে জার্মানদের জন্যে দলিল চুরির কাজে লাগিয়ে দিল। কিন্তু সে সব কথা মনে করে কী লাভ? এক বৃহত্তর ভবিষ্যতের পেছনে ছুটেছিল সে। গ্রঁদেল মনে মনে বলল, 'আমরা জিতবই।' কিন্তু সে মনে মনে জানে কোন্ জয়ের কথা বলছে সে। সে নিজেকে এবং মুশ্‌কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'এ একটা নির্বোধ প্রশ্ন! নির্বোধরাই ভাগ্যের সঙ্গে তর্ক করতে চায়। এ ঠিক রুলেত্ খেলার মত, ওরা সবাই একই নম্বরের পেছনে ছোটে। কিন্তু মানুষের বদলানো উচিত, দেখা উচিত ভাগ্য কোন্ দিকে চলেছে এবং সেই পথ ধরে যাওয়া উচিত তার। এখানেই হল আসল কায়দা।'

৪

মতিনি পর্যন্ত ভীষণ বিরক্ত হল। 'কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা এক কথা আর বুড়ো লোকদের ধরে ধরে ব্যারাকে পাঠানো সম্পূর্ণ আরেক কথা। আমার হাতেও তেমন প্রচুর মজুর নেই।' গুপ্ত বিরোধী পক্ষের সমর্থনের ফলে যুদ্ধ-শিল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন চেম্বারে একটা 'রীতি' হয়ে দাঁড়াল।

দেসেরের সঙ্গে 'ন্যায়নীতি' সম্পর্কে আলোচনার সময়ে গ্রঁদেল ব্রতৈলের

কথাগুলোই বলেছে। ফরাসী কৃষকদের গ্রঁদেল ঘৃণা করে এবং ভয়ও করে। তার ধারণায় ওরা মানুষ নয়, কেমন একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব। অন্য দিকে ব্রতৈলের মত—শহর ও শিল্পের অত্যধিক প্রসারই ফ্রান্সের সমস্ত দুঃখ কষ্টের জন্যে দায়ী। গ্রাম্য-জীবন কেমন যেন ভোঁতা আর স্থূল! সেখানে কোন সিনেমা নেই; কাজকর্ম পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ এবং সেজন্যে দলে দলে শহরমুখো হচ্ছে -যুবকরা। ফ্রান্সের কত গ্রামই তো জনশূন্য আর পরিত্যক্ত! চালাগুলো ভেঙে পড়ছে......ভেপসে উঠছে গোলাঘর......যত রাজ্যের জংলী আগাছা জন্মাচ্ছে ফলের বাগানে। এরই পরিণতি হল সাম্যবাদ, পপুলার ফ্রন্ট, অধর্ম আর ভাঙন। ব্রতৈল ভেবেছিল, যুদ্ধের ফলে কৃষকরা পুরোভাগে এগিয়ে আসবে। তাই গ্রঁদেলকে পরামর্শ দিয়েছিল 'মজুরদের কোন রকম প্রশ্রয় দিও না।'

তবুও তাকে নামতে হল। অক্টোবরের শেষে সরকার সিদ্ধান্ত করল, পঁয়তাল্লিশ বছরের সমস্ত লোককে যুদ্ধ-শিল্পের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে।

তাদের মধ্যে একজন হল লেগ্রে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে তাকে দক্ষিণে পাঠানো হয়েছিল। তার তাঁবু পড়েছিল তুলুজের কাছাকাছি। সেখানে একটা সাঁকো পাহারা দিতে হত তাকে, যে সাঁকোর ওপর দিয়ে বহুকাল আগে সরু লাইনের রেল যাতায়াত করত। এই শাখা লাইন বহুদিন হল পরিত্যক্ত হয়েছে......... সাঁকোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে হলদে ঝাড়। কিন্তু সেনা-কর্তৃপক্ষের তালিকায় এ লাইনের কথা লেখা আছে। গত দু মাস ধরে লেগ্রে তাকিয়ে আছে শুধু খোলা মাঠ আর রংচঙে গরুগুলোর দিকে।

তার হাতে চিন্তা করবার মত মুঠো মুঠো সময়। তার মনে পড়ল গত যুদ্ধের কথা......আরগন জঙ্গল, ট্রেঞ্চ আর হাসপাতালের কথা। অথচ সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো তার মনে হয় কেমন অস্পষ্ট আর ভূতুড়ে যেন এই দুই যুদ্ধের মাঝখানে কেবলমাত্র একটি দিনের ব্যবধান। সে সময়ে ওরা ভাবত যে লোকেরা এবার অনেক চালাক হয়ে গেছে......আর হয়ত ভবিষ্যতে দ্বিতীয় যুদ্ধ ডেকে আনবে না তারা। কেউ কেউ উইলসনের নীতিতে বিশ্বাস রাখত। কেউ কেউ বলত, 'লেনিন.........লেনিন।' আবার বিশ বছরের মধ্যে আর একটা যুদ্ধ বাধবে—এ কথা আগে থেকে জানিয়ে দিলে কী ক্ষতি হত তাদের?

জোসেতের কথা মনে হলে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে লেগ্রে। সে জীবনে হয়ত কখনো

সুখী হবে না! গ্রীষ্মকালে ফিরে এসে তারা বিয়ে করবে ঠিক করে নতুন ঘরের খোঁজে বেরিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ এসে সমস্ত কিছু ছত্রভঙ্গ করে দিল তাদের। জোসেতের বাবা ধরা পড়ল। জোসেৎ চলে গেল তার বোনের বাড়ী বেসাসেঁ। ছোট ছোট শোকার্ত চিঠি লেখে সে। রাত্রে দক্ষিণাকাশের হাজার হাজার তারার দিকে তাকিয়ে জোসেতের ভালবাসার কথা মনে পড়ে লেগ্রের। সে শুধু ক্লান্ত হয়ে হাই তোলে!

কারখানায় ফিরে এসে লেগ্রে তার পুরনো বন্ধুদের ফিরে পেল না। মিশো আর পিয়ের যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে সে পরিচিত লোকদের খোঁজে বেরুল। যে কাফেতে তার বন্ধুরা জড়ো হত সেখানে গেল, বন্ধ লাইব্রেরীর চার পাশে পায়চারি করল, তারপর মন্‌ক্রুজ ভিলজুইভে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা হল না। কতক লোক গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছে, বাকী যারা তারা গোপনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

অনেক নিঃসঙ্গ আর অস্থির মনে করল লেগ্রে নিজেকে। পার্টি কি করছে না করছে সে কিছুই জানে না এবং এই না জানাটা তার কাছে কেমন অন্ধতা বলে মনে হয়! সে বিরক্ত হয়ে সেই সব সংবাদপত্রগুলো পাশে ফেলে দিল যারা লিখেছে—কমিউনিস্টরা বিশ্বাসঘাতক, রুশরা সিগফ্রিড লাইনের ধারে যুদ্ধ করছে এবং মোরিস তোরে জার্মানীতে পলাতক। তুলুজে সে শুনেছিল যে 'লুমানিতে' গোপনে ছাপা হয় এবং বিলি করা হয় কিন্তু সে কী করে তার সন্ধান পাবে? যে সব লোক তার সঙ্গে কাজ করত তারা এখন চিনতেই পারে না তাকে। তারা সন্দিগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকায় যেন গোয়েন্দা-বিভাগ থেকে চর করে পাঠিয়েছে তাকে।

একাকীত্ব ও অনিচ্ছাকৃত অলসতার মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। এই ভাবে চার দিন কাটল। পঞ্চম দিন গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তাকে।

একটা ছোট্ট হাজত ঘরে সমস্ত রাতটা কাটল, সব রকমের লোকের দেখা মিলল সেখানে—রাজনৈতিক বন্দী আর মেয়েদের দালাল, জার্মান আশ্রয়প্রার্থী আর পোলিশ ইহুদি, রসজ্ঞ লোক যাদের দালাদিএর মদ্য-পান ও তেসার দুঃসাহসিক প্রেমের গোপন খবর পুনরাবৃত্তি করার দরুণ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সাধারণ নাগরিক যাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শোনা গেছে 'এবার আর দুধ পাওয়া যাবে না' বা 'ওরা সতের বছরের ছেলেদের পর্যন্ত যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে একটা নতুন নিয়ম জারী করেছে।'

সকালে লেগ্রেকে জেরা করার জন্যে নিয়ে গেল। পুলিশ কমিশনার ন্যভিল গুপ্ত ইউরোপীয় তান্ত্রিক সমিতির সভ্য। সুতরাং সে খোলাখুলি বলল যে সে এড্যুয়ার দালাদিএর চেয়ে এড্যুয়ার এরিওকে বেশী পছন্দ করে। পুলিশ কর্মচারীর পক্ষে এই মত পোষণ করা স্বাধীন-চিন্তার পরিচায়ক। সে জানে যে লেগ্রে 'সীন' কারখানার কমিউনিস্ট সংগঠনের একজন নেতা; লেগ্রে যদি পার্টি ত্যাগ করে তাহলে জনসাধারণের মধ্যে তার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। সংবাদপত্রগুলো লিখবে, 'আবার একজনের চৈতন্যোদয় হল!' তেসা ন্যভিলের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করবে; একজন অনুতপ্ত লোক এক হাজার পাপীর সমান।

ন্যভিল অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার করল লেগ্রের সঙ্গে এবং একটা সিগারেট দিল।

'আমি একজন সরকারী কর্মচারী। সুতরাং ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ফ্যাশিস্ট নই। আমি সত্যিই পপুলার ফ্রণ্টের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম, যে এবার একটা স্থায়ী শান্তি আসবে। কিন্তু দেখছি ঠিক তার উল্‌টো হয়েছে। যাই হোক, এটা কিন্তু দলগত সংগ্রামের সময় নয়। এখন সমস্ত ফরাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। আপনি কমিউনিস্ট কিন্তু আপনি একজন ফরাসীও। আপনি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। আমি আপনাকে দেশদ্রোহী বলে মনে করি না।'

লেগ্রে কি বলে তারই অপেক্ষায় রইল সে। কিন্তু লেগ্রে অত্যন্ত নিঃশব্দে তার ক্যাপটা ভাঁজ করতে লাগল আর তাকিয়ে রইল টেবিলের ইতস্তত নীল ফাইল-গুলোর দিকে।

'কথা বলছেন না যে?'

'সত্যিই বুঝতে পারছি না কি বলব? যা বলার তা তো আপনিই বলছেন। আমি কমিউনিস্ট ছিলাম এবং আজও আছি।'

'আপনার একগুঁয়েমি আমি বুঝতে পারি। অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের প্রভাবের ফল। আপনি আপনার কমরেডদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চান না। কিন্তু বন্ধু, আজ আর দ্বিধা করার সময় নেই। আপনাকে অন্যের হাতের ঘুঁটি বানিয়েছে ওরা। ওরা আপনাকে ঠকিয়েছে। ওরা দেশপ্রেমের বুলি আওড়ে আপনাকে ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছে। কিন্তু আসলে কি হয়েছে? মোরিস তোরে আজ পলাতক।'

'আমরা পলাতক নই। আপনি বরং এ প্রসঙ্গ বাদ দিন। আমি জানি না মোরিস তোরে বর্তমানে কোথায় আছেন। কিন্তু আপনাদের সংবাদপত্রের কথা

মত তিনি জার্মানীতে নেই এটা ঠিক। মনে হয় তিনি 'লুমানিতে' ছেপে বের করছেন। এই হল আসল কাজ। কিন্তু আসল পলাতকরা কোথায় আছে তা আমি জানি। মিউনিকের কথাও আমার মনে আছে। আর স্পেনকে নিয়েই বা কী ঘটল? আমাদের লোকেরা যখন ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তখন ব-নে সাহায্য করছে ফ্রান্সের শত্রুদের। ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত জানে এ কথা। আপনার কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছি। আপনি ফ্যাশিস্টদের কথা বলছেন। আপনারা সব সময়ে তাদের ঢাল দিয়ে রক্ষা করে এসেছেন আর সে জন্যে ফ্যাশিস্টরা আজ ক্ষমতাশালী।'

হুভিল ভদ্র হাসি হাসল।

'তেতাল্লিশ বছর বয়স হয়েছে আপনার কিন্তু এখনো যুবকের মত প্রাণশক্তি আছে দেখছি।' সে বলল, 'সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু একমাত্র দুঃখের বিষয়, আপনি আপনার ঠুলি খুলতে চান না। আপনার পার্টি আপনার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। জার্মানীর জয়ের জন্যে এখন আপ্রাণ পরিশ্রম করছে তারা!'

'ও কথা আমি বিশ্বাস করি না!'

'তাহলে কি করতে চায় তারা?'

লেগ্রে ভুরু কোঁচকাল। 'আমি জানি না বর্তমানে পার্টির কর্মনীতি কি,' সে বলল, 'এবং সে জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ! আপনারা 'লুমানিতের' কণ্ঠরোধ করেছেন এবং সমস্ত সাচ্চা লোককে গ্রেপ্তার করেছেন। আর এখন ধুলো দিতে চাইছেন আমার চোখে। কিন্তু অনেক কিছু খেলাই আমি বুঝতে পারছি। কারা কমিউনিস্টদের পিছু নিয়েছে? দালাদিএ, তেসা, ব্লুম, ভীইয়ার, ব্রতৈল, লাভাল—এক কথায় গোটা দল। না, কমিউনিস্টরা বিশ্বাসঘাতক নয়—বিশ্বাস-ঘাতক হল তাদের শত্রুরা। আজ যদি লাভাল 'সাবাস কমিউনিস্ট' বলে চিৎকার করতে শুরু করে, আমি সহজে বিশ্বাস করব না। কিন্তু, এখন আমরা জানি আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।'

হুভিল সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ঘণ্টা বাজাল।

'নিয়ে যাও ওকে।' নির্দেশ দিল হুভিল।

অন্যান্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে লেগ্রেকে বন্দী-শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বন্দী বোঝাই ট্রেনখানি নোয়াসি-ল-সেক জংশনে এক ঘণ্টারও ওপর থামল। পুলিশ দর্শকদের বন্দীদের কাছাকাছি আসতে দিল না—বলল ওরা দেশদ্রোহী। সৈনিক ও স্ত্রীলোকরা ট্রেনের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বিড়বিড় করল,

'অপদার্থ! ওরা কেবল নিজেদের জন্যে অপর লোকদের মারতে জানে।' কেউ কেউ চিৎকার করে উঠল, 'কাপুরুষ!' এর পর লেগ্রে 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে শুরু করল। অবাক হয়ে শুনতে লাগল প্ল্যাটফর্মের লোকেরা। গাড়ী থেকে বন্দীরা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা দেশদ্রোহী নই। আমরা মজুর—আমরা কমিউনিস্ট।' 'ইন্টারন্যাশনালের' পর ওরা 'মার্সাই' গাইল। প্ল্যাটফর্মের সৈনিকরা গুন গুন করে গেয়ে উঠল সেই সুর। ভীড় হটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল পুলিশ। জানলা থেকে ঝুঁকে পড়ে লেগ্রে বলে উঠল:

'গত যুদ্ধে আমার চোট লেগেছিল। মুখে এখনো পর্যন্ত তার দাগ রয়েছে। সে দাগ মুছতে পারবে না কেউ। বিমান কারখানা থেকে ওরা আমাকে ধরে এনেছে। পায়খানা পরিষ্কার করতে আমায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ব-নে, তেসা, ফ্লাঁস্তা! ওরাই হল আসল বিশ্বাসঘাতক! ফ্রান্সের জন্যে আমরা আমাদের প্রাণ দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত।'

লেগ্রে বজ্রমুষ্টি তুলল,—সেই প্রায় ভুলে যাওয়া শাসনের ভঙ্গী, ১৯৩৬ সালের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা পূর্ণ হবে না বলেই জানা ছিল। পুলিশ তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। ওদিকে ট্রেন চলবার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের ধার থেকে সৈনিক আর স্ত্রীলোকরা শত শত বজ্রমুষ্টি তুলল অভিবাদন জানিয়ে।

তালিকা এবং কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশি অনুযায়ী ধরপাকড় হতে লাগল। কে একজন বজ্রমুষ্টি তুলেছে, কোন এক অপরাধীকে নাকি শিস দিয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে শোনা গেছে, তৃতীয় ব্যক্তি তার ঘরে ক্রেমলিনের একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছিল নাকি—এমনি সব অভিযোগ! পুলিশ-রিপোর্ট পড়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তেসা। বলল, 'কমিউনিস্টরা তাহলে সমস্ত জায়গায় গিয়েই বাসা বেঁধেছিল! নীভ্‌র্ এমেচার মৎস্যশিকারী সমিতি, ভার-বিভাগের দাবা চক্র, গ্রেনোব্‌ল্ পর্বত-অভিযাত্রী সংঘ—সবগুলোই নাকি কমিউনিস্ট পার্টির শাখা। তেসা মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, এতেই বোঝা যায় ওরা কত শক্তিশালী! এখন বুঝতে পারি ওরা কি ভাবে দেনিসকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বেচারী বোকা মেয়ে!'

সমস্ত কমিউনিস্ট ডেপুটিদের গুলি করে মারা হোক—ব্রতৈল দাবী জানাল।

তেসা জবাব দিল, 'সাবধান বন্ধু! ওরা যাইই হোক, মনে রেখো জনসাধারণ ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে ওদের।' তেসা আগে থেকে কিছু করতে রাজী নয়। যে সব ডেপুটিরা ধরা পড়েছে তাদের সম্বন্ধে তেসা অত্যন্ত দুঃখিত। তাদের বাঁচানো দরকার। তেসা তাদের বলল, 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেছ এমনি একটা মুচলেখা সই করে দাও, তোমরা আবার চেম্বারের আসনে বসতে পারবে। কিন্তু ডেপুটিরা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সে চিৎকার করে উঠল 'গোঁড়া রাজনীতিক! ওদের জন্যে যা করা সম্ভব তা আমি করেছি।'

ফুজে আবার তার আক্রমণ আরম্ভ করল। মার্সাই-এর রাজনীতিক প্রচারকরা এই চঞ্চল জীবটিকে কোন মতেই ঠাণ্ডা করতে পারল না। সে জাহির করল, 'কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করার ফলে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ছে।' তেসা বলল, 'তাহলে তুমি কি হিটলারের পক্ষে?' অন্যান্য ডেপুটিরা হাততালি দিয়ে তেসাকে প্রশংসা করল। নানা ঠাট্টা তামাসার মধ্যে মঞ্চ ছেড়ে চলে এল ফুজে।

জীবনে কখনো এমনিভাবে পরিশ্রম করতে হয়নি তেসাকে। পলেতের সঙ্গে এক ঘণ্টা বসে আলাপ করবে এ অবকাশও তার নেই। এমন ক্লান্ত আর বিরক্ত বোধ করল নিজে যে সমস্ত কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করবে ভাবল। আত্মপ্রতারণা করে কী লাভ? অনেক বয়স হয়েছে তার! আর ক-দিনই বা বাঁচবে সে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে এ চিন্তা উড়িয়ে দিল। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কি ক্লেমসো ফ্রান্সকে রক্ষা করেনি? তেসা ভাবল, সে তো তারই উত্তরাধিকারী। তার মর্মরমূর্তি একদিন বড় বড় পার্কে শোভা পাবে। একবার সে পলেৎকে বলেছিল, 'লা রু তেসা—কথাগুলো নেহাৎ মন্দ শোনায় না।'

তেসাকে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে সমরবিদ্যা, অর্থনীতি, এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কারবার করতে হয়—কথা বলতে হয় তুলো সরবরাহ, নতুন বোমারু বিমান এবং বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে। প্রত্যেকেই তার কাছে নানা রকম দাবী দাওয়া নিয়ে আসে, অব্যবস্থার জন্যে নালিশ জানায়। আগে তাকে ডেপুটি আর বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হত। এখন তাকে সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, যদিও কোন সামরিক পরিভাষা তার জানা নেই। তাদের কি প্রতিশ্রুতি দেবে এবং কিভাবে এড়াবে এ কৌশলও সে জানে না।

'সামরিক বিভাগটা সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ,' সে চিৎকার করে উঠল, তারপর মনে মনে বলল, 'এবং নিকৃষ্ট জগৎ।'

জেনারেল দ্য ভিসে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে জেনে ভুরু কোঁচকাল তেসা। এই কুখ্যাত খুঁতখুঁতে লোকটির সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

জেনারেল দ্য ভিসে ১৯১৫ সালে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিতি পেয়েছে। তখন সে শেমাঁ-দে-দেম্-এ সৈন্য পরিচালনা করছিল। পায়ে চোট পেয়েও সে তার দায়িত্ব ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। চৌষট্টি বছর বয়সে এখনো তার প্রাণশক্তি আর উদ্দীপনা অক্ষুণ্ণ আছে। রোদ-ঝড়-লাগা গোলগাল মুখে আর রুক্ষ পীতাভ গোঁফে তাকে ঠিক ডালকুত্তার মত দেখায়। লোকটি অত্যন্ত দয়ালু কিন্তু বদরাগী। বৌয়ের ওপর তম্বি করে আর নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের গালিগালাজ দেয়। ফৌজ আর বাগান—এ দুটোর ওপর ভারী ঝোঁক তার। অবসর সময়ে সে জলের ঝারি নিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়ায়, গোলাপের ঝাড় বাঁধে, ডাল ছাঁটে আর কলম লাগায়।

সে কখনো রাজনীতি আলোচনা করে না; যখনই কোনও মন্ত্রী সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞাসা করা হয় সে উত্তর দেয়, 'সৈনিকরা এ ব্যাপারে একেবারে বোবা।' কেউ কেউ বলে সে একজন রাজতন্ত্রী—সিংহাসন দাবীদারদের হয়ে যারা দালালী করে, তাদের সঙ্গে তার মেলামেশা আছে। এবং অন্যান্যরা বলে, দ্য ভিসে হল একজন কমিউনিস্ট। জেনারেল পিকারের মতও তাই। সে প্রতিবাদ না করে মনযোগ দিয়ে ফুজের কথা শোনে ও সোভিয়েট বিমান বাহিনীকে প্রশংসার চোখে দেখে। সেদিন দ্য ভিসেকে গির্জায় দেখতে পেয়ে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল তেসা: মনে মনে ভেবেছিল, 'এ সবের পরও সে ফুজের বন্ধু!'

সে কী জন্যে দেখা করতে আসছে তার সঙ্গে? বোধ হয় সৈন্যবাহিনীতে বামপন্থী সংবাদপত্র পড়া নিষিদ্ধ করায় সে পিকার্ সম্বন্ধে নালিশ করতে এসেছে? কিংবা হয়ত সৈন্যবাহিনীতে ধর্মযাজকের রীতি স্বীকার করানোর জন্যে আসছে সে। ভগবানই জানেন সে কি জন্যে আসছে!

জেনারেলকে অত্যন্ত আরামপ্রদ আর্ম-চেয়ারে বসতে দিয়ে তেসা তার দিকে এক বাক্স সিগার এগিয়ে দিল।

'পার্তাগাস সিগার। খুব ভাল অবস্থায় আছে কিন্তু। মনে হয় দ্বিতীয় চালান

আসতে অনেক সময় নেবে। জাহাজগুলো সব অন্য মালে ভর্তি। তারপর জেনারেল, আমার কাছে কী দরকার ?' .

স্তু ভিসে এই কথোপকথনের জন্যে অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। বাড়ীতে বসে সে দেশপ্রেম সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা তৈরী করেছিল, তারপর গত যুদ্ধের শিক্ষা এবং সৈনিকের কর্তব্য। কিন্তু এখন সমস্ত কিছু ভুলে গেল সে। সে সিগারের শেষাংশ কামড়াল, থুথু ছিটোল এবং তারপর সোজাসুজি বলল, 'অবস্থা ভয়ানক সাংঘাতিক ! সব জিনিসের রীতিমত অভাব ! জানেন ব্যাটালিয়নে ক-টা মেসিনগান আছে ? বিমান বহরের কথা বাদই দিলাম। মাত্র দশটা বোমারু বিমান আছে আমার হাতে। হ্যাঁ, ভুল কথা বলছি; না। মাত্র দশটা। আর না আছে জুতো, না আছে কম্বল। তারপর শীত আসছে মাথার ওপর।'

দুঃখিত হয়ে মাথা নাড়ল তেসা, 'আমি জানি, সবই জানি। এ সমস্ত পপুলার ফ্রন্টের পরিণাম, মাইনে সমেত ছুটি দেওয়ার ফল। কিন্তু অবস্থা শিগগিরই বদলাবে। আমেরিকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনব আমরা।'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন কিনুন।'

'মনে হচ্ছে অর্থতত্ত্ববিদ নন আপনি, জেনারেল।' তেসা অনুগ্রহসূচক হাসি হাসল। 'আমেরিকা থেকে উড়োজাহাজ কেনা অত্যন্ত খরচের ব্যাপার। তার চেয়ে যন্ত্রপাতি কেনা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। তা ছাড়া ইঞ্জিনের খরচ বাঁচাতে হবে আমাদের। শিল্পপতিদের তো যুদ্ধং দেহী মনোভাব। মিয়েজারও আপত্তি জানিয়েছে—দেশীয় শিল্পের ক্ষতি করলে চলবে না। তবু আমি বলছি, আমেরিকা থেকে মাল আমরা কিনবই। ইতালিতেও আমরা কিছু অর্ডার দিয়েছি। ১৯৪১ সালের বসন্তকাল নাগাদ... '

'কিন্তু যদি তারা ১৯৪০ সালের বসন্তকালের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু করে ?' জেনারেল বাধা দিল।

'আমার চেয়ে আপনি ভালভাবেই জানেন যে ম্যাজিনো লাইন নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

'কিছুই অসম্ভব নয়। ওরা কত প্রাণ বলি দিতে তৈরী আছে তার ওপরই নির্ভর করবে ম্যাজিনো লাইনের ভবিষ্যৎ। তাছাড়া উত্তর দিকে ? সেখানে তো ম্যাজিনো লাইন আমাদের রক্ষা করবে না।'

'কেন লীজ দুর্গ আর এ্যালবার্ট খাল রয়েছে ও দিকে। বেলজিয়ানরা যদি

একবার যুদ্ধে নামে তাহলে সিংহের মত লড়বে ওরা। রীতিমত বীরের জাত ওরা।'

'হতে পারে। কিন্তু পরের ওপর নির্ভর করলে আমাদের চলবে না। উত্তর সীমান্তে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতেই হবে একটা।'

'অনেক বছর লাগবে তা করতে। আর তার ওপর আমাদের সমস্ত সংস্থান একসঙ্গে জড়ো করতে হবে। এবার যার হাতে সোনা আছে সেই জিতবে এই যুদ্ধে।'

অতিথির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞের হাসি হাসল তেসা। মনে মনে বলল, 'ইস্ কী ছেলেমানুষ!' লাল হয়ে উঠল জেনারেলের মুখ। বুকের ওপর নড়ে উঠল তার রিবনগুলো।

'আমি একজন সামরিক কর্মচারী। আজ্ঞা পালন করাই আমার কাজ। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারি না। জেনারেল পিকারের মত : সিগফ্রিড লাইন দখল করার জন্যে ১৯৪২ সালে আমাদের হাতে প্রচুর কামান থাকা দরকার। কিন্তু পোলাণ্ডে কি ঘটেছিল তা আপনি দেখেছিলেন। জার্মানদের হাতে কী পরিমাণ যান্ত্রিক বাহিনী আছে তাও অজানা নয় আপনার। রণাঙ্গন ভেদ করে তারা কখন এক বৃত্তাংশে এসে হাজির হবে কেউ বলতে পারে না। তবু শুনলাম ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানের উৎপাদন বাড়ানো তো হয়ইনি, বরং কমানো হয়েছে। কেন? কারণ সমস্ত শ্রমিককে বন্দী-শিবিরে পাঠানো হয়েছে। এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। তারা থলে বানাচ্ছে। তবু ভাল, চকোলেটের বাক্স বানাচ্ছে না। গ্রঁদেলের সঙ্গে দেখা করলাম। ও বলে, '১৯৪২ সালের আগে নয়।' মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এ ভয়ানক সাংঘাতিক অবস্থা। ভাল ভাল মজুরদের গ্রেপ্তার করে কি লাভ হবে?...'

ভয়ানক চটে উঠল তেসা, 'ফুজের কথা শোনা আপনার অন্যায়। কেবলমাত্র কমিউনিস্টদেরই বন্দী-শিবিরে পাঠানো হচ্ছে। সমরবিদ্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আপনিও রাজনীতিতে মাথা গলাতে আসবেন না!'

'এর সঙ্গে রাজনীতির কি সম্পর্ক? শুধু কামান আর বিমানবহরের কথা বলছি আমি।'

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে এক পাক ঘুরে নিল। তারপর জুরীকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গীতে হাত উঁচু করে কর্কশ গলায় বলল, 'জেনারেল, সে দিন আপনাকে গির্জায় উপাসনা করতে দেখলাম। সত্যি বলছি, দেখে ভয়ানক

আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমি নিজে একটি নাস্তিক পরিবারে মানুষ হয়েছি কিন্তু ধর্মকে আমি শ্রদ্ধা করি; একজন ধর্মাশ্রয়ীর আবেগকেও আমি গভীরভাবে অনুভব করি। বলুন, আপনি একজন ক্যাথলিক হয়েও কী করে কমিউনিস্টদের সহ্য করতে পারেন?'

'কমিউনিস্টদের সমর্থন করছি না আমি। সমস্ত সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব আমার কাঁধে। এর সঙ্গে ধর্মেরও কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এর জন্যে দায়ী হবে কারা? আমরা সমরবিদরা। আমি জার্মানদের ঘৃণা করি। বুঝতে পারলেন? তারা এই পারীতে পর্যন্ত হামলা করতে পারে। সুতরাং, যদি যুদ্ধাস্ত্রের জন্যে কারখানা চালু রাখতে হয়, তবে শুধু কমিউনিস্ট কেন শয়তানকে পর্যন্ত বহাল করতে রাজী আছি।'

'অকারণে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন,' তেসা বলল, 'ভুলে যাচ্ছেন যে এ যুদ্ধ অন্যান্য যুদ্ধের মত নয়। এ অনেকটা প্রায় 'সশস্ত্র শান্তির' মত। জানি না, গামলঁ্যা কেন হার্নট জঙ্গলে মিছিমিছি কতকগুলো লোকের জান খোয়াল। এমনিতে ফ্রান্সের জন্মের হার ভয়ানক নীচে। আমাদের দ্বিগুণ মিতব্যয়ী হতে হবে। জাঁকজমক দেখাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বড় বেশী খরচ করে ফেলব আমরা। তাছাড়া যুদ্ধের ভাগ্য সম্পূর্ণ অন্যভাবে নির্ধারিত হবে। আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল অবরোধ। তারপর বৃটিশরাই এর ঝুঁকি পোয়াবে। জার্মানরা দেখে দেখে বৃটিশদের জাহাজই ডুবিয়ে দিচ্ছে। এতো আমাদেরই সুবিধা। ইংলণ্ড অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে স্বস্তি-সম্মেলনে এসে উপস্থিত হবে। অবরোধের ফলে রীতিমত চাপ পড়বে। আমরা আরও ইস্ক্রুপ কষবো। খুব বেশী নয় যদিও। জার্মানদের একেবারে মরিয়া করে তোলা ভুল হবে। তা করলে তারা হয়ত সত্যিই ম্যাজিনো লাইন আক্রমণ করে বসবে। তাদের একটু ভয় পাইয়ে দেওয়া দরকার, তারপরে আপনিই পথে আসবে। আমরা জার্মানীর সঙ্গে কেন লড়ছি? এ এক মারাত্মক রকম ভুল বোঝাবুঝির ফল। মাফ করবেন, চিরকালই আমি নিজের মনের কথা খুলে বলি। একেবারে পেছনে থাকবে সৈন্যবাহিনী। সেনাপতিরা নয়, কুটনীতিকরাই এই যুদ্ধ জিতিয়ে দেবে।'

এর পর যখনই সে মন্ত্রীর সঙ্গে তার কথোপকথনের কথা উল্লেখ করত, চিৎকার করে উঠত ছ্য ভিসে, 'ও চাকরের মত ঘর থেকে বার করে দিল আমায়; বলল, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই আমার! ওরা আমেরিকা থেকে

অস্ত্রশস্ত্র কিনবে না। ওতে নাকি ভয়ানক খরচ। এখানেও কোন মাল তৈরী করবে না ওরা। মজুররা নাকি সব কমিউনিস্ট। এমন কি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতির দরকার নেই ; সৈন্যরা বসে বসে ঝিমোবে। কী চায় ওরা ? ওদের কাণ্ড কারখানা বোঝাই ভার।'

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা দেশের লোকদের উদ্দেশ্যে তেসা বেতার-বক্তৃতা দিল। মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলতে তার কেমন বিশ্রী লাগে! এখানে শ্রোতাদের সেই চাক্ষুষ উপস্থিতি কোথায়, উচ্ছ্বাসে যাদের চোখ জ্বলে ওঠে আর আর্দ্র হয়ে ওঠে বারবার। বেতারের একটি কর্মচারীকে দিয়ে সে তার পুরনো সংবাদবাহককে ডেকে পাঠাল।

'মোরিস, যতক্ষণ আমি বক্তৃতা দেব ততক্ষণ বসে থাক এখানে। সত্যিই তোমার মুখ দেখে অনুপ্রেরণা পাই আমি।'

মোরিস হাসল, তারপর একসময়ে বসল। সাড়ম্বর হাসি হেসে তার অভিভাষণ আরম্ভ করল তেসা :

'অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পেরিয়ে এবার আমরা সত্যিই অত্যন্ত গুরুতর কাজে হাত দিয়েছি। এ যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর এক বৃহত্তম অভিশাপ। শ্রেষ্ঠ নৈতিক সম্পদ ও খ্রীষ্টান মানবতাকে বাঁচানোর জন্যে আমরা অস্ত্র উঠিয়েছি ; বর্বর যান্ত্রিক শক্তিকে আমরা পোষ মানাবো। মারাত্মক অস্ত্র আছে আমাদের হাতে। যুদ্ধের কোন গোপন খবর প্রকাশ করে ফেলবার ভয় না রেখে আমি বলছি, এর আগে সত্যিই ফ্রান্সের আকাশ এত শক্তিশালী বিমানবহর দিয়ে ঢাকা ছিল না। এর আগে কোন দিন আমাদের দেশের মাটি এমনি বিরাটাকার জঙ্গী ট্যাঙ্ক-বাহিনীর গর্জনে কেঁপে ওঠেনি। ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে আমরা দিন রাত অবিশ্রাম পরিশ্রম করছি। এই কাজে সাহায্য করছে আমাদের মহানুভব বন্ধু বৃটিশরা এবং অ্যাটলান্টিক পারের গণতন্ত্রবাদীরা। কিন্তু আমাদের প্রকৃত শক্তি হল আমাদের মনোবল ও বন্ধুভাব যা আমাদের প্রত্যেকটি দল ও শ্রেণীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, আমাদের ঐক্য এবং ইচ্ছাশক্তি যা আমাদের জয়যুক্ত করবে। সভ্যতার অভিশপ্ত শত্রু যত দিন না ধ্বংস হচ্ছে ততদিন অস্ত্র কোষবদ্ধ করব না আমরা।'

মোরিস নড়তে চড়তে ভয় পাচ্ছিল।

সে কৃত্রিম হাসি হাসছিল চেয়ারের এক ধারে বসে...ছবি তোলানোর সময়ে যেমনি ভাবে হাসে লোকে।

৬

সৈন্যবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার বসল অর্থশালী আলসেশিয়ান শিল্পপতির পল্লী-প্রাসাদে। সংগীত-ভবন আর বিলিয়ার্ড-ঘর শুদ্ধ প্রকাণ্ড বাড়ী; সন্ধ্যাবেলা সরকারী কর্মচারীরা এখানে চিত্তবিনোদন করতে আসত। এখন লাইব্রেরী-ঘরে অফিসাররা বসে বসে মানচিত্র অধ্যয়ন করছে। সম্পাদকদের কামরা যা কিছু দিন আগে পর্যন্ত শিশু-সদনের কাজে ব্যবহৃত হত, একাধিক টাইপ-রাইটারের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। ঠিক মিকি-মাউসের ছবির নীচে বসে বসে কাজ করছে স্টেনোগ্রাফার-সম্পাদক লুসি। ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নেওয়ার খেয়াল হয়নি কারও। মেয়েটির মাথায় খড়ের রঙের চুল এবং বেগুনী রঙের টানা-টানা ভুরু। সেনাপতির প্রিয়পাত্র মেজর লেরয়ের চোখ আছে মেয়েটির ওপর।

বাড়ীর মালিকের খুঁটিনাটি জিনিসের ভয়ানক শখ। যে লেখবার টেবিলে সেনাপতি লেরিদো কাজ করে সেখানকার কালির দোয়াতের আকৃতি ঠিক পিসা টাওয়ারের মত, কোপেনহেগেনের চিনেমাটির তৈরী পেঙ্গুইন পাখী, এবং দেওয়াল ঘড়ি যার ডায়ালে পারী, সান ফ্রান্সিসকো ও টোকিওর সময়ের নির্দেশ একই সঙ্গে মেলে। কাজ করতে বসে ভেঙে যাবার ভয়ে সেনাপতি প্রায়ই পেঙ্গুইন পাখীটাকে পাশে সরিয়ে রাখে। কোন কিছু নষ্ট হওয়ার দৃশ্য চোখের ওপর দেখতে পারে না সে। কাঠের নক্শা আঁকা মেঝের ওপর এক ফোঁটা কালি পড়তে দেখলে বা সৈন্যদের বুট দিয়ে মাড়াতে দেখলে সে ভীষণ চটে ওঠে।

কারও কারও মনে হতে পারে যে এমনি প্রকৃতির লোকের পক্ষে জীবনে অন্য পথ নেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আসলে লেরিদোর পরিবারের সমস্ত লোকই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ১৯১৪ সালে লেরিদো একটা রেজিমেণ্ট পরিচালনা করত। কৃতিত্ব দেখানোর ফলে তাকে সেনাপতির পদে তুলে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। শীর্ষস্থানীয় ও অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় এ সম্বন্ধে তার দক্ষতা অনস্বীকার্য। সে নিজে থেকে কখনো সামনের দিকে এগোত না। তার ধারণা, সে ফশের শিষ্য। সে প্রায়ই বলে, 'স্থিরতা ও মাত্রাজ্ঞান—এ দুটো গুণ আমাদের সব চেয়ে অপরিহার্য।' সব

সময়ে অমায়িক, পরিচ্ছন্নভাবে দাড়ি কামানো আর ও-ডি-কোলোনের গন্ধ সারা গায়ে। বলতেই হবে সেনাপতি হিসেবে সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও পরিচিত। তার একমাত্র অসুবিধা যে সে ক্ষুদ্রাকার। সেজন্যে কেউ তার পাশে দাঁড়ালে সে কখনো ফটোগ্রাফারদের তার ছবি তুলতে দেয় না।

তার সাফল্যের জন্যে দায়ী তার কৌশল। ডেপুটিদের সে ঘৃণা করে কিন্তু কেউ তার উপস্থিতিতে রাজনীতি আলোচনা করলে সে উত্তর দেয়, 'দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর আমার অবিচলিত আস্থা আছে।' ব্রতৈল, দুকান ও ভাঁইয়ার, সকলের সঙ্গেই তার সদ্ভাব। মার্নের সাফল্যের পেছনে পঁচাত্তর মিলিমিটার কামানের কীর্তি বা ক্লাশিকাল কবিতার সৌন্দর্য—এই নিয়ে তাদের সঙ্গে সে মনের আনন্দে কথা বলে। সাহিত্যের ওপর তার অগাধ আগ্রহ! রাসীন ও কর্নেই-এর রাজসংস্করণ কিনেছে সে। ত্রিশ বছর আগে সে এক প্রাদেশিক পত্রিকায় 'গুঁধালের কতকগুলো ভুলত্রুটি' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপিয়েছিল। সমর-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শাত্র্যাস্ দ্যু পার্ম্ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল প্রবন্ধটিতে।

লেরিদো তার বৃত্তিকে ভালবাসে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অরাজকতা দেখে হতাশ হয়ে পড়ে সে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে যা অত্যন্ত নিখুঁত বলে মনে হয়েছিল তা যেন হাজার রকম ঘটনার মধ্যে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আর গত তিন মাস থেকে সে যেন ক্রমশ কেমন রোগা আর বুড়ো হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে কেমন একটা যন্ত্রণা হয়, ডাক্তার বলে তার লিভার খারাপ। সত্যিই রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছে লেরিদো। সব কিছুতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ওই অতটুকু ছোট্ট তার লড়াইয়ের এলাকা—এর মধ্যে এত সৈন্যকে কী কাজে লাগাবে সে? সে ক্রমাগত নালিশ জানাতে লাগল, 'আসলে আমাদের বিপদ হল আমাদের সৈন্যের সংখ্যাধিক্য।' খোলা আকাশের নীচে কাতারে কাতারে শুয়ে রইল মানুষ এবং নভেম্বর মাস জুড়ে এল ইনফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক। অফিসাররা তাদের সৈন্যদের পেট পুরে খাওয়াল কিন্তু কোন কাজের নির্দেশ দিল না। বিরক্ত হয়ে মদ খাওয়া ধরল সৈন্যরা। যখন লেরিদো শুনল যে গামলাঁ্যা সিগফ্রিড লাইন আক্রমন করার জন্যে প্রচুর ভারী ভারী যুদ্ধাস্ত্র মজুত করছে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অফিসারদের হাতে একটা রিভলবার পর্যন্ত নেই।'

হেড কোয়ার্টারের প্রাত্যহিক রুটিনের ওপর লেরিদোর কড়া নজর। প্রত্যেকে ভোর ছটায় ওঠে। কর্নেল মোরো তাদের হাজিরা নেয়। লেরয় বসে বসে ক্লান্তিকর খবরের কাগজ পড়ে নয় তো সম্পাদকদের কামরায় গিয়ে উঁকি মারে—লুসি হয়ত তখন আঙুল চালাচ্ছে তার যন্ত্রের ওপর। মেজর জিসে কমিশেরিয়ট অফিসারদের উৎসাহ-বাক্য শোনায়। কর্নেল জাভৎ বসে বসে মানচিত্র দেখে। স্বপ্নপ্রবণ কেশহীন ক্যাপ্টেন সাঁজে. পারীর কাফেগুলোর কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর সেনাপতির কাছে খবর পাঠায়ঃ 'জুইন্‌কারে দুজন সৈন্য নিহত হয়েছে......ষোড়শ ডিভিশনের সামনের দিকে শত্রু-সৈন্য চলাচল করতে দেখা গিয়েছে। জার্মানরা ১৮৬ তম রেজিমেণ্টকে ফ্রণ্টে পাঠিয়েছে।......গতকাল কোন শত্রু-বিমান লক্ষ্য করা যায়নি। তানভিলে একটা যৌন-ব্যাধি হাসপাতাল খোলা হয়েছে।' পেঙ্গুইন পাখীটা পাশে সরিয়ে রেখে সেনাপতি বিড়বিড় করে, 'তাইতো!' তারপর বারোটার সময় সবাই লাঞ্চ খেতে বসে।

সেদিন স্ট্রাসবুর্গের নতুন খাবার পরিবেশন করা হলঃ 'পাতে স্ত ফোয়া গ্রা।' কর্নেল মোরোর মতে এ হল স্থানীয় দেবতাদের উপহার। সেনাপতি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল; ডাক্তার তাকে পথ্য দিয়েছে। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সে বলল, 'তোমার জন্যে সব্‌জিই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার। বয়স হলে মানুষ ঘাস-খেকো জন্তু হয়ে যায়। এটা প্রকৃতির আর একটা নিয়ম।'

ক্যাপ্টেন সাঁজে অপরাধীর মত এক টুকরো সুস্বাদু 'পাতে' মুখে পুরে দিল। বলল, 'সত্যি কথা।'

নিরামিষাশী হিটলার সম্পর্কে ওরা কথা বলল। সেনাপতি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলে চলল, 'তাইতো! বড় মজার ব্যাপার কিন্তু।' এর পর মেজর লেরয় সংবাদপত্রের মতামত জানাতে লাগল।

ফিনলাণ্ড তখনকার প্রধান আলোচনার বিষয়। প্রত্যেকে অবাক হয়ে দেখছে শেষ পর্যন্ত রুশরা কি করবে!

সেনাপতি হঠাৎ সজীব হয়ে উঠল, 'সত্যিই কী মজার ব্যাপার! ওরা হয়ত সাঁড়াশী আক্রমণ শুরু করবে; বথনিয়া উপসাগর দিয়ে এসে সুইডেন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেবে হেলসিঙ্কিকে। আবার মানারহাইম লাইনের ওপরও সোজাসুজি হামলা চালাতে পারে। আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে ওরা কি করে।' ফিনলাণ্ডের যুদ্ধ তার কাছে একটা

সামরিক সমস্যা। এক সময়ে সেনাপতি আবার পারীর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের মধ্যে ফিরে এল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলল ম্লানমুখে: 'তারপর আমাদের দেশের কী খবর ?'

'অত্যন্ত সামান্য। সেন্সার 'লেপোক্'-এর গলা টিপে ধরেছে।'

'ঠিক হয়েছে। এ নিশ্চয়ই কেরেলি বা দুকানের কোন প্রবন্ধ। বুঝি না কেন যে ওদের লিখতে দেওয়া হয়।'

কর্নেল মোরো জেনারেল পিকারের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তারা দুজনেই দুকানকে ঘৃণা করে।

'পারী থেকে ওরা লিখেছে যে দুকান্ এখানে আসতে চায়,' কর্নেল বলল, 'যেন ও ছাড়া কাজ চালাতে পারছি না আমরা।'

ক্রুদ্ধ হলেই সেনাপতি সর্বদা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। এখনো ঘন ঘন ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, 'কক্ষনো নয়! দালাদিএ এ ধরনের উপকার না করলেই ভাল করবে। দুকান সকলের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিতে ওস্তাদ। আমি নিজে ওকে বলতে শুনেছি, 'জার্মানরা এই বসন্তকালেই প্রকাণ্ড হামলা শুরু করবে।' ওসব লোকের কাছ থেকে তুমি কি আশা করতে পারো? এক সময়ে ও ছিল বৈমানিক কিন্তু সমরবিদ্যার ব্যাপারে ও এক আকাট মূর্খ। ও সময়ের অনেক পেছনে রয়েছে; কোন কিছু খতিয়ে দেখার ক্ষমতা ওর নেই। ওর ধারণায় ম্যাজিনো লাইন হল এইন বা সম নদীর ধারের দুর্গগুলির মত একটা কিছু।' অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে একটা পেয়ার ফল বাছাই করল; তার সর্বাঙ্গ হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ফলটা বেশ রসালো কি না। তারপর ফলের ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়াল; রসের ফোঁটাগুলো মুছে ফেলল হাত থেকে। 'দেখেছ, ছুরিটা কি ভাবে যাচ্ছে, যেন মাখন। পেয়ারটা নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু হবে......চেখে দেখবে নাকি, মেজর?' পেয়ারের আধখানা টুকরো সে সাঁজের হাতে তুলে দিল। 'দুকানের বুকুনির মধ্যে সোজাসজি জেনারেল দ্য গলের প্রভাব ধরা পড়ে। আমি নিজে দ্য গলের রিপোর্ট পড়েছি। গামলাঁ্যার কথাই ঠিক, ও হল বিচিত্র লোক। কিছুতেই ও বুঝবে না যে জার্মানরা ধাপ্পা দিচ্ছে। পোলাণ্ড এবং স্পেন যেখানে এ্যানার্কিস্টরা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, এবং আমাদের ফ্রন্ট......সব কিছু এক সঙ্গে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে সে। যাই হোক, এটা অত্যন্ত খারাপ কথা যে জনসাধারণ সমর-বিজ্ঞানের বইগুলো

না পড়ে খবরের কাগজের উত্তেজনাপূর্ণ মালমশলা থেকে খোরাক সংগ্রহ করছে। ম্‌ গলের ধারণা, ও নিজে একজন মস্ত বড় প্রতিভাবান লোক কিন্তু আসলে ও অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির। ওর মন পড়ে রয়েছে সিড্যান বা নেপোলিয় আমলের সমরবিদ্যার ওপর। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা ও ভুলে গেছে। ও কল্পনা করছে ইউরোপের মধ্যে ট্যাঙ্কের বৈদ্যুতিক অগ্রগতির কথা যেখানে একদিন দ্রুত অশ্বারোহী খুরের দাগ এঁকে গেছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে গেছে। আমরা বিলম্বিত অবরোধের কৌশল গ্রহণ করেছি। এ হল ট্রয়ের যুদ্ধের যুগ ; তাই নয় ?'

রীতিমত যত্নের সঙ্গে ন্যাপকিনটা পাট করে রিং-এর মধ্যে গলিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। ড্রয়িং-রুমে কফি পরিবেশন করা হয়েছে।

'সেনাপতি ম-নে আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে।' কর্নেল মোরো বলল, 'ডাইভ বমিং সম্বন্ধে সৈন্যদের কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ওরা কিছুটা কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করতে চায়।'

'কৃত্রিম' যুদ্ধ' কথা দুটো লেরিদোকে শান্তির সময়ের কথা মনে করিয়ে দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কোঁচকাল সে : বোধহয় আবার একটা গোলযোগ বাধাবার তালে আছে ম-নে। আসলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে ও। প্রত্যেককে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার একটা কুৎসিত চেষ্টা ওর মধ্যে চোখে পড়ে।

'নগর-কর্তা কিন্তু এর একেবারে বিরুদ্ধে,' মোরো বলে চলল, 'কারণ মানস্টারের পর আর কোন লোকই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়নি। তাছাড়া চাষীরা ভয় পাচ্ছে—ওদের আঙুর ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

মাথা নাড়ল সেনাপতি। 'নগর-কর্তার সঙ্গে আমি একমত,' সে বলল, 'বিশেষ করে আলশেসিয়ানদের প্রতি আমাদের ভদ্র হওয়া উচিত। এ একটা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। ডাইভ বমারের আশঙ্কার কথা মানলাম্‌, কিন্তু সে কোথায় ? পোলাণ্ডে কিংবা স্পেনে, যেখানে একটিও বিমান-ধ্বংসী কামান নেই। জার্মানরা কোন বিষয়ে এতটুকু ইঙ্গিত দিলেই এই সব মূর্খ লোকেরা লাফালাফি শুরু করে দেয়। গুজব শুনলেই ভয়ে সারা। সেনাপতি ম-নে জেনে রাখুন যে সাধারণ কসরৎ করলেই চলবে, আর বেশী কিছু দরকার নেই। তাছাড়া লোকদের একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার।'

লাঞ্চ খাওয়ার পর জেনারেল ও ক্যাপ্টেন সাঁজে সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শনে

বার হল। শিল্পপতি ম্যিয়েঞ্জারের ছেলে লেরিদোর গাড়ীচালক। ছেলেটি অত্যন্ত খেলোয়াড় মনোভাবাপন্ন। বাবার প্রভাবে খাস হেড-কোয়ার্টারে কাজ পেতে কষ্ট হয়নি। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মোটর এগিয়ে চলল। ম-নে ক্রমাগত মনে করিয়ে দিল, 'অত তাড়াতাড়ি নয়, বুঝলে বন্ধু, অত তাড়াতাড়ি চালিও না গাড়ী।'

গাড়ী-চালকের সঙ্গে কথা বলতে লেরিদো ভালবাসে। আশে পাশে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে সমস্ত কিছু জানে শোনে তরুণ ম্যিয়েঞ্জার।

'তারপর, আর কি খবর?'

'তেমন কিছু না, জেনারেল। মানস্টারের একজন উকিলের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। ও পেরিগো থেকে নিজের মালপত্তর নিতে এসেছিল। ও বলল, রসেৎ ঘটনায় ভয়ানক খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে আলশেসিয়ানদের মনে।'

'আমি ঠিক যা মনে করেছিলাম তাই।' লেরিদো সাঁজের দিকে তাকাল, 'পারীতে ওরা একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। এমন কি রসেতের সঙ্গে জার্মান গুপ্তচর বিভাগের যোগাযোগ থাকলেও তা এখন বাইরে জাহির করা উচিত হয়নি। এখন রাজনীতিক কলহ বাড়িয়ে কী লাভ হবে?'

জেনারেল গাড়ী-চালকের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কর্নেলকে তুমি ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'আমরা আরস্টিনে গিয়েছিলাম। মেজর লেসেজ নালিশ জানাল যে ওখানকার সৈন্যরা নাকি শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

ম্যিয়েঞ্জারের ইচ্ছা, লোকেরা কিভাবে মেজর লেসেজের সর্বাঙ্গে গোবর লেপে দিয়েছিল সে কাহিনী খুলে বলে, কিন্তু সে নিজেকে কোন মতে সংযত করল; গল্প শুনে হয়ত ক্ষেপে উঠবে জেনারেল। বেচারী লেসেজ—কি-ভাবে আর্তনাদ করে উঠেছিল সে কথা ভেবে মনে মনে রীতিমত হাসি পেল ম্যিয়েঞ্জারের।

'তুমি কি করতে পারো?' লেরিদো বলল, 'ওরা সত্যিই ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ওদের জন্যে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে।'

স্ট্রাসবুর্গের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। সমস্ত শহরটা কেমন জনশূন্য। গত আগস্ট মাসের পুরনো খবরের কাগজগুলো এখনো ঝুলছে কিয়স্কের জানলার পেছনে। কাফেগুলোর মেঝের ওপর মার্বেল-টেবিল আর বেতের চেয়ারগুলো খদ্দেরের জন্যে অপেক্ষা করছে। গির্জার সামনের বারান্দায়

বালির বস্তার স্তূপ। পার্কের ঘড়িগুলোর প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা রকম সময়। দোকানে লিলাক রঙের ড্রেসিং গাউন ঝুলতে দেখে হু হু করে উঠল জেনারেলের মন—সত্যিই সোফিরও এমনি ড্রেসিং গাউন ছিল একটা। চার বছর হল সে তার দ্বিতীয় বৌ-কে বিয়ে করেছে……আমি ডাক্তারের একটি যুবতী মেয়ে। ছাব্বিশ বছর বয়সে সোফি রীতিমত বিচক্ষণ হয়ে উঠেছে। লেরিদো বাড়ীতে থাকলে সকলে নিঃশব্দে চলাফেরা করে; সোফি স্বামীর জন্যে তার অত্যন্ত প্রিয় খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত থাকে……বাছুরের মাথা দিয়ে আ লা ভিনেগ্রেৎ। তার বৌ কর্সিকান চামেলীর সুগন্ধ ভালবাসে; আর ভালবাসে এক সঙ্গে অনেকটা সুগন্ধ ব্যবহার করতে।

উৎরাই-এর একধারে একটা চূড়োর ওপর পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র, গাছের ডালপালা দিয়ে ঢাকা। লেরিদো দূরবীণ দিয়ে দেখল, একটা বাক্সের কাছাকাছি কতকগুলো সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। স্বভাবতই সে ভাবল যে ওরা শত্রু। তারপর তার চোখে পড়ল একটা বিরাট দেওয়াল-পত্র, তাতে লেখা আছে, 'ফ্রান্সবাসীগণ, ইংলণ্ড তোমাদের দেশের শত্রু!' পাশে হিটলার ও জোয়ান অফ আর্কের ছবিতে লেখাটা ঢাকা পড়েছে। 'ইস্, কী অভদ্র!' ভ্রূভঙ্গী করে লেরিদো বলল। সামরিক কাজকর্মের বদলে ওরা প্রচার করতে নেমেছে। যেন যুদ্ধ একটা নির্বাচনী প্রোপাগাণ্ডা। আরও এগিয়ে তার চোখে পড়ল বাদামী চালাওলা ঘর, পুরু নীল ধোঁয়া আর আঙুর-ক্ষেত। সত্যিই অবর্ণনীয় দৃশ্য! এ এক আশ্চর্য রকম যুদ্ধ স্বীকার করতেই হবে। মনে মনে কল্পনা করা যায় যে সৈন্য-চলাচল শুরু হয়ে গেছে…… দূরের অশ্বারোহী বাহিনী নদী অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। ১৯১৬ সালে সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল যুদ্ধের চেহারা। পেরনের বীভৎস ধ্বংসের কথা এখনো তার মনে আছে, মনে আছে পাথরের স্তূপ, খানা-খন্দ আর মৃত মানুষের অস্থি-কঙ্কালের দৃশ্য। এবার কিন্তু সে রকম কিছু ঘটবে না। সেবার আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম গান গাইতে গাইতে, লাল পায়জামা পরে। এবার ম্যাজিনো লাইন আমাদের প্রতিরোধ-দুর্গ।

কর্দমাক্ত পথে হাঁটতে লাগল লেরিদো। মাটিতে কেমন একটা সোঁদা গন্ধ। মেঘের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল শীতকালের ম্লান সূর্য। হঠাৎ সংগীতের ঝংকার কানে এল…সুবার্টের সংগীত। সোফিও এই গৎ বাজাতে ভয়ানক ভালবাসত।

'কী ওটা ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার বলল, 'ওটা লাউড স্পীকার। সংগীত দিয়ে আমরা জার্মান প্রোপাগাণ্ডাকে ডুবিয়ে দিচ্ছি'। শত্রুপক্ষও এই পরিচিত সংগীত শুনছে। আমরা ওদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে জার্মানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই আমাদের।'

'সত্যিই, বড় চমৎকার পরিকল্পনা কিন্তু।' লেরিদো বলল।

'অনেকে প্রস্তাব করেছে যে এই সংগীতের মাঝখানে আমাদের জার্মান ভাষায় সংক্ষিপ্ত আবেদন জানানো উচিত। ২৭নং ডিভিসনে ওরা এমনি বক্তৃতা করছে। কিন্তু এ প্রস্তাব পছন্দ হল না আমার।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। যুদ্ধ যুদ্ধই। রাজনীতি নিয়ে রাজনীতিকরাই মাথা ঘামাক। এই কনসার্ট কি সারাদিন ধরে চলে ?'

'আজ সকালে কিছুটা কামান-যুদ্ধ হয়েছিল, সাতটা থেকে সাতটা চল্লিশ পর্যন্ত। ওদের কামানগুলো......'

'জানি, ও সব জানা আছে আমার। কেউ হতাহত হয়েছিল নাকি ?'

'তিনজন মারা গেছে, আর একজন সার্জেণ্ট মারাত্মক চোট পেয়েছে।'

কয়েক মুহূর্ত সমস্ত কিছু নিস্তব্ধ মনে হল। রাইনের ওপার থেকে ভেসে এল ফরাসী গান :

ওরা তোমায় বিক্রি করে
দিয়েছে যে আড়ালে আবডালে
ইংলণ্ড তার কামান পাঠায়
আর, ফ্রান্স তার বুকের রক্ত ঢালে।

২৭নং ডিভিশনের হেড-কোয়ার্টারের দিকে তারা অগ্রসর হল। ওরা রাজনীতিক প্রচারকার্য নিয়ে মাতামাতি করছে কিনা তা জানার জন্যে লেরিদো অত্যন্ত উৎসুক। সকালের দিকে আরস্টিনের কাছাকাছি একটা জার্মান জঙ্গী বিমান ভেঙে পড়েছে—একথা শুনে লাউড স্পীকারের কথা একেবারে ভুলে গেল সে। বিমানচালক মারা গিয়েছে এবং মৃতদেহের সঙ্গে যে দলিলপত্র পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে বিমানচালকটির নাম লেফটেনেণ্ট কার্ল ফন সিরাউ।

লেরিদো শবদেহ নিয়ে একটা জমকাল শোভাযাত্রা বার করার নির্দেশ দিল।

'এই হল আসল প্রচারকার্য!' সে বলল, 'আমরা দেখিয়ে দেব যে, শত্রুকে

কি করে সম্মান করতে হয় তা আমরা জানি। আমি গিয়েই কর্নেল মোরোকে পাঠিয়ে দেব।' এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল লেরিদো, 'তুমি ফন সিরাউ বললে, না?......ফন......নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে ও। এর একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া হবে জার্মানীতে। আমি নিজেও আসতে চেষ্টা করব।'

হাসপাতাল পরিদর্শন করে সে সৈন্য-ব্যারাকে উপস্থিত হল। তাকে দেখে সৈন্যরা তাড়াতাড়ি কোট চাপা দিল তাসের ওপর।

'তারপর, কি হে তোমরা খুব বিশ্রাম নিচ্ছ, না?'

'হ্যাঁ, জেনারেল।'

আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে লেরিদো বেরিয়ে গেল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তার কানে গেল, 'হাঁদারাম!' এর আগেও একবার পারীর রাস্তায় সে এমনি অপ্রীতিকর সম্বোধন শুনেছিল কিন্তু তার সামনে কেউ তাকে নিয়ে তামাসা করতে সাহসী হবে এ কথা কল্পনা করতেও পারেনি সে। নিশ্চয়ই লোকটা কমিউনিস্ট না হয়ে যায় না। লেরিদো তার ঠোঁটে জিভ ছোঁয়াল। মনের দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ক্যাপ্টেন সাঁজে—একটু আগে সে তিন দিনের ছুটির জন্যে আর্জি জানাবে ভেবেছিল।

ফেরার সময় সারাটা পথ অপমানের কথা ভাবতে ভাবতে এল লেরিদো। শাতোর হলঘরে একটা আয়না। আয়নার কাছ দিয়ে যাবার সময় জেনারেল ফিরে দাঁড়াল, ডেকে পাঠাল কর্নেল মোরোকে।

'২৭নং ডিভিসন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। তাদের দেখে অত্যন্ত খারাপ ধারণা হল। লোকদের শিক্ষা দেওয়ার বদলে ম-নে প্রচারকার্যের পেছনে সময় নষ্ট করছে। জার্মানদের কাছে রাজনীতিক বক্তৃতা পাঠাচ্ছে ও। হয়ত আশ্রয়প্রার্থী বা কমিউনিস্টদের বক্তৃতা। প্রধান সেনাপতির কাছে এখনই একটা রিপোর্ট পাঠানো দরকার আর তার একটা অনুলিপি পাঠাতে হবে দালাদিএর কাছে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কর্নেল। ভেবেছিল একটু বিলিয়ার্ড খেলবে—ফিরতি-ম্যাচ দেবে মেজর জিসেৎকে......একশো একশো করে দুটো খেলা।

'ও আবার ঠোঁট চাটছে। কে নাকি ওকে হাঁদারাম বলেছে। গতকাল আমি ভাবলাম, ও বুঝি পারীতে চলে যাবে। কী এক জীবন!'

ছটা বাজল। লুসি বাদে খালি হয়ে গেল সম্পাদকের কামরা। সে এখনো

কাজ করছে। এক সময়ে সে টাইপ করা বন্ধ করল: 'ভ্যাবোয়া পিয়ের, সার্জেণ্ট' কাগজগুলো সে মুড়ে রাখল, টাইপরাইটারের ওপর একট আচ্ছাদন টেনে দিল এবং তারপর অত্যন্ত সযত্নে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে ওপর তলায় উঠে গেল। মেজর লেরয় অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

'শ্রীমতী, কল্পনা করো আমরা ভেনিসে নৌকোবিহারে বার হয়েছি!'

ভোর থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নেমেছে, শীতকালের একঘেয়ে কনকনে বৃষ্টি। পীতাভ ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন বিরক্ত লাগে। পিয়ের তার জলে-ভেজা বাদামী বুটজোড়ার দিকে তাকাল। আবার সে ঘন ঘন কোন একটা জিনিসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, কি যেন একটা খুঁজছে সে। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না তার। এমন কি সে নিজেও মনে মনে কিছু ভাবছে না। তার চারদিকের ঘূর্ণমান জগতটাকে কেমন অস্পষ্ট আর অবাস্তব মনে হল তার কাছে। নিজের গায়ে আঁচড় কেটে চিৎকার করে সে প্রমাণ করতে চাইল যে সে ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছে। কোন কিছুই ঘটল না। উনচল্লিশ নম্বরের পল্টনের প্রাইভেট হিসেবে জলে ভিজে ভিজে সে লিস্ত্-এর মহাকাব্য বা সার্জেণ্টের গালিগালাজ শোনে— মাঝে মাঝে কামানের হুমকি এসে বাধা দেয়। সমস্ত কিছুর মধ্যে কেমন একটা বিভীষিকা রয়েছে, কিন্তু পিয়ের সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

গত আগস্টের এক গরম দিনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কেমন আরামে আড়মোড়া ভেঙেছিল সে। আনে কফি তৈরী করতে ব্যস্ত ছিল; তুতু খেলা করছিল মেঝের ওপর, তার ছোট্ট বাদামী ঘোড়াটা দোল খাচ্ছিল ঝলমলে রোদের আলোয়। আজ সে সব কিছু স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর থেকে কেমন একটা কুড়েমির মধ্যে ডুবে গিয়েছে। নিজের ইচ্ছেয় চলাফেরা পর্যন্ত করতে পারে না সে; কদাচিৎ সে কথা বলে। কোলাহল-মুখর জীবনের আবেদন আছে তার প্রকৃতির কাছে।

তার নিজের দেশে বছরের এ সময়টা গরম; ডিসেম্বরের ফুলে রঙিন হয়ে ওঠে গোলাপ গাছগুলো, দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় মাউণ্ট কানিগোর উলঙ্গ

বাদামী চূড়োগুলো। একবার চূড়ো পর্যন্ত উঠেছিল সে। এখানে কিন্তু সারা দিন বৃষ্টি, আজ, কাল, পরশু—বৃষ্টির পরিসমাপ্তি নেই যেন। তারপর আবার আকাশের লাউড-স্পীকার থেকে গান ভেসে আসবে অপ্সরীদের—নোংরা পেঁজা তুলোর মত বিষণ্ণ আকাশ।

বাড়ী ছাড়ার আগে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছিল পিয়ের। আনে বুঝতে পেরেছিল ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে পিয়ের। তাই পালাবার পথ খুঁজছিল সে।

'পিয়ের, চল আমরা কোথাও চলে যাই। আমেরিকাতেই চলো। সেখানে কাজ জুটিয়ে নেব আমরা।' সে বলেছিল।

পিয়ের মাথা নাড়িয়েছিল, 'না, তাতে কারও কোন ভাল হবে না। তুমি কি ভাবছ, নিজেকে বাঁচাতে চাই আমি? সে সব বিগত দিনগুলো আর ফিরিয়ে আনতে পারব না আমরা।'

পপুলার ফ্রন্টের কথা মনে মনে ভাবছিল সে।

অতীতে সে ভাবত যে সে নিজে ঘটনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করছে এবং সাধারণ দায়িত্বের মধ্যে তারও অংশ রয়েছে। এমন কি ভীইয়ারের বিশ্বাসঘাতকতার পরও সে বলতে পারত, 'হ্যাঁ, আমি উড়োজাহাজ পাঠাচ্ছি।' কিন্তু এখন সে কাঠুরের কুড়ুলের ঘা খাওয়া গাছ। আজ তার মৃত্যুও ঘটনার স্রোতকে এতটুকু স্পর্শ করবে না।

তার আসার দিন আনের সঙ্গে প্রায় একটা ঝগড়া বাধিয়ে ফেলেছিল সে। আনে উদ্বিগ্ন হয়ে ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিন্তু তুমি এই-ই তো চেয়েছিলে...'

সে রাগ করে উত্তর দিয়েছিল, 'এ যুদ্ধ নয়! এ আমাদের যুদ্ধ নয়......'

আনে তফাৎটা বুঝতে পারেনি। তার কাছে যুদ্ধ যুদ্ধই..... গোলাগুলি, কাদা, রক্ত আর মৃত্যু। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে ভিন্ন—এ বিচার কোন্ ভিত্তিতে করবে পিয়ের? তার এই প্রচেষ্টার ঘোর প্রতিবাদ জানাবে আনে, বলবে, 'এ কেবল কথার প্যাঁচ, রাজনীতি, বাজির খেলা।' কিন্তু পিয়েরের কাছে এ হল বাস্তব সত্য। যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের মার্চ করার শব্দ কেমন ভিন্ন, কেমন আলাদা। কারও গলায় গানের সুর নেই এতটুকু। ধ্বংসের পথে চলেছে—এমনি ক্লান্ত আর বিষণ্ণ তাদের মুখগুলি। এতে কিছুমাত্র স্বস্তি পায়নি পিয়ের।

পিয়ের এখন বুঝল কী তাকে মিশো থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাদের

পুরনো তর্ক-বিতর্কগুলো কিছুমাত্র আকস্মিক নয়। মিশো সত্যিই একটা সরল চরিত্র। সে ভেঙে পড়তে পারে এবং যদি পড়েই তো গতকাল জুল যেভাবে পড়েছিল তেমনি ভাবে পড়বে। কিন্তু মিশোকে বেঁকাতে পারবে না কেউ; সে হাসবে, চিৎকার করবে—'ঠিক তাই' এবং তারপর আবার নতুন করে বেঁচে উঠবে আক্রমণের ভেতর থেকে। এখন সে কোথায়? অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে জলে ভিজছে? বন্দীশালায় আটক পড়েছে? তার সঙ্গে এখন কথা বলতে পেলে কেমন উল্লসিত হয়ে উঠত পিয়ের! যদিও মিশো কোন কাজে আসবে না তার। মিশো বলবে, 'সামনে তাকিয়ে দেখ। ঘটনার অনিবার্য গতি.........'

নিঃসঙ্গতার বোঝা মনে মনে অনুভব করল পিয়ের। মনে করল ব্রেতঁর একদল ধর্মপরায়ণ ও ভীরু চাষীদের মধ্যে বসে আছে সে। তাদের বলা হয়েছে যে সে নাকি একজন বিধর্মী এ্যানার্কিস্ট, স্পেনের বহু গির্জায় সে আগুন লাগিয়েছে। ব্রতৈলের 'বর্মধারীদের' মধ্যে জেনারেল এস্তেরেল অত্যন্ত খর্বকায়। কবিতার ওপর তার দারুণ ভক্তি। তার মতে দারিদ্রের মধ্যে রোমান্স আছে এবং ফ্যাশিজমের মধ্যে একটা 'গূঢ় জ্ঞান' লুকিয়ে রয়েছে। তার নিজের লোকদের প্রতি তার রীতিমত অবজ্ঞা, গায়ে ঘামের গন্ধ, অত্যন্ত ভাঙা-ফুটো ফরাসী ভাষায় কথা বলে, কাঁধের চওড়া ফিতের ওপর স্যাঁ গোয়েনলের প্রতিকৃতি। পিয়েরকে ভয়ানক ভয় করে এই লোকটা। অন্যান্য অফিসারদের সতর্ক করে দিয়েছিল এই বলে, 'ওর মত লোক তোমাদের দাগা দিয়ে গুলি পর্যন্ত করতে পারে।' পিয়ের ইঞ্জিনিয়ার, পিয়ের 'আতেলিএ' থিয়েটারে গিয়ে এলুয়ার-এর কবিতা আবৃত্তি করে—এ সব কথা ভাবতেই কেমন বিরক্তি লাগে তার।

দলের মধ্যে জুল-এর সঙ্গেই সে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ওরা দুজনই পারীর লোক। সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার আগে গ্যাস কারখানায় কাজ করত জুল। হাসি-তামাসা করতে পাকা ওস্তাদ সে। পিয়েরকে বলত, 'অতটা মন খারাপ করলে চলবে না, বুঝলে বন্ধু। তাতে কোন লাভ হবে না তোমার। ঠিক কথা, মোরিস তোরে বর্তমানে নিশ্চয়ই কিছু ভাবছে। কিন্তু আমি কিছু সরানোর তালে আছি। এখানে চারদিকে মুরগীর নোংরা পড়ে রয়েছে। কিন্তু বহুকাল এক টুকরো অমলেট পর্যন্ত জোটেনি আমার কপালে।' পিয়ের হাসত যখন সে বলত, 'আমি একজন আশাবাদী। শুয়োরের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঘটনা-স্রোতকে বিচার করে দেখা যাক না। যুদ্ধের আগে ওরা সপ্তাহে সাতদিন শুয়োর কাটত।

এখন সোমবার আর মঙ্গলবার শুয়োরের মাংস বিক্রী বন্ধ। এই গতিতে গেলে আর একশো বছরের মধ্যেই শুয়োররা অব্যাহতি পেয়ে যাবে। বুঝতে পারলে ?' মুহূর্তের জন্যে পিয়ের তার বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসত, হাসত। আর এখন সেই জুল আর বেঁচে নেই।

পিয়েরের চিঠিগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে ভেবে পায় না আনেকে কি লিখবে। বৃষ্টির কথা ? জুলের ঠাট্টা-তামাসা ? বা জুল মরবার সময়ে বার বার কি ভাবে 'সালগম' কথাটা উচ্চারণ করছিল তার কথা ? কিংবা লেঃ এস্তেরেল সম্পর্কে—যে ভালেরির কবিতা পড়ে আর পথ চলতে গিয়ে কোন সৈনিকের কোট ছুঁয়ে ফেলবে সেই ভয়ে শঙ্কিত হয়ে থাকে ? আনের চিঠিগুলি পিয়েরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন এবং ছুহুর দুষ্টুমির গল্পে ভরা। তাদের প্রত্যেকেরই পরস্পরের কাছে অনেক বক্তব্য বলার আছে কিন্তু তারা দুজনেই বোবা। পিয়ের প্রায়ই আনের কথা ভাবে। আনে যেন একটা সোজা পথ, যে পথ দিয়ে জুলাইয়ের ঝলমলে রোদের আলোয় পৌছনো যায়। এই পথ দিয়ে গেলে সে কোথাও না কোথাও পৌছবে। কিন্তু এখন সে চৌমাথায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কোন্ পথটা ঠিক তা বেছে নিতে পারছে না। বিপথে যেতে বসেছে সে।

লেঃ এস্তেরেল তাকে ডেকে পাঠাল। বলল, 'এটা ক্যাপ্টেন জেমিএর কাছে নিয়ে যাও।'

'যে আজ্ঞা।'

বইটা হাতে তুলে নিল পিয়ের। লেফটেনেণ্টের উদ্দেশ্য, তাকে খেলো করা। সে একজন কমিউনিস্ট এবং বোধহয় কেবলমাত্র গণ-কবিতাই পড়ে সে, সুতরাং হেঁটে হেঁটে যাক সমস্ত পথটা। গোলন্দাজদের শিবির এখান থেকে চার মাইল। ক্যাপ্টেন জেমিএ সাহিত্য রসিক ; পড়ার জন্যে তাই সে চেয়ে পাঠিয়েছিল কিছু। বসে বসে কুড়েমি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে কবিতার অভিধান সম্পাদনা করছিল।

পিয়ের একটা চালার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বই খুলে বসল। কবিতার বই। কবিতাগুলির রচয়িতা কে তা সে দেখল না, শুধু হঠাৎ একটা পাতা খুলে ছুটো লাইন পড়ল :

আনন্দের এই স্পর্শটুকু
ভাগ্যে তারও হয়ত যাবে জুটে,
তবু তো সে বাঁচবে, নাইবা
উঠল ফুলের মত ফুটে।

পিয়ের শব্দ করে বন্ধ করে দিল বইটা। মনে হল আনে যেন দেখা করতে এসে তার ভিজে গাল দুটো হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে। কেমন উষ্ণ ওর হাত, কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তার মুখ থেকে।

আঙুর ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে সে এগিয়ে চলল। বাগানটা একটা বিরাট ঝোপের মধ্যে ঢাকা। ডান দিকে গির্জা, আবহাওয়া যন্ত্রটা কবে ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছে গির্জার চুড়ো থেকে। গোলা পড়ে একটা গর্ত হয়েছে, পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে পিয়ের ভাবল, 'খুব কাছেই গোলাগুলি ছুঁড়ছে ওরা।' তারপর রাস্তাটা ঘুরে গেল পিয়ের।

লাজুক আর ক্ষীণদৃষ্টি ক্যাপ্টেনের হাতে পিয়ের বইটা তুলে দিল; গোলন্দাজদের সঙ্গে বসে বসে নতুন টক মদ খেল এক মগ, তারপর ফিরে এল। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। রোজকার চেয়ে এক ঘণ্টা আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে লাউড স্পীকারগুলো। উৎরাই থেকে কামানের শব্দ আসছে কিন্তু কেউ জবাব দিচ্ছে না তার। কেমন নিস্তব্ধ সমস্ত রণাঙ্গণ! পিয়ের নিষ্প্রাণ গলায় আবৃত্তি করে চলল:

আনন্দের এই স্পর্শটুকু
ভাগ্যে তারও হয়ত যাবে জুটে......

সন্ধ্যার দিকে আনের চিঠি আসবে। গোলাঘরের খড়ের মাচানে গিয়ে উঠে বসবে পিয়ের। জায়গাটা কেমন ভ্যাপ্‌সা গরম; লাল চুলওলা ইভ্‌ নাক ডাকাচ্ছে মনের আনন্দে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। প্রতিদিন দুবার করে এমনি শব্দ হয় কিন্তু পিয়ের এখনো নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে পারেনি। অকস্মাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সমস্ত পৃথিবী যেন বদলে যাচ্ছে। এখনই আমাদের লোকরা জবাব দেবে। পিয়ের রাস্তার দিকে এসে স্যাঁৎসেঁতে মাটির ওপর বসে পড়ল। এক ঘণ্টা এইখানে বসে কাটাতে হবে তাকে। তারপর সন্ধ্যার দিকে চিঠি আসবে আনের কাছ থেকে।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণের কথা জানতেই পারল না পিয়ের। সে মাটিতে শুয়ে পড়ল—গোলার ভগ্নাংশ এসে বিঁধেছে তার কুঁচকিতে। আধ ঘণ্টা পরে কয়েকজন গোলন্দাজ এসে তুলে নিয়ে গেল তাকে।

পিয়ের চোখ খুলতেই অনাবৃত বাতির আলো তার চোখে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দুটো বন্ধ করে দিল সে। ধীরে ধীরে তার মনে পড়ল সেই বই,

গোলন্দাজ, মদ আর গোলার কথা। তাহলে সে নিশ্চয়ই আহত হয়েছে... হয়ত মরে যাবে সে! না, সে ঘুমুচ্ছে না তো? ডান দিকে পাশ ফিরতে চাইল সে। এইভাবে শোওয়াই তার অভ্যাস। কিন্তু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। তাহলে নিশ্চয়ই সে মরে যাবে। অনেকগুলি জরুরী কথা আছে যা তার মনে পড়া উচিত। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও কিছু মনে করতে পারল না। সে আনেকে দেখতে চাইল ঠিক যেমন একদিন সে দেখেছিল একটা চালার নীচে, কিন্তু চোখের সামনে কোন মুখ ভেসে উঠল না। বারবার ওর নাম উচ্চারণ করে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চাইল শুধু। নার্স এসে তার বালিশটা সোজা করে দিয়ে গেল। সরল রেখার মত মেয়েটির লম্বাটে মুখ। সে মনে মনে বলল, 'ও আমাদের কেউ নয়।' একটা চকচকে খেলনা সে দেখতে পেল বিছানার চাদরের ওপর। ঝলমলে সবুজ ডোরা-কাটা লাল বালির বাক্স। একটা বালির ঢিবির ওপর বসে আছে সে। মিষ্টি খাবার বেরিয়ে আসছে বাক্স থেকে। না, না, মাছ। কিংবা লম্বা-লম্বা দাড়িওলা একটা বামন।...বালিগুলো কেমন শুকনো। ধীরে ধীরে সমস্ত আকৃতি মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। সে আর্তনাদ করে উঠল, 'এত শুকনো কেন?' নার্স ভিজে তোয়ালে এনে পিয়েরের কপালে চাপিয়ে দিল। কিছু অনুভব করতে পারল না সে, আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল একেবারে।

বাইরে থেকে ব্যাণ্ডের সংগীত ভেসে আসছে, তৃতীয় ব্যাটালিয়ন অভিবাদন জানাচ্ছে মৃত জার্মান বৈমানিকের উদ্দেশ্যে। জেনারেল লেরিদো বক্তৃতা দিতে উঠল, 'বীর যোদ্ধার শবদেহকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করছি। নিজের মাতৃভূমির জন্যে দেশপ্রেম...কর্তব্যের প্রতি আবেগভরা নিষ্ঠা...'

তারপর গত দিনের চেয়েও প্রবল বেগে বৃষ্টি নামল যেন হারানো সময়টুকুর ক্ষতিপূরণ করতে চাইছে।

সন্ধ্যার সময়ে পিয়েরের প্রত্যাশিত চিঠি এল আনের কাছ থেকে। তিন দিন আপিসে পড়ে রইল চিঠিটা। তারপর 'চিঠির মালিক মৃত' লিখে চিঠিটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল তারা।

সেন্সার ব্যবস্থা 'আন্ট আনাস্তাশিয়া' নামে পরিচিত। জোলিও নালিশ করল যে এই সেন্সর ব্যবস্থা গোরস্থানে পাঠাচ্ছে তাকে। 'লা ভোয়া নুভেল্' তার সর্বাঙ্গে শাদা শাদা ক্ষত নিয়ে বেরিয়ে এল। ভস্‌জ-এ ভীষণ শীত বা জার্মান রাজদূতের প্রতি ইটালিয়ানদের সানন্দ অভিনন্দন কিংবা চীনা সরকার কর্তৃক স্পেনের নিরাশ্রিতদের আশ্রয়দান—এমনি সমস্ত রকম খবর ছাপা বেআইনী। জোলিও তার হাত নাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কাগজে একটিমাত্র সংবাদ পাওয়া যাবে এবং তা হল ব্রোমাইড।'

গুজব রটেছে স্ত্রীদের কথা মন থেকে ম্লান করে দেওয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষ নাকি সৈনিকদের কফিতে ব্রোমাইড মেশাচ্ছে। জোলিও তার কাগজে একটা দু-লাইনের ছড়া ছেপে বের করল :

সখী, তোমার ঘরের পাশে ধৈর্য ধরে আছি প্রতীক্ষায়
মনেও তুমি ঠাঁই দিও না ঘায়েল আমি ব্রোমাইডের ঘায়।

দেসের রাহুগ্রস্ত হওয়ার পর জোলিও নতুন পৃষ্ঠপোষকের তল্লাশে বার হল। ব্রতৈল তাকে আলাপ করিয়ে দিল মতিনির সঙ্গে। এই প্রথম 'লা ভোয়া নুভেল্' তার নীতি পরিবর্তন করল, কিন্তু জোলিও তার জন্যে রীতিমত দুঃখিত। কি ভাবে বাঁচতে হয় দেসের জানে, মনোমালিন্যের মেঘ ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে উড়িয়ে দিতে পারে সে, ঠিক সিগারেটের মত হাতের মধ্যে তুলে দিতে পারে চেকটা। কিন্তু মতিনি হম্বিতম্বি করে তার ওপর যেন সে তার বেয়ারা। কাগজ সম্পাদনার ব্যাপারে সে পুরোমাত্রায় হস্তক্ষেপ করে এবং জোলিও যদি কোন র‍্যাডিকাল বা সমাজতন্ত্রীর বিয়ের খবর ছাপে তাহলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে মতিনি। কিন্তু জোলিও সবার সঙ্গে শত্রুতা করবে কিসের জোরে? হাজার হোক, মতিনি তো চিরকাল থাকবে না।

কোন একটি লেখক তার প্রবন্ধে 'বশ্‌' কথা ব্যবহার করায় মতিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'অসহ্য! তুমি মানুষের জঘন্য প্রবৃত্তির খোরাক যোগাচ্ছ। জার্মানীর সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করছি বটে কিন্তু তা হল বীরত্বের লড়াই। বলতে পার—এ একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। আসলে হিটলার একটা মস্ত বড় রাজনীতিজ্ঞ!'

সুতরাং জার্মান বৈমানিকের সাড়ম্বর শবযাত্রার খবর শুনে যে জোলিও উৎফুল্ল হয়ে উঠবে এটা কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। সমস্ত স্তম্ভ জুড়ে সে শবযাত্রার আর লেরিদোর বক্তৃতার বিবরণ ছাপল। কিন্তু পরের দিন কি লিখবে এই নিয়ে আবার মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল জোলিও। গত চার মাস ধরে যুদ্ধ চলছে কিন্তু এখনো কোথাও এতটুকু চিহ্ন নেই তার। এ একটা নকল যুদ্ধ। ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যাচ্ছে সৈন্যরা। গতকাল চেম্বারে ওরা জার্মানীর সঙ্গে রাইনের রেলপথ সম্পর্কে চুক্তির কথা উল্লেখ করেছে। ভোটে দেবার সময়ে কে একজন বলল যে বিলটি গ্রীষ্মকালে প্রথম তোলা হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে রাইনের সাঁকোটিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে 'নকল যুদ্ধ'। লোকেরা দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হে, নকল যুদ্ধটা কেমন লাগছে?' প্রত্যেকের ভাল লাগছে সন্দেহ নেই। একমাত্র কাগজে কোন খবর নেই সে সম্পর্কে।

দেখে মনে হয় শত্রুর নাম পর্যন্ত কেউ জানে না। জার্মান বৈমানিকরা ইস্তাহার ফেলছে এবং লোকে সেইগুলি হাতে নিয়ে বলছে, 'বাঃ কী চমৎকার ছাপা!' স্টাটগার্ট থেকে ফরাসী ভাষায় বেতার বক্তৃতা শুনছে তারা। বক্তা একজন ফরাসী! জোলিও তার নাম দিল 'স্টাটগার্ট বিশ্বাসঘাতক।' লোকের মনে ধরল এই নামটা; 'স্টাটগার্ট বিশ্বাসঘাতক' অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ডেপুটিরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল 'কি হে, চেম্বারের গোপন অধিবেশন সম্পর্কে স্টাটগার্ট বিশ্বাসঘাতক কী বলল?'

তারপর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একদিন বিকেলে মতিনি ডেকে পাঠাল জোলিওকে। মতিনি কেমন উৎফুল্ল এমন কি অনেক বিনীত ব্যবহার করল। জোলিও যা যা দাবী করেছিল সবগুলিই দিল তাকে। তারপর অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল, 'রাজনৈতিক দিকটা ব্রতৈলের হাতে ছেড়ে দাও। আরও সামরিক গালগল্প, বীরত্ব ও কৃতিত্বের কাহিনী ছাপা হোক। ভাল ভাল যুদ্ধ-সংবাদদাতা পাঠানোর ব্যবস্থা হোক।'

শেষ পর্যন্ত শত্রুর সন্ধান মিলল। দুদিন পরে যুদ্ধ-সংবাদদাতারা রওনা হল হেলসিঙ্কির উদ্দেশ্যে।

ইতালীর রাজদূতকে লাঞ্চে ডাকল তেসা। ইতালিয়ান রান্না, পিয়েডমণ্টের মদ, ভেরোনার শিল্প এবং মুসোলিনীর মত রাজনীতিজ্ঞ—সমস্ত কিছু উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করল সে।

সে বলল, 'মুসোলিনীর হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও এই যুদ্ধ বাধল—এতে যে কত দুঃখ পেয়েছি আমি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। গত কয়েক মাস আমি দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়েছি। সমস্ত সংস্কৃতিবান ইউরোপীয়দেরই এমনি অবস্থা। কিন্তু একটা আলোও দেখতে পাচ্ছি। ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মস্কোর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে যে, না একেবারে হাল ছাড়ার কিছু নেই। বিশেষ করে আমি ইতালীর কথা ভেবে আশ্বস্ত হচ্ছি। আমি বরাবর ল্যাটিন দেশগুলির ঐক্যের কথাই বলে এসেছি। আমরা রোমের সুহৃদ। একটা বিরাট সভ্যতার ভাগ্যের তুলনায় ডানজিগ ও পোলাণ্ডের তাৎপর্য কতটুকু? খোলাখুলিই বলা যাক, আমাদের সকলের সাধারণ শত্রু হল মস্কো। কেরিলিয়ান যোজকের যুদ্ধের ওপরই নির্ভর করছে পারী, রোম ও বার্লিনের ভাগ্য।'

প্রত্যেকেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মাদাম মতিনি 'উত্তরাঞ্চলীয় মঙ্গলবার পর্ব' উদ্‌যাপনের আয়োজন করল; অভিজাত মহিলারা ফিনিশ সৈন্যদের জন্যে মোজা আর গলা-বন্ধ বুনল প্রাণপাত পরিশ্রম করে; মিয়েজার পনের লক্ষ ফ্রাঁ দান করল ম্যানারহাইমের উদ্দেশ্যে এবং সেই চেকটা অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে তুলে দিল ফিনিশ প্রধান সেনাপতির মেয়ের হাতে। মার্সাইয়ের প্রতারক বিলে দাবী করল রু মস্কো রাজপথটার নাম বদলিয়ে রু হেলসিংফোর্স রাখা হোক।

মাদলেনে ফিনল্যাণ্ডের বিজয় কামনা করে প্রার্থনা সভা বসল। ধর্মনিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা জানাল ব্রতৈল। তারপর গির্জা থেকে বেরিয়ে সোজা রওনা হল 'লা ভোয়া নূভেল্'-এর আপিসে। 'এক্ষুনি ভীইয়ারের কাছে যাও একবার। ফিনল্যাণ্ডের ওপর কয়েকটা প্রবন্ধ লিখতে বল তাকে।' এই কথা শুনে জোলিও রীতিমত আশ্চর্য হল, যদিও সে কদাচিৎ আশ্চর্য হয়।

ভীইয়ারের ওপর মতিনির ঘৃণা অপরিসীম। সে প্রায়ই চিৎকার করে বলে, 'ঐ লোকটাই তো মজুরদের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকিয়েছে, বলেছে—যাও তোমরা সমুদ্রতীরে ফূর্তি করে এস!' নতুন পৃষ্ঠপোষকের খেয়ালের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে উপায় নেই, সুতরাং ভীইয়ারকে এড়িয়ে চলত জোলিও। একবার প্যালে বুরবঁর কাছে মারিয়ুস রেস্তোরাঁয় দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। ভীইয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি তো আমাকে ভুলেই গিয়েছ।'

'তুমি কি দেবতা পেয়েছ আমাকে?' জোলিও প্রতিবাদ করল, 'আমি দেবতাদের দূত মাত্র। একজন সংবাদবাহক। তুমি নিজেই জান মতিনি কী রকম খচ্চর লোক। এটা শুধু আমার পক্ষেই নয় সমস্ত দেশের পক্ষে একটা দুর্ভাগ্য যে

দেসেরকে হারাতে হল। এখন আমায় ব্রতৈলের নির্দেশ মত লিখতে হচ্ছে। ও ভয়ানক একগুঁয়ে এবং জংলী বেড়ালের মত বর্বর। মার্সাইএ ওর জুড়ি মেলা ভার। গ্যালিক্ মোরগ আর জার্মান শিকারী কুকুর-এর একটা দো-আঁস্‌লা জীব ও। আমি তাকে অনেকবার বলেছি—ভীইয়ারের কী খবর? সত্যিই, জাতীয় ঐক্যটা একটা মুখের কথা। ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করি এবং সবচেয়ে বড় কথা আপনাকে ভাল লাগে আমার।'

ভীইয়ার ম্লান হেসে একটা নিরিবিলি কোণে এসে বসল। ডাক্তারের নির্দেশ মত লাঞ্চের অর্ডার দেওয়া রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার তার পক্ষে। নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকা সর্বদা তার কাছেই থাকে এবং তা মিলিয়ে দেখতে হয়। 'পালং শাক? না। টম্যাটো? না। গাজর? ওটা চলবে।'

আর এখন ব্রতৈল জোলিওকে সেই ভীইয়ারের কাছেই পাঠাচ্ছে। গোলগাল সম্পাদকটি ঘাবড়ে গেল রীতিমত, সারাটা পথ সে বিড়বিড় করল নিজের মনে। কী দুঃসময়! কোন কিছুই দুদিন স্থায়ী হচ্ছে না। মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। কোন মানুষ জানে না এর পরমুহূর্তে সে হাসবে না মাথায় হাত দিয়ে বসবে!

বই আর ছবির মধ্যে ডুবে থেকে এখন অবসর যাপন করছে ভীইয়ার। প্রেক্ষাগৃহের অনিচ্ছুক দর্শকের মত প্রচণ্ড বিরক্তিভরে সে সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে লক্ষ্য করছে। সে বলল, 'আমি এর কোন অর্থ বুঝি না।' তারপর আত্মসন্তুষ্ট হয়ে মনে মনে বলল, 'যাই হোক আমি ভাগ্যবান। ভাল সময়েই তেসা আমার কাছ থেকে দায়িত্বটা নিয়েছে। এখন ওরাই একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছে। এই গণ্ডগোল মেটানোর দায়িত্বও ওদের।' অবশ্য চেম্বারে ভীইয়ার গভর্নমেণ্টের পক্ষেই ভোট দিয়ে আসছে এবং দুবার দেশপ্রেমের বক্তৃতাও দিয়েছে কিন্তু তার গলার স্বর কেমন ভোঁতা—যেন নীরস উদ্ধৃতি আবৃত্তি করছে সে। এই নকল যুদ্ধ তার কাছে একটা অকারণ হৈ-চৈ। চীনে তো অপর্যাপ্ত নরহত্যা হচ্ছে! ওরা কমিউনিস্টদের আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভীইয়ার চাঙ্গা হয়ে উঠল একটু। তার পুরনো অসন্তোষগুলো আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। তার বিশ্বাস, তার পরাজয়ের জন্যে কমিউনিস্টরাই দায়ী। তারাই তো ষড়যন্ত্র করে কারখানা দখল করিয়েছে, দোকানদারদের ছিন্নমূল করে দিয়েছে, দালাদিএকে ঠেলে দিয়েছে ব্রতৈলের দলে। দেশপ্রেমের নামে গলাবাজি করতে তারা ওস্তাদ, মিউনিক কলঙ্কের কথা বলতে গিয়ে তারা ভীমরুলের মত গুঞ্জন তোলে কিন্তু যুদ্ধের কথা

এলেই পিছলে বেরিয়ে যায়। এখন শ্রমিকরা বলছে যে কমিউনিস্টরাই একমাত্র যুদ্ধবিরোধী ছিল। ভীইয়ারের ধারণা এ হল নির্বাচনী চাল। মনে মনে বলল, 'এই করে লক্ষ লক্ষ ভোট কুড়িয়ে নেবে ওরা।' অবশ্য কমিউনিস্ট ডেপুটিদের গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা সে সমর্থন করল। বলল, 'এতে আপত্তি জানানো অসম্ভব। এই-ই তো যথার্থ ব্যবস্থা।' যখন সে শুনল যে পরিষদের সভ্য কার্শ্যা এখনও ধরা পড়ে নি, তখন মনে মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করল। কার্শ্যাকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। একদিন তারা একই পার্টিতে ছিল এবং একই সঙ্গে মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিত। তরুণ কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তার মতামত এই যে তারা অন্য জগতের জীব এবং কার্শ্যা দলত্যাগী। কোন সংস্কৃতিবান বিশ্বপ্রেমিক ও গণতন্ত্রবাদীর পক্ষে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতেই শিউরে ওঠে ভীইয়ার।

প্রতিদিন শত শত লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কতকগুলি প্রদেশে সমাজতন্ত্রীরা পর্যন্ত বাদ পড়ছে না। ভীইয়ার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এই তো প্রতিক্রিয়ার সূচিমুখ! সে ভাবল, সে-ই তো ঐতিহ্যের অভিভাবক—শ্রদ্ধেয় এবং শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। এই ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ জানাবে কিনা—মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল ভীইয়ার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনাটা নাকচ করে দিল কারণ এর ফলে কমিউনিস্টরা লাভবান হবে।

ভীইয়ার আবার তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে ফিরে এল। সম্প্রতি সেজানের একটা 'স্টিল-লাইফ' সংগ্রহ করেছে সে: গালার থালায় দুটো আপেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এই ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেয়। আপেলগুলো নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ—সম্পূর্ণ এবং ভারী—যেন বস্তুর সার ভাগ।

ভীইয়ার ভাবত যে কোন কিছুই তার মধ্যে সাড়া জাগাতে পারছে না। আজ কাল কিন্তু নিজেকে বুঝে উঠতে পারে না সে। ফিনল্যাণ্ডের ঘটনায় আবার সে তার যৌবন ফিরে পেয়েছে। চেম্বারে সে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল—তার প্যাশনে বারবার দুলে উঠল ঠিক যেমন বিশ বছর আগে হত। যুদ্ধটা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। ভীইয়ার বলল, 'এই কমিউ-নিস্টরা—এরাই হল রুশ সাম্রাজ্যবাদের গুপ্ত সৈন্যবাহিনী।'

জোলিও ব্রতৈলের অনুরোধের কথা বলাতে ভীইয়ার উত্তর দিল, 'খুশি হয়ে, অত্যন্ত খুশি হয়েই লিখব। বয়স এবং অসুস্থতা প্রতিবন্ধক হওয়া সত্ত্বেও। কাজ করতে ডাক্তার নিষেধ করেছে। কিন্তু যখন দুর্বলকে সাহায্য করার কথা ওঠে

তখন আমি প্রস্তুত। খুব ভাল কথা যে ব্রতৈল দলাদলির কথা ভুলে গিয়েছে। এখন আমরা কথায় নয় কাজে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারি।'

প্রথম প্রবন্ধটা অত্যন্ত কাঁপা ও আবেগভরা গলায় বলে গেল ভীইয়ার। 'ক্রোধে ও ঘৃণায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছি আমি। এক সময়ে ভন গল্‌ৎস্‌-এর সৈন্যবাহিনী ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম করেছিল। আজ মার্শাল ম্যানারহাইমও যুদ্ধ করছে এমনি ন্যায়ের হয়ে।'

পরে সে জোলিওকে বলল, 'আমাদের অত্যন্ত শক্তিশালী বন্ধু আছে এবং সে হল জেনারেল ফ্রন্ট।'

জোলিও হাত বাড়িয়ে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীর মধ্যে ফিন-ল্যাণ্ড দেশটা কোন্‌খানে তা আমার নিজের জানা নেই। শুনতে পাই ওখানে নাকি ভীষণ শীত। আমাদের লোকরা ও দেশে গেলে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে প্রাণ হারাবে। এ আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। কিন্তু ইতালী সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? আমি একজন মার্সাইয়ের দেশপ্রেমিক। ওরা যদি মার্সাই আক্রমণ করে!'

'কক্ষনো না। ওরা আমাদের মতই মস্কোর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। ইতালীয়ান ভীতির অস্তিত্ব আজ আর নেই।'

পরের দিন ভীইয়ারের মেয়ে লুই বাবার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার স্বামী যুদ্ধে গিয়েছে।

'গ্যাস্ত চিঠি দিয়েছে যে সৈন্যবাহিনীতে নাকি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। ওখানে নাকি একটাও ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান নেই। সৈন্যরা সব বিনা বুটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভয়ানক চড়ে আছে ওদের মেজাজ। গ্যাস্ত ওদের কাছে কিছু বলতে ভয় পায়। আচ্ছা বাবা, ফ্রান্সের কী হবে বলতে পারো?' মেয়েটি বলল।

অন্যমনস্কভাবে কথাগুলো শুনল ভীইয়ার,তারপর বলল, 'ভয়ংকর। আমি প্রথম থেকে বলে আসছি যে এই যুদ্ধ কোন কিছু মীমাংসা করতে পারবে না। এর মধ্যে কিছুমাত্র অর্থ নেই। অবশ্য ফিনল্যাণ্ডের কথা আলাদা।'

কেরিলিয়া, স্কি-বাহিনী ও ম্যানারহাইমের জন্যে অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কথা বলল সে। লুই বাধা দিল, 'আজকাল আমার রাত চারটে পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমই আসে না। ভাবি, কেবল ভাবি......সত্যিই জার্মানরা যদি জেতে তাহলে দেশের কী হবে!'

'ওরাই হয়ত জিতবে।'

এত সহজভাবে কথাটা বলল ভীইয়ার যে রীতিমত অবাক হয়ে গেল লুই।
'বাবা! কী বলছ তুমি?' মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল।
ভীইয়ার দেখল মেয়ের ঠোঁট দুটো কাঁপছে—হয়ত এখনই কেঁদে ফেলবে ঝর ঝর করে। সে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল, 'ভয় পেও না, আমাদের ম্যাজিনো লাইন আছে।'
যখন খবরের কাগজগুলো দিয়ে গেল, ভীইয়ার দেখল, 'লা ভোয়া নুভেল্'-এ তার প্রবন্ধটা ছেপে বেরিয়েছে। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সমস্তটা পড়তে পড়তে সে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে তার নিজের কথায়ই সায় দিল। তারপর একটা ছবির ওপর নজর পড়ল। বরফের স্তূপাকার—তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মৃত সৈনিক, জমে গিয়ে কাঠিন্য এসেছে তাদের সর্বাঙ্গে। তাদের হাতে রাইফেল—যেন যুদ্ধে চলেছে, মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে ফিরে পেতে চাইছে। ভীইয়ারের কাছে কেমন বীভৎস মনে হল ছবিটা: তার মধ্যে তোষণ-নীতি বা অন্য কোন রকম পথ নেই বাইরে বেরুবার।
লুই চলে গেল। আর্ম-চেয়ারে বসে বসে বিশ্রাম নেওয়ার আনন্দে গা ঢেলে দিল ভীইয়ার। এখন মনে মনে ভাবল: যুদ্ধে কে জিতল আর কে হারল তাতে তার কিছু যায় আসে না। এমন কি ফিনল্যাণ্ডও। ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গেই বা কি সম্পর্ক? কিছু লোক দৌড়চ্ছে, পড়ছে এবং জমে যাচ্ছে। এই-ই তো জীবন। কিন্তু সে এ সবের ঊর্ধ্বে। আপেলের মত সে নিজেই নিজের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। অনেক উত্তেজনা, বাক্যালাপ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে সে পার হয়ে এসেছে; এখন তার বিশ্রাম নেওয়া দরকার।
'লা ভোয়া নুভেল্'-এর ফটোগ্রাফার এসে তাকে বিরক্ত করল—লোকটা জোলিওর মতই শহুরে, আর ছটফটে এবং কেমন একটু করুণা হয় লোকটিকে দেখে।
'অনুমতি না নিয়ে ঢুকেছি বলে মাফ করবেন আমায়। ফিনল্যাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে প্রথম পাতায় আপনার একটা ছবি ছাপানো বিশেষ দরকার। শিরোনামা দেওয়া হবে—স্বাধীনতা ও সত্যের অক্লান্ত যোদ্ধা।' লোকটি বলল।
ভীইয়ার তার প্যাশনে ঠিক করে নিয়ে মুখে একটা কঠিন বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী আনবার চেষ্টা করল।

সৌখিন পোষাকের দোকানে, যেখানে রীতিপ্রিয় মেয়েদের নতুন নতুন পোষাক সরবরাহ করা হয়ে থাকে, সেখানে নিজের মেয়েকে কাজ করতে দেখে তেসা চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা আর ঢেউ তোলা, ঠোঁট দুটো টকটকে লাল, রাঁধুনীদের টুপির চেয়েও ছোট একটা টুপি এবং হাতে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বেগুনী রঙের ফিতে দিয়ে বাঁধা।
দেনিস বুলভার মালএরব-এ একটা দরজীর দোকানে কাজ নিয়েছে। মেয়েরা এখানে মডেল দেখে সান্ধ্য-পোষাক তৈরী করায়। শো-রুমে লম্বা লম্বা আয়না সাজানো। খরিদ্দারের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাই মালিক সর্বদাই নালিশ জানাচ্ছে—ব্যবসা মন্দা। মধ্যবয়সী লোকটির গোঁফজোড়া কেমন সংক্ষিপ্ত আর পাঁশুটে, চোখ দুটো কেমন শোকাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে সে 'ল জারদ্যাঁ দে মোদ্' বা 'ভোগ'-এর পাতা ওলটাচ্ছে। আবছা আলোয় মডেলগুলো দেখে খরিদ্দার বলে ভুল হয়। সেলাইয়ের কলগুলো গুন গুন করছে অবিশ্রান্ত, ইলেকট্রিক ইস্ত্রিগুলো নিয়মিতভাবে এদিক ওদিক যাতায়াত করছে এবং রেশমের কাপড়ে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে আঙুলের নখগুলো। কিন্তু পেছনকার ঘরে ওজেন নামে একটি খোঁড়া লোক একটি ছাপার মেশিনে কাগজ লাগাচ্ছে। এই জায়গাটি হল কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী ছাপাখানা। ফ্যাশন সম্পর্কে মালিকের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই বললেই চলে। সে রাজনৈতিক ইস্তাহার লেখে এবং দেনিস সেগুলি চমৎকার কার্ডবোর্ডের বাক্সে ভর্তি করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিলি করতে বেরিয়ে যায়।
আজ দেনিসের ছুটির দিন। বেলভিলে চলেছে সে। ঠিকানাটা সংগ্রহ করতে পেরেছে। সেখানে মিশোর সঙ্গে দেখা হবে। চার মাসের বিচ্ছেদের পর এই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ।
মিশোকে প্রথমে ব্রেস্টে পাঠিয়েছিল কারণ সে ছিল নৌ-বাহিনীর রিজার্ভে। কিন্তু তার চাকরির কাগজপত্র ঘেঁটে রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়ল হেড-কোয়ার্টার—কি করে এই 'আগুনে' লোকটাকে বিদেয় করা যায়! দু সপ্তাহ পরে আরাসে এক পদাতিক বাহিনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাকে। তার কাজ হল সৈন্য-ব্যারাকের মেঝে ধোয়া। ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার মেজর কেঁবর লোকটা ফূর্তিবাজ আর মাতাল; রাজনীতির ধার

ধারে না, কর্তৃপক্ষের ওপরও আস্থা নেই। ওর প্রিয় প্রবাদ হল, 'জীবনে ছুটি চমৎকার অদ্ভুত ব্যাপার আছে—একটি ট্যাক্‌সি অন্যটি ক্যাক্‌টাস্।' গোড়ার দিকে সে মিশোকে চোর বলে মনে করত কিন্তু যখন আবিষ্কার করল যে 'অপরাধী লোকটা' স্পেনে যুদ্ধ করেছিল তখন 'ডন কুইক্‌সোট' আখ্যা দিল; তাকে সুনজরে দেখতে চেষ্টা করল। এখন মিশো পারীতে দিন দুই কাটাবার ছুটি পেয়েছে।

দেনিস উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সরু অন্ধকার রাস্তাটা খুঁজে বের করতে রীতিমত কষ্ট হয়েছে। এই রাস্তাটা এমনি একাধিক রাস্তা থেকে আলাদা করে চিনবার মত কোন উপায় নেই। একটি বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিলেন। তখনো মিশো এসে পৌঁছয়নি।

'বসো বাছা, কফি করে দিচ্ছি তোমায়। ঠাণ্ডায় জমে গেছ, না? মিশো এক্ষুনি এল বলে।'

কিন্তু মিশোর অনেক দেরী হচ্ছে। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার জিনোকে কখনো দেখোনি, না? কারখানায় ফ্যাশিস্টরা খুন করেছিল ওকে।'

ক্ল্যমাঁস সম্পর্কে মিশোর গল্পগুলো মনে পড়ল দেনিসের:

'আপনিই নাকি?' দেনিস চিৎকার করে উঠল।

কাপড় দিয়ে চোখ মুছলেন ক্ল্যমাঁস। জিনো! ঘরের জিনিসপত্রের অর্থ এবার স্বচ্ছ হয়ে এল দেনিসের কাছে। বড় কানওলা একটা ছেলের ছবি ঝুলছে দেওয়ালের ওপর। দেরাজগুলো ভর্তি বই-খাতায়। পেরেকের ওপর পুরনো ক্যাপ ঝুলছে একটা। তাঁর ছেলের স্মৃতি-চিহ্নগুলো ত্যাগ করতে ক্ল্যমাঁস রাজী নন। তিনি জিনোর কমরেডদের দেখাশোনা করেন, খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, আবার টুকিটাকি বোতামও সেলাই করে দেন। যুদ্ধ যখন বাধল তখন সমস্ত সন্ধ্যা একা বসে বসে তিনি কাঁদতেন। একে একে সবাইকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওরা! কিন্তু নভেম্বরে একজন নতুন লোক এল তাঁর কাছে।

লোকটি বলল, 'মিশোর কাছ থেকে আসছি। রাতটা এখানে কাটাতে পারব কি? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি...'

এখন কমিউনিস্টদের আশ্রয় দিচ্ছেন ক্ল্যমাঁস। তিনি কখনো কারও নাম বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। বিছানা আর আহার তৈরী করে দেন। তারা নানা ঘটনার কথা বলে তাঁকে। তাঁর সম্বন্ধে তাদের আস্থার গভীরতার কথা ভেবে তিনি গর্বিত হন।

'ফিনল্যাণ্ড সম্বন্ধে বড় বড় খবর দিয়ে কাগজওলারা লোকদের দৃষ্টি অন্ত দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়।' তিনি দেনিসকে বললেন।

তারপর দেনিসের দিকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে ক্ল্যমাঁস হাসলেন, 'আমি মিশোকে গোড়া থেকে বলে আসছি যে তার পক্ষে একা থাকা ঠিক নয়। ভাল কথা যে, তুমি তার দিকে নজর দিয়েছ। ও ভয়ানক লাজুক, কিন্তু মনটা অত্যন্ত ভাল। ছেলেটা আবার চালাকও আছে। খুব তাড়াতাড়ি মোরিস তোরে হয়ে উঠবে ও। শুধু একজন স্ত্রীলোক থাকা দরকার তার পেছনে। জিনো যেমন পেয়েছিল আমায়।'

যদিও দেনিস এমনিতে স্বল্পভাষী, সে কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করল না। এ যেন তার একজন আত্মীয়া কথা বলছেন তার সঙ্গে।

অবশেষে মিশো এল। সামরিক বেশে কেমন অদ্ভুত দেখায় তাকে!

'তুমি!'

ক্ল্যমাঁসকে আলিঙ্গন করল মিশো। তারপর ক্ল্যমাঁস কফি নিয়ে এলেন।

তিনি বললেন, 'আমায় এখন কাজে যেতে হবে। তুমি যদি আমার আসার আগে বাইরে যাও তাহলে দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা মাদুরের নীচে রেখে যেও। কিন্তু সাবধান মিশো, ওরা যেন না খুন করতে পারে তোমায়। ওরা বলে এখনো যুদ্ধ বাধেনি কিন্তু মানুষ-মারা ঠিকই চলেছে। পরে তোমাকে দরকার লাগবে। আমি ওকে বলছিলাম যে তুমি একদিন মোরিস তোরে হয়ে উঠবে।'

তিনি চলে গেলে মিশো জড়িয়ে ধরল দেনিসকে। তারপর ফিসফিস করে বলল 'তোমাকে দেখবার জন্যে উদগ্রীব হয়েছিলাম এতদিন। নিশ্চয়ই ছিলাম, ঠিক তাই!'

জানুয়ারীর সংক্ষিপ্ত দিন ধীরে ধীরে গড়িয়ে এল। ঘরের মধ্যে কাকজ্যোৎস্নাকে মনে হল নীল কুয়াশা। ক্ল্যমাঁস খুব শিগগিরই ফিরবেন কিন্তু এখনো বহু কথা পরস্পরকে বলা হয়নি তাদের।

'সমস্ত কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে আছে। আমাদের বেলজিয়ান সীমান্তে রাখা হয়েছে। প্রথমে ঘাঁটি তৈরী করতে চেয়েছিল কিন্তু পরে মত বদলাল। কর্নেলকে একদিন চিৎকার করতে শুনলাম, 'কেবলমাত্র হতাশাবাদীরাই বলে যে জার্মানরা এখানে আসবে!' এ হল তাদের অত্যন্ত প্রিয় কথা। কিন্তু কারা হতাশাবাদী? তারা নিজেরা। জার্মানরা যাতে আমাদের গুঁড়িয়ে

দিতে পারে তারই তোড়জোড় করছে ওরা। অবশ্য যদি নতুন গভর্নমেণ্ট আসে তাহলে ব্যাপারটা বদলাবে। সম্মুখ যুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারব আমরা। আমার ভয় হয় যে শুরুতে মার খাবো আমরা কিন্তু পরে আমাদেরই অবস্থা শোধরাতে বলা হবে। লোকে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। একদিন কয়েকটা ইস্তাহার পেয়েছিলাম, ওরা সবাই খেয়ে এল আমার কাছে। অফিসাররা সবাই ফ্যাশিস্ট। নাৎসীপন্থী তারা। একমাত্র আমার লোকটা অন্য রকম, ও ক্যাকটাস নিয়ে পাগল। কিন্তু বাকী সবাই বলছে যে এর জন্য দায়ী পপুলার ফ্রণ্ট আর কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা। লোকদের ওপর তাদের ভয়ানক ভয়। এদিকে লোকে অপেক্ষা করছে। কেন তারা নিজেই জানে না। বারুদের অভাব নেই কিন্তু তাতে আগুন দেবার জিনিসেরই অভাব। পারীতে যদি একবার শুরু হয় তাহলে ওরা এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

'এখানে ঠিক একই অবস্থা।' দেনিস বলল। 'কারখানার লোকেরা ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে কিন্তু কিছু বলে না। একমাত্র ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে একটা নাড়া খেয়েছে তারা। তারা বলেছে, ফিনিশ ফ্যাশিস্টদের জন্যে তারা কোন বিমান তৈরী করতে পারবে না। তারা হয়ত ধর্মঘট করবে। তারপরই বেশ জমকালো হয়ে দাঁড়াবে সমস্ত ব্যাপারটা।'

বিদেশের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করল মিশো। মস্কো থেকে নতুন কি খবর এসেছে? দেনিস সব কথা বলল।

হাসল মিশো। 'সত্যিই কত বড় একটা লোক হয়ে গিয়েছ তুমি! মনে পড়ে, কিভাবে প্রথম মিটিঙে নিয়ে গিয়েছিলাম তোমায়?'

ওদের প্রেমের প্রথম দিনগুলির কথা পড়ছে......দ্বিধা আর ব্যাকুলতা। ওদের ঠোঁট, হাত, এমন কি চোখ পর্যন্ত ওদের হৃদয়াবেগের গভীরতাকে ব্যক্ত করতে পারছে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে ওদের।

'খবরের কাগজে ইংরেজ ক্যাপ্টেনের বিষয় পড়ছিলাম।' দেনিস বলল। 'ঠিক নতুন বছরের সময়। তারা ডিনার খেতে বসেছে। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হল। একটা জার্মান সাবমেরিণ। লোকটির সঙ্গে ছিল তার তরুণী স্ত্রী। স্ত্রীকে লাইফ-বেল্ট বেঁধে জাহাজের একধারে টেনে আনল। মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। ভাবল, পাগল হয়ে গিয়েছে তার স্বামী। তারপর স্ত্রীকে জলের মধ্যে ফেলে দিল। বেঁচে গেল মেয়েটি।

কী আত্ম-সংযম! কী সবল বোধশক্তি! মিশো, আজ আমাদের দরকার বাঁচবার সাহস। তুমিও আমাকে এই কথাই বলো, চিৎকার করে ওঠো যাতে আমি সবল হয়ে উঠতে পারি। 'বিপদের কথা বলছি না, ভয় পাইনি আমি। কিন্তু যখন আমরা বিদায় নিই, তখন আমার মনে হয় এই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা।'

'আমরা সবাই ভেলার ওপর ভাসছি। জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা। কিন্তু আমরা ঠেকাবই। তারপর সেইখানে পৌছব, দেনিস। তুমি দেখে নিও।'

রাত্রের সমুদ্রের মত বিস্তৃত ও নিস্তব্ধ ছুটো অন্ধকার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ওরা বিদায় নিল। মিশোর জ্যাকেটের নীচে গোঁজা এক বাণ্ডিল ইস্তাহার ও ছু কপি 'লুমানিতে'। এখনো ট্রেন ছাড়তে তিন ঘণ্টা বাকী। সে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে এগোল। নিষ্প্রদীপ প্যারীকে মনে হচ্ছে একটা আশ্চর্য নতুন শহর। মাঝে মাঝে গাছের উলঙ্গ শাখাগুলো ঝুলো বাড়িয়ে আছে অন্ধকারে। কিন্তু বাড়ীগুলো দেখা যায় না; সুদূর পাহাড়ের মত তাদের আবছা অবস্থিতি সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়। হঠাৎ একটা শিশু হেসে উঠল। একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমার দস্তানাটা পড়ে গিয়েছে।' যেতে যেতে গর্জন করে উঠল বাসের হর্ন। লাল হয়ে উঠল সিগারেটের শিখা।......অন্ধকারে কেমন একটা ভিজে-ভিজে-নীল কুয়াশা আর শহরের অস্পষ্ট গুঞ্জন......উত্তাল সমুদ্রের গোঙানি বলে মনে হয়।

দেনিস আর তাদের ত্বরিৎ বিদায়ের কথা মনে পড়ল মিশোর—তাদের বেদনার কথা তারা পরস্পরের কাছে খুলে বলতে পারেনি। দেনিস বলেছে, 'তোমার পকেটে কতকগুলো সিগারেট রেখেছি আমি।' সে বলেছে, 'গলাটা ঢেকে রেখো, ঠাণ্ডা লাগবে।' আবার কখন তারা পরস্পরে মিলিত হবে? সত্যিই কি কোনদিন দেখা হবে তাদের মধ্যে?

চওড়া রাস্তাগুলো নদীর মত নেমে গিয়েছে। কে যেন একটা টর্চ নিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। অন্ধকারের মধ্যে কত জোরালো দেখাচ্ছে ক্ষীণ আলোটুকু। পথ, ঘাট, গাছের চারপাশের রেলিং আর সেই মানুষটির পা ছুটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোয়। লোকটি মোড় ফিরতেই আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল। নিষ্প্রদীপ রাত্রে টর্চের আলোর মত এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বছরগুলির মধ্যে দিয়ে প্রেমকে বহন করে নিয়ে যেতে সত্যিই কেমন অবাক লাগে।

১০

আঁদ্রেকে পোয়াতিএর-এ পাঠানো হয়েছে। প্রতিদিন গুজব উঠছে যে এই রেজিমেণ্টকে ম্যাজিনো লাইনে পাঠানো হবে কিন্তু তার পক্ষে কোন সরকারী সমর্থন নেই। চার মাস কেটে গিয়েছে। মারকিস্ স্ত নিওর-এর বসবার ঘরে কর্নেল প্রতিদিন গিয়ে উপস্থিত হয়। বাকুতে পুরনো সেনাপতি গ্রাঁদমেজোঁর সঙ্গে কাজ করেছে সে। স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাকে প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করত, পোয়াতিএর-এর বিমান-আক্রান্ত হবার আশঙ্কা আছে কি না। অফিসাররা তাদের স্ত্রীদের শহরের কাজে দিয়েছে। প্রত্যেকটি বার-এ সৈনিকরা দেনা করেছে, বেশ্যাপল্লীর কোন ঘরে যেতে বাদ রাখেনি তারা। সন্ধ্যায় দুধের দোকানে বসে বসে দিনটা কাটিয়ে দেয় আঁদ্রে।

তার বন্ধু লরিএ বলে, 'আজকের দিনটা আমরা হারালাম না জিতলাম তা খতিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।'

জেলখানার মতই জীবনটা কেমন ভোঁতা আর একঘেয়ে। তারা রুট-মার্চে বার হয়, উঠোন ঝাঁট দেয়, সালগমের ঝোল খায়। তারপর শহরে ঘোরে, দোকানের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমায়, সিনেমায় বসে পুরনো ছবি দেখে আর ক্ষুদা-উদ্রেককারী মদ খায়। তারপর ব্যারাকে ফেরে আর লোহার স্টোভের সামনে বসে বসে হাই তোলে, ঝিমোয়। আঁদ্রে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তাদের মুখ থেকে দুশ্চিন্তা আর শঠতার ভাব কেটে যায়, ল্যাণ্ডস্কেপের কথা মনে পড়ে আঁদ্রের। মাঝে মাঝে ভাবে, মানুষের সঙ্গে মাটির সাদৃশ্যের কথা, কুমোরের সঙ্গে মাটির সম্বন্ধের কথা। এমনি মুহূর্তে আঁদ্রে কাজের প্রেরণা পায়। নিজেকে নিয়ে তামাসা করে, 'যখন প্যারীতে ছিলাম তখন আঁকতে ইচ্ছে করত না, এখন বারবার রঙের জন্যে মন উশখুশ করে।' লরিএ বলে, 'দাঁড়াও না, এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা ফ্রণ্টে যাব।' আঁদ্রে স্বপ্ন দেখে···ধোঁয়ার স্তম্ভ, শীতের সকাল, কাঁটাতার, বিবর্ণ অর্থহীন মৃত্যু, ঠিক সূর্যহীন অসহ্য ঝলসানো দিনের মত যখন বস্তুর আকার আর রং ধীরে ধীরে মুছে যায়।

আঁদ্রে খুব সহজে লোকের সঙ্গে আলাপ করতে পারে। প্যারীতে সে একা তার ক্যানভাস নিয়ে ডুবে থাকত। কিন্তু এখানে সে মানুষের মধ্যে বাস করছে···সেই সব মানুষ যারা হাসছে, গল্প বলছে, ঠাট্টা-তামাসা করছে।

বিশেষ করে লরিএর সঙ্গেই সে আড্ডা মারে। লরিএ হল আভিঞঁর এক কাফের বাজিয়ে, কেমন উৎকণ্ঠাহীন ছেলেমানুষ, দক্ষিণাঞ্চলীয় লোক। এই সে গায় 'তুত ভা বিয়ঁ, মাদাম লা মারকিস্‌' পরমুহূর্তেই বলে, 'এই যুদ্ধ একশো বছর চলবে। তারপর হেসে বলে, 'কর্নেল আগে থেকেই কুমারী মেরীকে মোমের হাত-পা উপহার দিয়েছে যাতে সে নিজে আহত না হয়।'

ব্রেতঁবাসী ইভ্‌ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এখানকার মাটি খুব ভাল। পাঁঠাও আছে প্রচুর। আমরা যেখান থেকে আসছি সেখানে পাঁঠা মেলে না। যাই হোক যুদ্ধে যাবার পরিকল্পনাটা প্রথমে কার মাথায় এল?' প্রত্যেকটি গাছের কাছে সে থামে যেন কোন গাঁয়ের লোকের সাক্ষাৎ মিলেছে। আঁদ্রের সঙ্গে সার আর রাই সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। কখনো কখনো রাত্রে সে নিজের মনেই চিৎকার করে ওঠে। তার বৌ-ছেলেমেয়ে আর বাড়ীর জন্যে মন কেমন করে।

নিভেল্‌ কোন একটা কাফেতে ওয়েটারের কাজ করত। সম্পূর্ণ কার্যক্ষম হবার আগে সে ছ মাস হাসপাতালে কাটিয়েছে। তার বৌ তাকে জেরেনিয়ম ফুল এনে দিয়েছিল। শুনেছিল জেরেনিয়ম ফুলের ঘ্রাণ নিলে নাকি হৃদয় দুর্বল হয়। অতএব সৈন্যবাহিনী থেকে মুক্তি পেতে অসুবিধা হবে না। আসলে কিন্তু কিছুই ঘটল না। 'ওরা আমায় এখানে আটকে রেখেছে কেন?' সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি প্রত্যেক দিন আশি ফ্রাঁ কামাচ্ছিলাম। তাকে ত্রিশ দিয়ে গুণ করো। আর এখন ব্যবসার অবস্থা অনেক ভাল। গতকাল কাফে দ্য পারীর ওয়েটারটা বলছিল, আগের চেয়ে এখন সে ডবল রোজগার করছে। নিজেই হিসেব করে দেখ, ছ হাজার চারশোকে দুই দিয়ে গুণ করো। আমি জানি ওরা আমার ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামায় না; আমারও ভারী মাথাব্যথা পড়েছে ওদের জন্যে। আমার মত লোকের সংখ্যা কি কম? অন্তত ত্রিশ লক্ষ। হিসেব করো—চার হাজার আটশোকে গুণ করো ত্রিশ লক্ষ দিয়ে।' দাঁতে-কাটা পেন্সিলের একটা অবশিষ্টাংশ টেনে বের করল সে। 'হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে—এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ। এবার বারো দিয়ে গুণ দাও।'

হিসেব-রক্ষক লাবোন-এর বিমান সম্পর্কে ভয়ানক ভয়। 'সাধারণ গুলিগোলাকে ভয় পাই না।' সে বলল, 'কিন্তু যখন আকাশ থেকে বোমা পড়ার কথা ওঠে তখন তুমিই বল ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়!' তার বৌ দূরে আছে এই বলে নিজের মনকে প্রবোধ দিল সে। সে সর্বদা বেশ্যাপল্লীতে কাটায়। সে বলল,

'যাই হোক, আমি তো মরবই। তার আগে যতটা পারি স্বাধীন জীবন কাটিয়ে নিই।'

তারপর হল জিভের। লোকটা কেমন ছেলেমানুষ আর দুর্বলচিত্ত। কেবল কবিতা লেখে। বিষয়বস্তু হল রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথ আর একটা উন্মাদ অর্গান-বাজিয়ে।

এই সমস্ত লোক একই সঙ্গে থাকে, একঘেয়েমিকে সমানভাবে ভাগ করে নেয় আর মদ গেলে। একদিন হঠাৎ কেউ দৌড়ে এসে চিৎকার করে ওঠে, 'কাল চলে যেতে হবে আমাদের।' লোকেরা বাড়ীতে চিঠি লিখতে বসে আর স্থানীয় মেয়েদের আলিঙ্গন করে। তারপর ঘোষণা করা হয়, 'মিথ্যা খবর'। ইভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করে ওঠে : 'কী হয় এই সব করে?'

একদিন আঁদ্রে লরিএকে বলল 'বুঝতে চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এ একটা জগাখিচুড়ি! তুমি নিজেই জানো কে কার শত্রু। এ যেন ভীড়ের মধ্যে ধরা পড়ে যাওয়া...কেউ এতটুকু নড়বে না সেই জায়গা থেকে। ওরা কি বলছে তা শুনে কী লাভ? সত্যি কথাটা মুখ থেকে বের করবে না কেউ। একে অপরকে ঠকাতে আর হারাতে ওরা ব্যস্ত। এ যেন আমি আঁকতে বসে টিউব থেকে রং বের করছি। তুমি লালটা টেপো, কালো বেরিয়ে আসছে। আবার শাদা টিপলে লাল রং বেরোচ্ছে। না, এর চেয়ে না ভাবাই ভাল!'

রেডিওর নৃত্যগীত থেমে গিয়ে সংবাদ-ঘোষণা শুরু হতেই প্রত্যেকে চিৎকার করে উঠল, 'মুখ বন্ধ করে দাও শালার!' দালাদিএর সংস্কৃতি রক্ষার প্রচেষ্টা, রণাঙ্গনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা না ঘটা, জার্মান কর্তৃক আরেকটি সতের হাজার টনের জাহাজ জলমগ্ন হওয়া—প্রতিদিনকার এই খবরগুলি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে তাদের।

শহরে যুদ্ধের কথা সবাই ভুলে গিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সৈন্য-সমাবেশে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সমস্ত শহর—কিন্তু আবার সমস্ত কিছু ফিরে পেল পুরনো জীবন। নাপিত শারদোনে দু লক্ষ ফ্রাঁ লটারী জিতল। 'প্রত্নতত্ত্ব পত্রিকা'র চলতি সংখ্যায় ছেপে বের হল আফগানিস্থানের এক খননকার্যের বিস্তৃত বিবরণ। মারকিস্ দ্য নিওর নালিশ জানালেন যে, জীবিকার খরচ বেড়ে চলেছে, সুতরাং মালীকে তাড়িয়ে দিয়ে মোটরচালককে মালীর কাজ করতে বলতে হয়েছে। মালীটিও মারকিসের সোনার ঘড়ি আর পরিবারের পুরনো একখানি রেকাবী চুরি করে তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

তারপর সে ধরা পড়েছে বেশ্যালয়ে। স্থানীয় খবরের কাগজগুলো উরুগুয়ে উপকূলের নৌ-যুদ্ধের চেয়ে এই ব্যাপারে বেশী উৎকণ্ঠিত। বড় স্কোয়ারে এসে সার্কাসওলা তার তাঁবু গাড়লো। তিনটি বিরক্ত চিতাবাঘ একটা আর্ম-চেয়ার থেকে আরেকটা আর্ম-চেয়ারে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল অক্লান্তভাবে।

জানুয়ারী মাসে একদিন ইভ্-এর ওপর ফেটে পরল কর্নেল, 'সৈনিক হবার উপযুক্ত নও তুমি, গেঁয়ো ফায়ারম্যান কোথাকার।' ব্যারাকগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হল, তে-রঙা নিশান ওড়ানো হল প্রধান প্রধান রাস্তায়। পোয়াতিএর-এর ডেপুটি—বর্তমানে মন্ত্রী—পদার্পণ করবে বলে সমস্ত কিছু তৈরী। নগরকর্তা অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দিল, ক্লেমসো ও অন্যান্য পুরনো পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলনা করল তেসার। তেসা নম্রভাবে মাথা নাড়িয়ে গেল। নগরকর্তার বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল তেসা, বলল, 'ভাবলাম, যে শহর আমায় আস্থা জানিয়ে সম্মানিত করেছে, এই ঐতিহাসিক দিনে সেই শহর পরিদর্শন করে আমি আনন্দ পাব। আমি জানি পোয়াতিএর-এর সন্তানদের বুকে আজও পবিত্র আগুন জ্বলছে। প্রাচীন কালে সমাজপালক ঋষি স্যাঁইলারিওঁকেও এই উদ্দীপনা প্রেরণা দিয়েছিল। আজ এর থেকে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে ম্যাজিনো লাইনের রক্ষীরা। আমাদের ভাবনাচিন্তা আজ একটিমাত্র জিনিসে কেন্দ্রীভূত এবং তা হল সাফল্য।

তেসা ভিয়েনে কিছু জায়গা-জমি কিনতে চলে এসেছে। অতীতে সে যা উপায় করেছিল সবই খরচ করে ফেলেছে। কিন্তু এখন পয়সা নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। বিভিন্ন কোম্পানী যাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে তারা সবাই ফেঁপে ফুলে উঠছে। অবশ্য টাকাগুলো সে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে পারে কিন্তু তাতে টাকা টাকাই থাকবে। তাছাড়া, সে সম্বন্ধেও কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। শেয়ার কিংবা ডলার—কোনটার ওপরই আজকাল আস্থা নেই তেসার। জমিই একমাত্র জিনিস যা বদলায় না। একটা চমৎকার বাগান-বাড়ী কেনা কত ভাল! তাহলে ইস্টারের সময় সেখানে পলেৎকে আনা যেতে পারে, ফুলের অরণ্যে বেড়াতে বেড়াতে ভুলে যাওয়া চলে, ব্রতৈল, সেনাপতি ও যুদ্ধের কথা। সম্প্রতি সে লাভালকে নিয়ে তামাসা করছিল, 'ও লোকটা একটা কঞ্জুস। জমি কেনা ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছুও জানে না।' সলিসিটরের আপিসে গিয়ে তেসা অনেকগুলি প্ল্যান আর ফটোগ্রাফ পরীক্ষা করল। একটা বাড়ী ভয়ানক ভাল লাগল তার। বাড়ীর মুখটা আঠারো শতকের বাড়ীর

মত দেখতে, বাগানটা পেতি ত্রিয়ানঁর মত সাজানো, ভেতরে সমস্ত রকম আধুনিক সাজসরঞ্জাম লাগানো আছে!

পরদিন মোটরে করে প্রী-দে-দ্যাঁ এস্টেটএ রওনা হল তেসা। খাবার আগে ভেতরে গরম জামা আর দুটো বোনা ওয়েস্ট-কোট পরে নিতে ভুলল না—যা ঠাণ্ডা আবহাওয়া! লুসিয়ঁ কী করছে? ঠাণ্ডায় জমে মরে যায়নি তো? মনে মনে ছেলের মৃত্যুর ছবি আঁকল তেসা।

'ফিনল্যাণ্ডের মতই ভীষণ শীত। আচ্ছা, আজকের খবরের কাগজ পড়েছ? জার্মান নামওলা মার্শালটা কিন্তু ভয়ানক চমৎকার লোক! আমার বিশ্বাস ও জিতবেই।' তেসা সলিসিটরকে বলল।

বাড়ীর সামনে একটা উলঙ্গ পরীর মূর্তি ব্রোঞ্জের পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চক্রের ওপর ঝুলছে বরফের লম্বা লম্বা ফোঁটা। মনে হচ্ছে পরীটিও যেন ঠাণ্ডায় জমে গেছে।

তেসা বলল, 'বড় চমৎকার বাড়ী। সামন্ত যুগের পঞ্চদশ লুই আমলের সিলিং-এর সঙ্গে বর্তমান ফায়ারপ্লেস—এই সমন্বয় বড় ভাল লাগে আমার।'

সন্ধ্যার দিকে সে শহরে ফিরে গেল। মনে পড়ল দেনিসের জন্যে এক বাক্স চকোলেট কিনে আনত সে। এই কথা মনে হতেই কেমন বিষণ্ণ বোধ হল। প্রায় চার বছর আগেকার কথা। যদি যুদ্ধ না বাধত তাহলে আবার ভোটদাতাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হতে হত তাকে। কিন্তু এখন মাথায় অন্য চিন্তা। কত অদ্ভুত ছিল সে সময়টা! সে ছিল একমাত্র প্রার্থী। অন্য সবাই মাথা নুইয়ে বিদায় নিয়েছিল তার কাছে। আমালি আর ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে প্রতীক্ষা করছিল তার জন্যে। দেনিস হাসছিল; এমন কি, লুসিয়ঁও চেষ্টা করেছিল বাবার কাছে ভালমানুষ সাজতে। সে প্রে-দে-দ্যাঁ কিনছে শুনে কত উল্লসিত হয়ে উঠত আমালি। পল্লী-জীবন, মুরগী, শাক, সবজি—এ সমস্ত ভালবাসত সে। আর এখন এই সম্পত্তি কার জন্যে কিনছে সে? পলেতের জন্যে? কিন্তু ও তো মিয়োজারের ছেলের মত কোন পয়সাওলা নবাবপুত্তুরের খোঁজ পেলেই খেদিয়ে দেবে তাকে। না, ঐ জমিটা তার নিজের জন্যেই, একমাত্র তার নিজের জন্যেই। পির-লাশেস্-এর গোরস্থানে ঠিক আমালির কবরের পাশেই যে জমিটা, তার কথা মনে পড়ল তেসার। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলছিল সে কিন্তু সৌভাগ্যবশত সন্ধ্যাবেলায় মারকিস্ দ্য নিওর বাড়ীতে তার সম্বর্ধনা সভার কথা মনে হতেই নিজেকে প্রবোধ দিল।

তাকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে উৎসাহে কলকল করে উঠল মারকিস্ঃ
'প্রতিবেশী হিসেবে আপনাকে স্বাগত জানাতে আমরা আনন্দিত হয়ে উঠছি। পোয়াটু নির্বাচন করে সত্যিই খুব ভাল কাজ করেছেন আপনি।'
সাল্যোঁয় গিয়ে তেসা স্থানীয় অভিজাত, প্রত্নতাত্ত্বিক, কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মচারী এবং তার পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রাঁদমেজোঁর দেখা পেল। গ্রাঁদমেজো চিৎকার করছে 'ওদের শিক্ষা দিতে হবে! ইংরেজদের দ্বিধান্বিত হবার কোন অর্থ বুঝি না আমি। কৃষ্ণসাগরে গিয়ে এর হেস্তনেস্ত করো একটা।'
দর্শকরা তেসাকে ঘিরে ধরল। ফিকে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে বোঝাতে লাগল, 'সমস্ত কিছু প্ল্যান অনুযায়ী করা হচ্ছে। জার্মানদের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা বজায় আছে এ কথা বিশ্বাস করা ভুল। এই শীতকালে মস্ত একটা শিক্ষা পেয়েছে ওরা। সামরিক সাফল্যের চেয়েও থাইসেন বিমান পর্যবেক্ষণের একটা গুরুত্ব আছে। রাইখওয়ের ক্ষেপে আগুন। জার্মানদের সঙ্গে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হবার সম্ভাবনা আমি তো দেখছি। গোয়েরিং-এর মত লোক অবস্থার গুরুত্ব পুরোপুরি বোঝে। হেসের মত লোক!'
নির্বাচনের সময়কার প্রতিদ্বন্দ্বীদের খবরাখবর নিল তেসা। ব্রতৈলের অনুগত হুগারকে ডেকে এনে পেট্রল সরবরাহের দায়িত্বে বহাল করা হয়েছে। তালা-কারিগর দিদিএকে পাঠানো হয়েছে রে দ্বীপের বন্দীশালায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিৎকার করে উঠল সে, 'এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হওয়া ভয়ংকর কথা। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই: শত্রু এসে পৌঁচেছে ফ্রান্সের দোরগোড়ায়।
পরদিন সকালে তেসা মোটরে পারী রওনা হল। তাকে গার্ড অব অনার দিল ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা। আঁদ্রে বহুবার লুসিয়ঁকে তার বাবার সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছে কিন্তু তাকে কখনো রক্তমাংসে দেখেনি। এখন তাকে দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেল আঁদ্রে, ঠিক ছোট্ট পাখীর মত দেখতে। গার্ড অব অনার পরিদর্শন করে তেসা তার চামড়ার দস্তানা দিয়ে লম্বা নাকটা মুছল। শীতার্ত বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে 'মার্সাই'-এর সুর।
তেসাকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হল সৈনিকদের মধ্যে। তারা সবাই জানে যে তেসা একটা জমিদারী কিনেছে। ইভ্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'কুত্তার বাচ্চাটা এধারে নাক ঢোকাতে এসেছে। নাক ডুবিয়ে দেখল জমিটা খাসা, তাই পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করেনি। শুনছি আশেপাশের জমির দর নাকি তিন ফ্রাঁ থেকে বারো ফ্রাঁয় উঠে গেছে।'

নিভেল্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, 'এতে ওর কি যায় আসে? সব জাতেই ও কিছু না কিছু করবে। যেমন আমি বিয়ারের গ্লাশ নিয়ে করতাম। কিন্তু তবুও আমাকে নিষ্কৃতি দিতে চাইবে না ও।'

'কেমন গুরুগম্ভীর মুখখানা ওর।' লরিএ বলল, 'ঐ রকম মুখ নিয়ে ওরা একমাত্র শবযাত্রায় যায়। তবু ও গলা ফাটিয়ে বলবে—যুদ্ধজয়! চল, সার্কাসে যাওয়া যাক। যাবে নাকি?'

সার্কাসে পাউডার ও জন্তুর প্রস্রাবের গন্ধ। অশ্বারোহী মেয়েটির স্কার্টে ঝলমল করছে কাঁচের মালা। অভিনয়রত বাঁদরটা হাঁচছে আর বিরাট অর্গানটা গর্জন করে চলেছে একটানা। ১৪ই জুলাইয়ের কথা মনে পড়ল আঁদ্রের—সেই নাগরদোলা আর চকচকে নীল হাতী। জিনেৎ এখন কোথায়? আজও কি সে ওষুধের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করছে? কাঁদছে? কারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। সে ভাবত, সে ভাগ্যহীন। আজ সে বুঝেছে সবার ভাগ্যই এক। লরিএ ঠিক কথাই বলেছে: জীবনে শান্তির মুখ দেখে যেতে পারবে না তারা। এমন কি চুক্তি যদি হয়ও তো বড় জোর এক বছর দু বছর টিঁকবে, তারপর আবার শুরু হবে গণ্ডগোল।

ইভের তার নিজস্ব ভাবনা আছে। সে মনে মনে বলল, 'বড় চমৎকার এখানকার জমি। কিন্তু চাষীরা ভয়ানক চতুর। গমের সঙ্গে ডাল মিলিয়ে ফেলেছে যাতে শস্য হাতছাড়া না হয়। গরু বাছুর জবাই করছে ওরা। ওরা বলে, আমাদের কাছে কাগজের টাকার কী দাম। ওরা কাউকে বিশ্বাস করে না। আর দেখ, জমির দর কি ভাবে চড়ে গেছে! কে আছে এ সবের পেছনে?'

উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করল চিতাবাঘগুলো, কান দুটো নামিয়ে নিল। বেগুনী ফ্রককোট পরা ছোট্ট বেঁটে সার্কাসের লোকটি চাবুক আছড়ে চলেছে অক্লান্তভাবে।

জিভের বলল, 'ওদের পক্ষে আর্ম-চেয়ারগুলো ভয়ানক ছোট।'

আবার আর্তনাদ করে উঠল বিরাট অর্গানটা।

আঁদ্রে লরিএর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বলল, 'সব চেয়ে কদর্য জিনিস হল ওদের নির্লিপ্ততা। ওরা সার্কাসে যায়, কাফেতে গিয়ে ভীড় করে। এদিকে ভেসা জমি কিনছে। গম লুকিয়ে রাখছে চাষীরা। কিন্তু কাল কী হবে? গত বছর অন্য রকম ছিল অবস্থা। হয়ত হাস্যকর, কিন্তু অনেক মানবিক। ওরা চিৎকার করত, 'বার্লিন চলো' তারপর জার্মানদের দোকান লুট করত আর

ঘৃণা করত 'বশ্‌দের'। তারপর যুদ্ধ করত। ওদের উদ্দীপনা ছিল অপরিসীম। ক্লেমসো তাঁর শিরদাড়া সোজা করে বলেছিলেন—পারীর সামনে, পারীতে এবং পারী ছাড়িয়েও জোর প্রতিরোধ করব আমরা। তারপর ঘোষণা শোনা যেত—লেনিন বলেছেন...ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং টগবগ করে উঠত সমস্ত কিছু। কিন্তু এখন সব কিছু এত নিরুপদ্রব এত শান্ত যে তোমার চিৎকার করতে ইচ্ছে করবে। চিতাবাঘের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। বলা হয় ওরা বন্য হিংস্র জন্তু। আসলে কিন্তু ঘেয়ো বুড়ো বেড়ালের চেয়ে বেশী হিংস্র নয় ওরা। এ সব আমার ভাল লাগে না, লরিএ।'

'আমারও না।' লরিএ বলল।

১১

লোকে ঠাট্টা করে লুসিয়ঁকে জিজ্ঞাসা করল, সে ভেসার কোন রকম আত্মীয় হয় কিনা। লুসিয়ঁ বলল, 'শুধু নামটুকুই।' তবু নামের মূল্য কম নয়। সাবধানী মেজর হাসপাতালের বেয়ারার কাজে নিযুক্ত করল লুসিয়ঁকে যাতে বুলেটের ছিটেফোঁটা লাগার সম্ভাবনাও তার না থাকে।

পুরনো মঠ-বাড়ী উন্মাদ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে। লুসিয়ঁর কাজ হল পাগলদের শাসনে রাখা এবং বিমর্ষ পাগলদের রবারের টিউবের সাহায্যে নাক দিয়ে খাওয়ানো। একটা সার্জেন্ট বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে; লোকদের ওপর বেয়নেট চার্জ করার আগ্রহ তার অপরিসীম। বেন্নোঁ নামে একটি তরুণ সৈনিক চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে—সামান্য বুরুশ, পিকদানি বা ডাক্তারের চশমা, কিছু দেখলেই আঁতকে ওঠে সে। অন্য একটি রোগী—সে কেবল মেয়েদের স্তন-যুক্ত উলঙ্গ সৈনিকদের ছবি আঁকে; আরেকটি পাগল এসেছে মার্সাই থেকে—সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যুদ্ধ-সংবাদের কমমূল্য আওড়ায়, 'উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি...উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি।'

আরেকটি পাগল লুসিয়ঁকে খোলাখুলি বলল, 'আমি ইচ্ছে করে পাগল সেজেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম লিভারের গোলমালেই কাজ হতে হয়ে যাবে। লিমোজে-এ একসঙ্গে পনেরটা ডিম গিলে ফেললাম। ভাবতেই পারা যায় না ব্যাপারটা! কিন্তু কিচ্ছু হল না। ওরা ফ্রন্টে পাঠিয়ে দিল আমায়। তারপর ঠিক করলাম গরুর মত হামলাতে আরম্ভ করব। কিন্তু কারও কাছে এ কথাটা বলবেন না যেন।'

লুসিয়ঁ ঘাড় নাড়িয়ে বলল, 'আমার ভারী বয়ে গেছে। যতই ইচ্ছে হামলাও না কেন আটকাতে যাবো না আমি।'

বেয়ারারা তাস খেলে আর মহোৎসাহে বেশ্যাবাড়ী যায়। হাসপাতালের কোয়ার্টারের ঘুলঘুলি, যেখানে এক সময়ে মুনি-ঋষিদের মূর্তি থাকত, এখন মদের বোতলে ঢেকে গিয়েছে। আগুনের ধারে বসতে লুসিয়ঁর ভাল লাগে। এই তার একমাত্র আনন্দ। সে মনে মনে বলল, 'অগ্নি-উপাসকদের আমি বুঝতে পারি।' আগুন থেকে নতুন প্রেরণা পেল লুসিয়ঁ। কেমন মরে গিয়েছিল সমস্ত আগুন কিন্তু হঠাৎ আবার জ্বলে উঠে সমস্ত কাঠকে লেহন করে নিল। লুসিয়ঁর চুলগুলোকে দেখাল আগুনের শিখার মত।

জেনী লিখেছে, সে আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছে। আমেরিকান কনসাল নাকি তাকে ফিরে যেতে জেদ করেছে। সে লিখেছে, আবার তারা পারী কিংবা নিউইয়র্কে মিলিত হবে। আগুনের মধ্যে চিঠিটা ছুঁড়ে দিল লুসিয়ঁ। এখন গভীরভাবে বুঝল যে সে কত ভালবাসত জিনেৎকে। লোকে বলে, সময় মানুষের শত্রু। এ কথা সত্যি নয়। সময় ওপরকার আবরণকে ক্ষয়ে ফেলে, কপট শোক ও কৃত্রিম হৃদয়বৃত্তি মুছে যায় কিন্তু সত্যিকার আবেগ বেঁচে থাকে। জেনীর কাছে সে বিদেশী এবং তার কাছেও জেনী ঠিক তাই। এ যেন ঠিক 'জিগ্-স' ধাঁধার মত। সমস্ত ছবিটাকে একসঙ্গে সাজাতে হবে কিন্তু কোন একটা টুকরো আরেকটা টুকরোর সঙ্গে মিশ খাবে না।

রেডিও ডেকে উঠল, 'ফ্রন্টে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।' সঙ্গে সঙ্গে মার্সাইএর লোকটাও গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।'

নতুন বছরের পর লুসিয়ঁ ফ্রন্টে যাবে বলে আবেদন জানাল। ভাবল, মৃত্যুর সান্নিধ্য তার পরিশ্রান্ত চিত্তবৃত্তিকে সজীব করে তুলবে। কিন্তু ফ্রন্টের জীবন তার কাছে কেমন আদিম, প্রাণহীন ও অভিশপ্ত মনে হল। গোলাগুলি লেগে কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। কিন্তু সৈনিকরা কেমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে এ সবে। তারা হাই তুলে বলে, 'এ হল একটা লটারী।'

লুসিয়ঁ কথা বলার সঙ্গী পেল একজন—লোকটা নরমাণ্ডির অধিবাসী, কেমন ঘোড়ার মত চোয়াল আর চকচকে চোখ। লোকটা পেশাদারী প্রত্নতাত্ত্বিক। নাম আলফ্রে। লুসিয়ঁর কাছে সাহারা-খননকার্য ও প্রাচীন পৃথিবীর চিহ্ন সম্পর্কে গল্প করল সে। লুসিয়ঁর মনে পড়ল বরফ আর পেঙ্গুইন পাখীর কথা।

একদিন তারা যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করল। আলক্রের চোখে দালাদিএ স্বাধীনতার প্রতীক; তার বিশ্বাস—যুদ্ধজয়ের পর শিল্পকলা আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, নতুন এথেন্স ও নতুন জাগৃতি সৃষ্টি হবে সেখানে। লুসিয়ঁ তার মোহ ভাঙতে চাইল না। কেবল মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে বলল, 'ভাল কথা যে লোকটাকে তুমি নিজে জান না।'

তুষারাহত পা নিয়ে স্থানান্তরিত হয়ে গেল একটি সৈনিক। গরম মোজা পাওয়া যেন একটা অনধিগম্য স্বপ্ন। গুজব রটল, সৈন্যবাহিনীকে ফিনল্যাণ্ডে পাঠানো হবে।

সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা শাদা মাঠ, কেবল তার মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে লাল সূর্য—ফেব্রুয়ারীর এমনি একটা ঠাণ্ডা সকালে পিকার্ সমভিব্যাহারে পার্লামেণ্টারী দল ঘাঁটি পরিদর্শনে এল।

সম্প্রতি একটা খবর রটেছিল যে পিকার্কে সিরিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে; ওয়েগ্যাঁ বলেছে যে সে একজন 'অগ্নিনির্বাপক' এবং নিকট প্রাচ্যের আগুন নিবোনোর দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। পিকার্ আপত্তি জানিয়েছে, 'যুদ্ধে হোসের চেয়ে আগুনে-বোমা অনেক বেশী জরুরী।'

পিকার্ কর্মপন্থার সমস্ত খসড়া তৈরী করে ফেলেছিল। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সে বলত 'বাকু সৈন্যবাহিনী' কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের ঘটনায় সে উত্তর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হল। তেসাকে বলল, 'একটা শক্তিশালী অভিযাত্রী বাহিনী পাঠাতে হবে এখান থেকে। জার্মানদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করতে পারি না। তাছাড়া চাইও না। এদিকে সৈন্যদের বেকার বসিয়ে রাখাও বিপজ্জনক। কমিউনিস্টরা উঠে পড়ে লেগেছে। এই বসন্তেই গণ্ডগোল বাধাবে একটা। একমাত্র ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে চরম সাফল্য হলে এই সমস্যা কেটে বেরিয়ে আসতে পারব আমরা।'

ল্যাপল্যাণ্ডের লোহার খনি, 'মাটির পা-ওলা বিরাট মূর্তি' এবং রোমের সহানুভূতি—এই নিয়ে জোর আলোচনা চলল পার্লামেণ্টের লবিমহলে। ম্যাজিনো লাইনের দৃঢ়তা সম্পর্কে নিজেরা আশ্বস্ত হবার জন্যে ডেপুটিরা এসে ঘুরে যেতে লাগল। একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানকে সমর্থন করার আগে দেখে নেওয়া দরকার সমস্ত প্রবেশপথগুলো ঠিকমত বন্ধ আছে কিনা। প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনজন র‍্যাডিকাল, দুজন দক্ষিণপন্থী এবং একজন সমাজতন্ত্রী। ব্রতৈল ছাড়া সমরনীতি সম্বন্ধে তাদের কারও রত্তিমাত্র জ্ঞান

নেই। তারা যেন একদল দর্শক যাদের হঠাৎ রঙ্গমঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে মনে তারা নিজেদের টুপি ও ট্রাউজারের কথা ভেবে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইল। তাদের মধ্যে একজন হাসিখুশি মোটা-সোটা লোক নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে একটা টিনের টুপি চেয়ে বসল।

ঘাঁটি পরিদর্শন করতে করতে বোকার মত নানা রকম প্রশ্ন করল তারা; মধ্যযুগীয় প্রাসাদ-দর্শনার্থী টহলদারদের মত মন্তব্য করল 'ওঃ', 'আঃ'।

জেনারেল পিকার ব্রতৈলের সঙ্গে সঙ্গে চলল। উত্তরমুখী অভিযানের ভালমন্দ বিচার করল তারা। কেমন তেজালো দেখাল ব্রতৈলকে।

সে বলল, 'আমরা মোড়ের মাথায় এসে পৌঁচেছি। ভয় ছিল যে সমাজতন্ত্রীরা বাধা দেবে কিন্তু ব্লুম চুপ করে আছে আর ভীইয়ার ছোটাছুটি করছে ফ্রন্টে। শান্তর আলপিন-এ পাঠানোর প্রশ্ন দু-একদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

একটা সামরিক ঘাঁটি পার হয়ে অগ্রসর হল তারা। লুসিয়ঁ অভিবাদন জানাল। ব্রতৈল তাকে চিনবে কিনা এই ভেবে কয়েকটা অস্থির মুহূর্ত কাটিয়েছে লুসিয়ঁ। কিন্তু গভীর আলোচনায় ডুবে আছে ব্রতৈল আর তাছাড়া প্রাইভেটদের দিকে নজর দেওয়ার অভ্যাসও তার বড় একটা নেই।

অতীতের পুরনো স্মৃতি লুসিয়ঁর মনে জাগল। এমন কি, বুলেট তাদের মাথার ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে এই ভয়ে ডেপুটিদের কুঁজো হয়ে চলার ভঙ্গীও তাকে এতটুকু আনন্দিত করে তুলল না। লজ্জায় মরে যাওয়া কি জিনিস তা ভালভাবে বুঝল লুসিয়ঁ। হ্যাঁ, তার অতীত সত্যিই লজ্জাকর। এই নিষ্ঠুর লোকটার ওপর কি করে একদিন আস্থা রেখেছিল সে? পিকারের সঙ্গে ব্রতৈল কি কথা বলছে তা অনায়াসে বলা যায়: ফ্রান্সকে নতজানু করবার মতলব আঁটছে ওরা। ১৯৩৬ সালের প্রতিশোধ। সিরিয়া আর ফিনল্যাণ্ডের যে কোন জায়গায় সৈন্য পাঠাতে ওরা তৈরী। হিটলারকে পথ করে দিতে চায় ওরা। লুসিয়ঁর বাবার কথা মনে পড়ল। ধর্মঘট সম্পর্কে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে তার বাবা প্রায়ই বলত, 'এর চেয়ে জার্মানদের আসা অনেক ভাল!' ওরা সব এক জাতের মানুষ। বোধহয় ওদের মধ্যে গ্রঁদেলই একমাত্র কম ক্ষতিকর। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষ তো মারা পড়ছে। গতকাল শার্ল প্রাণ দিয়েছে। সে ছিল পাহাড়ে-রাখাল, ব্যাগপাইপ বাজাত। তাকে কেন মৃত্যুর মুখে পাঠাল ওরা? বিশ্বাসঘাতক!

সন্ধ্যার দিকে লুসিয়ঁ আর আলফ্রে 'ক্যাম্প ফায়ার'-এর ধারে বসল। ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে দুজনে, মুখ দিয়ে কারও কথা বেরোচ্ছে না। একসময়ে আলফ্রেই কথা বলল, 'লীগ অফ নেশনস্-এর প্রস্তাবাবলীর পর—'

লুসিয়ঁ বাধা দিয়ে বলল, 'চুলোয় যাক! ও সব হল বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ঘৃণা ঢেকে রাখার জন্যে বড় বড় কথার জাল। ব্রতৈলকে দেখেছ? ও হল নিষ্পাপ লোক। স্বর্গে যাবার চেষ্টায় আছে। বলা বাহুল্য ও একজন 'দেশপ্রেমিক'ও। ও যখন লোরেন্ সম্বন্ধে কথা বলে তখন কান্নার সুর শুনতে পাবে ওর গলায়। কিন্তু গ্রঁদেল যে জার্মান গুপ্তচর এ কথা সর্বদা মনে আছে ওর। তাকে বাঁচিয়ে আসছে প্রথম থেকে। তুমি কি মনে কর পিকার্ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে? কক্ষনো না। ও অন্য একটা কিছু নিয়ে লেগে আছে। ফ্যাশিস্ট বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করছে ও। মেশিনগানগুলো এল কোত্থেকে? ড্যুসেলডর্ফ থেকে। এবং পয়সার ব্যবস্থা করল কে? কিলমান নামে এক জার্মান। সমস্তটা মিলিয়ে হীন চক্রান্ত একটা! লীগ অফ নেশনস্-এর নাম উচ্চারণ কোরো না আমার কাছে। তুমি বরং শার্ল কেন মারা গেল—এর কারণ খুলে বল আমায়।'

অনেকক্ষণ ধরে লুসিয়ঁ ব্রতৈলের 'মন্ত্রশিষ্য', মতিনির বাড়ীর সভা আর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে কথা বলল। একমাত্র কিলমানের চিঠি কি করে তার হস্তগত হল, এ কথা বলা প্রয়োজন মনে করল না সে। সে যে তেসার ছেলে এ কথা স্বীকার করতে চাইল না। তা যেন আরো অনেক বেশী লজ্জাজনক। আলফ্রে মুখে একটা গভীর হতাশার ভাব নিয়ে বসে রইল। সে বারবার বলতে চাইল, 'কিন্তু...' কিন্তু অগ্রসর হতে পারল না। অবশেষে সে কথা খুঁজে পেল, 'কিন্তু এই যদি হয় তাহলে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত এর ভেতরকার কথা। লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ওদের। ফ্রান্সকে আমরা বাঁচাবই।'

লুসিয়ঁ শ্লেষ করে হাসল। বলল, 'ঠিক জেনীর মত! মেয়েটি আমেরিকান। আমি তার সঙ্গে থাকতাম, বরং তার ডলারের সঙ্গে থাকতাম বললেই ঠিক হবে। সেও ঠিক এই কথাই বলত: তাহলে তো তোমাদের বিপ্লব দরকার। অনেক দেরী হয়ে গেছে, বুঝলে খোকা। আমরা ১৯৩৬এ কী করছিলাম? এখন আর চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। ওরা আমাদের পিষে মারবে

আর ব্রতৈল হয়ে উঠবে গাউলাইতর। কিংবা সব কিছুকে জাহান্নমে পাঠাবে ওরা। তোমাকে আমাকে বাদ দেবে না। ব্যাপারটা দাঁড়াবে ঠিক তোমার খননকার্যের মত। বিংশ শতাব্দীতে মাটি খুঁড়ে ওরা একটা ডানহিল লাইটার, একটা মেসার্শমিট ইঞ্জিন ও মহদাশয় ভীইয়ারের খুলি বের করে চিৎকার করে উঠবে—কী অদ্ভূত সভ্যতা! একটা সান্ত্বনা যে, এ কথা বলার জন্যে আমরা তখন বেঁচে থাকব না। উঃ! কী ভয়ানক শীত! সত্যি কথা বলতে কি, রীতিমত একঘেয়ে লাগছে এ সব।'

১২

জোলিও তার স্ত্রী আর তার স্ত্রীর ভাই আলফ্রেকে নিয়ে এক সঙ্গে নতুন বছরের উৎসব উপভোগ করল। আলফ্রে সামরিক ডাক্তার, তিন দিনের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। তারা রেস্তোরাঁয় গিয়ে দু বোতল শ্যাম্পেন খেল। কতকগুলি মেয়ে গোলাপী আর নীল কাগজের গুলি পাকিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল তাদের দিকে। আলফ্রে লজ্জায় চোখ মিট মিট করে বলল, 'এগুলো বোমা।'

জোলিও ঘোষণা করল, 'আমাদের জয় হোক! আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সৈন্যরা বার্লিনে বসে নতুন বছরের অভিবাদন জানাচ্ছে।'

তারপর হঠাৎ কুসংস্কার বশে সে টেবিলের ধারের কাঠে হাত ছোঁয়াল। মুখ ফিরিয়ে নিল আলফ্রে। জোলিওর বিস্তারশীল আচরণে কেমন অসোয়াস্তি বোধ করে সে। কিন্তু মারি তার ভাইয়ের দিকে মমতাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'যদি তুমি মারা যাও!'

জোলিও কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করল, 'এ একেবারে ন্যায়সঙ্গত। এ বছরের শেষে, জার্মানদের একটা কামান পিছু আমাদের পাঁচটি করে কামান থাকবে।'

'জানি না। ও সব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি।' আলফ্রে বলল, 'কিন্তু সীরাম নেই আমাদের। ভয় হয় একদিন আচমকা বিপদে পড়ে যাব আমরা। গত যুদ্ধে ধনুষ্টংকার হয়েছিল...'

জোলিও মাঝ পথে বাধা দিল। রোগ আর মৃত্যু সম্পর্কে কোন খবর সহ্য করতে পারে না সে।

পরদিন আলফ্রে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জোলিও ভুলে গেল তার কথা। ওর ধারণা ছেলেটা খুব ভাল কিন্তু কেমন ভোঁতা। মারি প্রায়ই চোখের জল ফেলে।

ভয় হয় তার ভাই হয়ত যুদ্ধে মারা যাবে। জোলিও বৃথাই আশ্বাস দেয় যে, ডাক্তাররা সব সময়ে পেছন দিকে থাকে, সুতরাং বিপদ থেকে তারা অনেক দূরে। স্ত্রী তবু প্রায়ই বলে, 'যদি হঠাৎ কিছু ঘটে?'

জোলিওর জীবন কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে ফিনদেশীয় খটমট নামগুলি তার মাথায় বোঝাই হয়ে আছে। রাত্রে অস্থিরভাবে ঘুমোতে ঘুমোতে আকাশ থেকে ঝুরির মত ঝুলন্ত শীতার্ত মানুষের অদ্ভুত স্বপ্ন জোলিওর মনে এসে উঁকি মারে। কেমন শীত শীত করে; ধীরে ধীরে মাথার ওপর কম্বলটা টেনে নেয় সে।

জোলিও লোকটা লোভী নয়; সে চায় সবাইই কিছু কিছু ভাগ নিক। তার জন বারো বন্ধুকে সে ফিনল্যাণ্ড আর স্টকহোমে পাঠিয়ে দিল। তার ভাই মারিয়ুস ভাল জাতীয় সংগীত গাইতে পারে, তাকে সে বলল, 'একটা জমকালো গানের জলসার ব্যবস্থা করো। ম্যানারহাইম সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলবে। টাকাটা ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যে দিতে পার। অনেক টাকা উঠবে কিন্তু।'

দু সপ্তাহ পরে মারিয়ুস অভিজাত দর্শকদের সামনে উপস্থিত হল, যোসেফিন মতিনির ওপর চোখ রেখে বাঁশী বাজিয়ে চলল সে, 'একদিন এক গাছের নীচে বসে আছে মার্শাল। তখন সবেমাত্র ভয়ানক বিপ্লব শুরু হয়েছে। এক অভদ্র শতছিন্ন কাপড় পরা এক সৈন্য এসে হাজির, লোকটা বলশেভিক—আগুন চাইল সে। বলতে ভুলে গেছি যে মার্শালটি সিগার খাচ্ছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে সৈনিকটির দিকে তাকালেন এবং জীবন বিপন্ন করে উত্তর দিলেন, জলন্ত সিগারটা এক্ষুনি গিলে ফেলব আমি।'

মহিলারা ঘন ঘন হাততালি দিল। অবশ্য সমস্ত টাকাই মারিয়ুসের পকেটে গেল —ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যে গেল না।

জোলিও অনেকবার ভেবেছে মুদ্রাকর পোয়ারিএর উপকারে আসবে সে। কস্মিনকালেও সে টাকার জন্যে তাগাদা করে না। এবার সুযোগ পাওয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষের আপিসে একটা মানচিত্র দরকার। জোলিও পোয়ারিএর নাম সুপারিশ করল। টেলিফোন করে বলল, 'ওহে, এ একেবারে রাস্তা থেকে চারশো হাজার ফ্রাঁ কুড়িয়ে পাওয়ার সামিল। মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখবার দরকার নেই। তা হলে মাথাটা ঘুরে যাবে একেবারে। আমি যখন ফিনল্যাণ্ডের খটমট নামগুলো উচ্চারণ করবার চেষ্টা করি, মনে হয় জিভে কি একটা আটকেছে যেন।'

কাগজ থেকে ফলাও আয় হচ্ছে কিন্তু দিন দিন কেমন দমে যাচ্ছে জোলিও। কি একটা ভয় করছে সে, কী ভয় সে নিজেই জানে না। দিনে দু'বার করে ফ্রণ্ট থেকে সংবাদ আসছে 'উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি...' দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে পারী আর আনন্দে মেতে উঠছে।

'একবার ব্যাপারখানা দেখ, ওরা রেশমের পরদার মত বাড়ী আর গাড়ী কিনছে।' জোলিও বলল।

লা ভোয়া নুভেল্-এ ফিনিশ সৈন্যদের পাশাপাশি শামনি ও অন্যান্য শীতকালীন ক্রীড়াকেন্দ্রের স্কিয়িং প্রতিযোগিতার ছবি ছেপে বার হল; পারীর অভিজাত মহিলারা ফিনিশ সৈন্যদের থেকে পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। কিন্তু সুন্দরী স্কিয়ার বা সরকারী সংবাদ—কারও ওপরই আস্থা নেই জোলিওর। পৃথিবীতে একটা ভয়ানক কিছু ঘটেছে। এমন ঠাণ্ডা আর আগে কখনো পড়েনি। সেভিল-এ বরফ পড়ছে, সর্দিগর্মি হয়ে শত শত লোক মারা যাচ্ছে আর্জেন্টিনে। তুর্কিতে ভূমিকম্প হয়েছে। এসব থেকে মনে হচ্ছে কোথায় যেন গণ্ডগোল বেধেছে একটা। জোলিও আরো বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, সর্বদা একটা কাঠের টুকরো নিয়ে ঘুরতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে সারা দিন সে মইয়ের নীচ দিয়ে যাতায়াত করেছে নাকি! মারি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'অনেক দিন হল আলফ্রের কোন চিঠিপত্র আসেনি।' জোলিও উত্তর দিল, 'কোথাও গিয়ে ফূর্তি করছে হয়ত।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপদের আশঙ্কায় পকেটের ভেতরকার কাঠের টুকরোটা চেপে ধরল প্রবলভাবে।

রুরের ধনকুবের থাইসেন পারীতে এসে উপস্থিত হল। ফটোগ্রাফাররা ঘিরে ধরল তাকে, সুন্দরী মেয়েরা তাকিয়ে দেখল তার দিকে। থাইসেনের ছোট্ট কুকুরটার ছবি 'লা ভোয়া নুভেল্'-এ ছেপে বেরুল। জোলিও জানে, ব্রতৈল দহরম মহরম করছে লোকটার সঙ্গে।

ফটোগ্রাফের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল না। ব্রতৈল ফোন করল: কাগজে থাইসেনের স্মৃতিকথা বের করতে হবে।

'ঠিক এই জিনিসই আমরা চাই। পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ তৈরী হবে এর থেকে।'

জোলিও ক্রিলোঁ রওনা হল। ওখানে থাইসেন নেমেছে। অলঙ্কারবহুল কৌচে বসে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। তারপর একটি দাম্ভিক প্রকৃতির লোক বাইরে বেরিয়ে এল। জোলিও সাড়ম্বরে অভিনন্দন জানিয়ে হাসল,

তারপর স্বাধীনতা ও জাতিগুলির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে আলোচনা করল। থাইসেন নীরসভাবে উত্তর দিল, 'ক্ষমা করবেন। এখন ভয়ানক ব্যস্ত আমি।'

পাণ্ডুলিপিটা জোলিওর হাতে দিয়ে উঠে গেল সে। লেখাটার দিকে তাকিয়ে সে পড়ল, 'সেই বসন্তকালে হিটলারের সঙ্গে আমি একসঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরিকল্পনা নিলাম...'

পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এল জোলিও। মারিকে কাঁদতে দেখে সে বলল, 'আলফ্রের জন্যে ভাবনা কোরো না। ওখানে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না আর হবেও না কোন দিন। ঐ জার্মান লোকটাকে তোমার দেখা উচিত একবার। ঐ লোকটার উপযুক্ত জায়গা হল বন্দীশালা। কিন্তু এক্ষুনি ও তেসার সঙ্গে দেখা করতে গেছে, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। কাল তার স্মৃতিকথা ছেপে বার করছি আমরা। মতিনি বলল, 'যোগাযোগ স্থাপন করছি আমরা।' এর অর্থ বুঝতে পারলে? কেঁদো না, মারি লক্ষ্মীটি। কোন অমঙ্গল হবে না আলফ্রের। ফিনল্যাণ্ড বাদে আর কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে না।'

মুখের ওপর থেকে রুমালটা সরিয়ে নিল জোলিওর স্ত্রী, তারপর মৃদুভাবে বলল, 'মারা গেছে আলফ্রে।'

এবার টেবিলের ওপর একটা বড় হলদে খামের ওপর নজর পড়ল জোলিওর।

১৩

মিশোর পল্টনকে লা হেভ্র্-এ পাঠানো হয়েছে। রীতিমত ভীত হয়ে উঠেছে মিশো; ভাবছে তাদের ফিনল্যাণ্ডে পাঠানো হবে এবার। তার জীবন যে ব্যর্থ নয় এবং সুখ যে শূন্যগর্ভ নয় তার প্রতিভূ হিসেবে সে তাকিয়ে আছে মস্কোর দিকে। মস্কোতে যা কিছু ঘটছে সমস্তই রহস্য লাগে তার কাছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে, এ সবের সঙ্গে সে পরিচিত ও অঙ্গীভূত। যখন সে রেডিওতে আবখাসিয়ার লেবু বনের গল্প শোনে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক আনন্দময় হাসিতে। মস্কোর ভূগর্ভ রেলপথ নির্মাণের খুঁটিনাটি খবর সে মন দিয়ে শোনে যেন তারা ওর নিজের বাড়ী তৈরী করছে। 'ব্রাসেল্স্-এ

আমাদের পিয়ানো-বাজিয়েরা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে,' সে বলল। আমাদের—কথাটা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মনে এল তার। একবার সে দেনিসকে বলেছিল, 'এমন কি এই ফুলগুলো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সাধারণ ফুলগুলো—ডেজি আর বাটারকাপ।' যখন এই কথা মনে পড়ে আর সইতে পারে না মিশো : সে সোভিয়েট ইউনিয়নের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার অপর্যাপ্ত সবুজাভ বিস্তৃতিতে খুশি হয়ে ওঠে। এমন কি দেনিসের সঙ্গে গত সাক্ষাতের সময় সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মস্কোর প্রদর্শনী কেমন চলছে?' কল্পনায় সুদূর শহরটিকে দেখতে পায় সে, যেন কত বছরই না থেকেছে সেখানে। এর জন্যে সে মরতেও তৈরী এবং সে একাই নয়। তার মত শত শত সৈনিক এই মতাবলম্বী—এই বিশ্বাস বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। এবং অন্যান্য পল্টনেও তাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে একটা গোপন ভ্রাতৃত্ববোধ।

আর এখন লা হেভ্‌র্‌-এর বিস্তৃত পথ দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে বাতাস—পরদা ছিঁড়ে পড়ছে, কাত হয়ে পড়ছে বিজ্ঞাপনের বোর্ডগুলো, পথচারীরা ঘুরপাক খাচ্ছে ঘূর্ণির মধ্যে। বন্দরের বাঁশীগুলো আর্তনাদ করে উঠছে, দাঁত কড়মড় করছে কপিকলগুলো। দিন রাত কাজ হচ্ছে। অভিযাত্রী বাহিনীর কথা বলাবলি করছে লোকে।

মিশো এক-এক করে সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ করছে। সে জানে না, কে কমিউনিস্ট আর কে নয়, কিন্তু অনেক সময় আভাসে বোঝা যায়! কেউ হয়ত বলে যে 'লুমানিতের' সংখ্যাটা তার হস্তগত হয়নি, আবার কেউ কেউ হয়ত ভাইয়ারের মহানুভব মনের প্রতি কটাক্ষ করে বা তোরে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে 'আমাদের মোরিস।' মিশো ফিস ফিস করে বলল, 'ওরা যদি আমাদের রুশদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠায়, আমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করব। ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারবে না ওরা। সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয়ে যাবে এই কথা।'

উত্তর এল, 'জানি না। অন্যেরা কী বলছে? তোমার মনে রাখা উচিত এটা নির্বাচন নয়। তোমাকে গুলি করে মারতে পারে ওরা।'

মিশোর কুণ্ঠাহীন ভাষা আর হাসিখুশি ভাব পছন্দ করে লোকে। সার্জেন্টকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করলে লোকে বাহবা দেয় তাকে। কিন্তু বিদ্রোহ করা সম্পূর্ণ আলাদা একটা জিনিস। মিশো অনুপ্রাণিত হয়ে লেনিনগ্রাদের গল্প করল যেখানে

রাশিয়ানরা প্রাণপণে প্রতিরোধ করছে। ওখানে মস্ত বড় নদী আছে একটা; প্রাসাদের মধ্যে বাস করে ওখানকার মজুররা। লেনিন ওখানে থাকতেন। যারা ফ্রন্টকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে চায় তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দিল মিশো। উত্তেজিত ও ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে বিভিন্নভাবে কথা বলল সে, যেন আগামীকালই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওদের।

অভিযাত্রী বাহিনীতে এই পল্টনও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শুনে ঘুমোতে পারল না কর্নেল কুরিএ। রাতগুলো তাস খেলে কাটাতে লাগল। লোকটার মেজাজ চড়া আর চরিত্র দুর্বল। গত যুদ্ধে সে তার সাহসের পরিচয় দিয়েছে এবং সেজন্যে অলংকৃত হয়েছে দু বার। মৃত্যু সম্পর্কে সে নির্লিপ্ত কিন্তু জীবন, কর্তৃপক্ষ, রাজনীতির চতুর জাল, নিন্দাবাদ আর মিছিলকে সে রীতিমত ভয় করে চলে।

সারা শীতকাল পিকার্ডিতে ছিল পল্টন। প্রতিরোধ-দুর্গ তৈরী করার কাজে বেকার লোকদের নিযুক্ত রাখবে বলে ভেবেছিল কুরিএ। কিন্তু পিকার্ ধমক দিল, 'আতঙ্ক সৃষ্টি করতে কে বলল আপনাকে? এখানে ওদের আসার কোন সম্ভাবনা নেই। হতাশাবাদীদের কথায় কান দিচ্ছেন আপনি।'

রীতিমত ত্রস্ত হয়ে উঠল কুরিএ। ওদের বোঝে কার সাধ্যি? এ হল রাজনীতির ব্যাপার। কাজ থামাবার নির্দেশ দিয়ে সে ঘোষণা করল, 'প্রতিরোধ-দুর্গ বানিয়ে কোন লাভ নেই। কেবল হতাশাবাদীরাই এর প্রয়োজনে বিশ্বাস করে। জার্মানরা এদিকে আসবে না।'

এখন তারা ফিনল্যাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করছে। কেউ জানে না সৈন্যরা কি মতামত পোষণ করে। কিন্তু ওখানে গিয়ে রুশদের সঙ্গে তো বন্ধুত্ব পাতাতে পারে ওরা। যাই হোক, কার মাথায় ঢুকল এই পরিকল্পনাটা? কথায় বলে দুটোর চাইতে একটা শত্রু শ্রেয়। কী করে রাশিয়া জয় করা যায়? এমন কি নেপোলিয়ঁ পর্যন্ত আটকে পড়েছিল ওখানে। গামল্যাঁ কি সত্যি সত্যিই এ ব্যাপারটা ঘটতে দেবে? কিন্তু গামল্যাঁ পর্যন্ত শক্তিহীন; রাজনীতিজ্ঞরাই সব কিছুর ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

হতাশায় কর্নেল তাসগুলো ফেটিয়ে নিল; তবু মনের মত তাস মিলল না। দুটো গোলাম দরকার তার। এই নিয়ে ছয়বার গোলাম পেল না সে! যাক—আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে।

মিশো তার কমরেডদের বলছে, 'সীমান্ত দেখছ? লোকদের হটিয়ে নিচ্ছে ওরা। রুশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়। তারপর হিটলারের সৈন্য আসুক এখানে! এই ওদের ফন্দি!'

ম্লান প্রদীপের আবছা আলো লোকদের মুখে ঠিকরে পড়েছে। চুনকাম করা দেওয়ালে দপ্‌দপ্‌ করছে বিলম্বিত ছায়াগুলো। নানা রকম লোক এসে জমেছে। আসনিএর থেকে তালা-কারিগর এসেছে একজন; মনে হয় লোকটা কমিউনিস্ট। আরেকটি লোক, সে কৃষক—ফেলে-আসা বাড়ীর কথা বলছে সে। তৃতীয় লোকটি টহলদার ব্যবসায়ী, সেলাইএর কল বিক্রি করে সে। তাদের মধ্যে একজন কুলি, কসাই ও ডাকপিয়নও আছে। কী ভাবছে ওরা?

রহস্যটা জানাজানি হয়ে গেল হঠাৎ। পিকার্ সৈন্য পরিদর্শনে এল। বাছাই করা হল দুটো পল্টন। কুরিএ মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইল, কেমন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। হঠাৎ তার পেছনে কতকগুলি লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের?'

লাল হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ। রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বলল, 'কে চিৎকার করছে?'

উত্তর এল, 'আমরা সবাই!'

কি করবে ভেবে পেল না কুরিএ। ভয় দেখাবার বা বোঝাবার চেষ্টা করল না। শুধু লোকগুলোর কাছ থেকে বন্দুকগুলো নিয়ে নেওয়া হল। গুজব রটল সামরিক আদালতে বিচার হবে তাদের। রাত্রে লোকদের ঘুম এল না। তাদের শৈশব, তাদের শান্তিকালীন জীবন ও পরিবারের কথা মনে পড়ল একে একে।

তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমাদের সর্দার কে?' প্রত্যেকের মনে মিশোর ছবি ভেসে উঠল কিন্তু কেউ তার নাম বলল না। এবং চৈতালী ঝড় সারাক্ষণ তোলপাড় করে তুলল শহরটাকে।

পরদিন পিকার্ কর্নেলকে বলল, 'ওদের মধ্যে তিন-চারজনকে গুলি করে মারতে হবে যাতে ব্যাপারটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে ওদের মধ্যে।'

কুরিএ চিৎকার করতে শুরু করল, 'তারপর এর ফলটা কি হবে ভাবতে পারছেন? ওরা আমাদের খুন করবে।'

তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাথা নীচু করল সে। সে সামরিক আদালতে একটা বিচার চেয়েছিল—এখন মনে হল সে-ই ওদের সর্দার।

পিকার্ পাশ ফিরে নোংরা জানলার কাঁচে আঙুল বাজাতে লাগল। ভুলে গেল একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। নিজের মনে মনে আবৃত্তি করল, 'মার্ন, ভের্দ্যঁ...সে'সমস্ত অতীতের কথা। একে ফৌজ বলবে কেউ? যত সব জংলী, ছোটলোকদের দল।' ভাবল, কতবার না সে ব্রতৈলকে বলেছে, 'সাবধান। এর কর্মফল ভোগ করতে হতে পারে আমাদের।' অবশ্য ফিনল্যাণ্ডে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারলে লোকের মনোবল দৃঢ় হবে। কিন্তু র‍্যাডিকালরা স্বভাবতই দ্বিধাগ্রস্ত। আর সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও অনেক কমিউনিস্ট আছে। কী হবে? অফিসাররা অবশ্য জার্মানদের বিরুদ্ধে যাবে না। এর চাইতে 'আত্মসমর্পণ করছি' কথাটা বলা অনেক ভাল। খেলার ঘুঁটিগুলো এখনো নিরাপদ আছে, শুধু খেলাটা ডুবে গেছে একেবারে।'

পিকার্ জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখল। এক খবরের কাগজের হকারকে ঘিরে ধরেছে লোকে। হাওয়ায় কাগজগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে চওড়া রাস্তার ওপর।

'লা ভোয়া নূভেল্! তাজা খবর! হেলসিঙ্কি ও মস্কোর মধ্যে আপোষরফার গুজব।'

১৪

যখন টেলিগ্রামটা হাতে এল, সেদ্ধ ডিম খাচ্ছিল তেসা। 'শান্তি প্রস্তাব—স্টকহোম—ফিনিস প্রতিনিধিদল' কথাগুলো নেচে উঠল তার চোখের সামনে। ভ্রূভঙ্গী করল তেসা যেন শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করছে সে। সুস্থ বোধ করার পর দালাদিএকে ফোন করল।

বলল, 'কী দুর্ভাগ্য!'

উত্তরে দালাদিএ বলল যে সে বেতারে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে একটা। সে ফিনদের বলবে যে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাক, তাদের সাহায্যে যাবে বলে অভিযাত্রী বাহিনী প্রস্তুত হয়েই আছে।

তেসা মাথা নাড়ল। 'বড় দেরী হয়ে গেছে, বন্ধু। ওরা তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। অন্য কোন একটা পথের চিন্তা করতে হবে ওদের।'

'ছোট ছোট জাতিগুলির মর্মান্তিক পরিণতি'র কথা বলতে শুরু করল দালাদিএ। বিরক্ত হয়ে তেসা বাধা দিল: ট্রাজেডি এ কথা ঠিকই। কিন্তু শুধু ওদের

বেলাভেই নয়। ইচ্ছে হলে আমার অনুমানে আস্থা রাখতে পার যে এই মন্ত্রিসভা এক সপ্তাহও টিকবে না।'

ভোটগুলো গুনতে লাগল তেসা। সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিপক্ষেই যাবে। ন্যায় বলে কোন কিছু নেই পৃথিবীতে। ম্যানারহাইম—ঐ লোকটার ভুলের জন্যেই শাস্তিভোগ করতে হবে তাদের। ফিনদের অভিশাপ দিল তেসা। জংলী মানুষ ওরা!

ঠিক যা অনুমান করেছিল তাই হল: সামান্য লোকই ভোট দিল গভর্নমেণ্টের পক্ষে। একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল রেনো। লোকটাকে তেসা ঘৃণা করে, কেমন বামনের মত চেহারা, অত্যাশ্চর্য কিম্ভূতকিমাকার জীব, একটা বাঁদর যেন! তেসাকে তার মন্ত্রীপদ না ছাড়তে প্রস্তাব করল রেনো।

তেসা বলল, 'আমি ভেবে দেখব। বন্ধুদের সঙ্গেও পরামর্শ করে দেখি একবার।'

তৎক্ষণাৎ দালাদিএর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল তেসা। দালাদিএ বসে বসে ক্ষুধা-উদ্রেককারী মদ খাচ্ছে। সে তার ভ্রূ-জোড়ার নীচ দিয়ে তাকিয়ে দেখে বলল, 'সর্বনাশা লোক ঐ রেনো। কিন্তু আমি নিজের জায়গা ছাড়ব না ঠিক করেছি। একেবারে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখব।'

দালাদিএর কাছে কোন সুবিধা হবে না ভেবে ব্রতৈলের কাছে যাওয়াই স্থির করল তেসা। উঠতি লোক ও। ব্রতৈল যদি তাকে বিপক্ষে যেতে বলে মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেবে সে। অপেক্ষা করার আর নাগরিক শৌর্য দেখানোর কায়দাটা জানতে হবে তাকে।

ব্রতৈলের পড়ার ঘরে এক দীর্ঘ, নীলচক্ষু লোকের সঙ্গে দেখা হল তেসার। সে বলল, 'মার্সাই সম্মেলনের ঠিক আগেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।'

তেসার আবছা মনে পড়ল লোকটা কোলমারের প্রতিনিধি, ফুজেকে বক্তৃতা দিতে যে বাধা দিয়েছিল। 'নিশ্চয়ই, মনে আছে বৈকি,' বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে তেসা বলল।

বাইস চলে যাবার পর ব্রতৈল তেসাকে বলল, 'র‍্যাডিকালদের আমার কাছে আসতে দেখে অবাক হয়ে যেও না। জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলছি আমরা। বাইস গ্রঁদেলের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে। সাধারণত আমার ধারণা, কাজগুলো নেহাৎ মন্দ এগুচ্ছে না।'

ব্রতৈলের স্পষ্টবাদীতায় ধাঁধা লাগল তেসার। বলল, 'আমার মতে সমস্ত ব্যাপারটা রীতিমত ঘোরালো। ফিনরা ডুবিয়ে দিয়েছে আমাদের। আর রেনো...ও লোকটা সব কিছু করতে পারে।'

'আমি ওর প্রশংসাকারী নই কিন্তু।' ব্রতৈল বলল, 'ও তো ইংলণ্ডের হাতের পুতুল। ও ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় আমাদের। কিন্তু লোকটা আসলে প্রজাপতি। গ্রীষ্মকাল পর্যন্তও টিঁকতে পারবে না। ইতিমধ্যে ওকে আমাদের কাজে লাগাতে পারি আমরা। গামর্ল্যাকে হটিয়ে দেবে ও, তাতে সুবিধা হবে আমাদের। আমরা পিকারকে তুলে ধরব। তাছাড়া, বামনটা অনেকটা উঁচুতে উঠেছে। লোককে দেখাবার মত একটা কিছু করতে হবে ওকে। এবং প্রথম লাফেই নীচে নেমে আসবে ও।'

'আমাকে মন্ত্রীপদ দিতে চেয়েছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করতে চাই আমি।'

'কোন মতেই না! দেশের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে তোমাকে। মন্ত্রিসভায় আমাদের একজন লোক রাখতে হবে বৈকি।'

তেসাকে রাজী করানোর দরকার হল না। ভাল কথা, রেনোর সঙ্গেই কাজ করবে সে! বামপন্থীরা এই জন্যে তাকে অনেকাংশে মাফ করবে। দক্ষিণ-পন্থীদের সম্বন্ধে ভয় ছিল তার। কিন্তু ব্রতৈল তো নিজেই আশীর্বাদ করল। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, মন্ত্রিসভায় যাবে বৈকি! মন্ত্রী হওয়া বড় চমৎকার কিন্তু। তার চেয়েও সম্মানের হল যে, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করবে যে যুদ্ধের সময়ে তেসা তার দায়িত্ব ফেলে পালায়নি।

নতুন গভর্নমেণ্টের মন্ত্রীদের তালিকা যখন জোলিওর হস্তগত হল, চিৎকার জুড়ে দিল সে, 'ভাব দেখি একবার কী কাণ্ড! ত্রিশজন মন্ত্রীর মধ্যে ষোলজন হল আইনজ্ঞ। এই বুঝি যুদ্ধ-মন্ত্রীসভা!'

সংবাদদাতাদের তার এল। বিবর্ণ হয়ে উঠল জোলিও। আর্তনাদ করে উঠল, 'দুর্লক্ষণ! এট্না আবার আগুন ওগরাতে শুরু করেছে। অশুভ চিহ্ন ওটা! ওরা নালিশ জানাচ্ছে যে ফিনল্যাণ্ডে সুযোগ হারিয়েছে। কিন্তু এদিকে আমি ভয় পাচ্ছি মূররা মার্সাইএ এসে পড়বে।'

সেনা-কর্তৃপক্ষ মুদ্রাকর পোয়ারিএর কাছ থেকে মানচিত্র পেয়ে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'ফিনল্যাণ্ডের মানচিত্র আমাদের কী দরকার?'

অবশ্য মানচিত্রের দাম দিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

তিন সপ্তাহ কাটল। একদিন ভোরবেলা জোলিও শুনল নরওয়ে উপকূলে মাইন পাতা হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ পোয়ারিএকে ডাকল টেলিফোনে: "আরেকটা অর্ডার পাওয়ায় অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। মেরু দেশের ভাল্লুকদের সঙ্গে আলাপ করতে চায় রেনো। এখন নরওয়ের মানচিত্রের দরকার পড়বে ওদের, দেখে নিও। তোমার দামটা কমিও না কিন্তু।'

মতিনি জমকালো একটা সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করল—দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে তেসাকে এই প্রথম সম্বর্ধনাজ্ঞাপন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ব্রতৈল, লাভাল, ফ্লাঁস্তা, গ্রঁদেল, মিয়েজার ও জেনারেল পিকার্—সবাই এসেছে।

মহিলারা ছুটিতে বেড়াতে যাবার পক্ষে কোন্ জায়গাটা ভাল তাই নিয়ে আলোচনা করছে। মাদাম পিকার্ ব্রিয়াঁশঁর পক্ষে।

'জানি, জায়গাটা ইতালীয়ান সীমান্তের কাছে।' সে বলল, 'কিন্তু আমার স্বামী বলেন, মুসোলিনী কোন মতে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। এই ভয়াবহ যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নিতে চাই আমি। ও যায়গাটা সত্যিই বেশ নিরিবিলি আর শান্ত।'

মাদাম মিয়েজার বলল, সে বিয়ারিৎস-এ কয়েক সপ্তাহ কাটাতে চায়। সব সময়ে ভাল ভাল লোকের সাক্ষাৎ মেলে ওখানে। তাছাড়া অ্যাটলান্টিককে মনেপ্রাণে ভালবাসে সে।

মুশ্ কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করল সবাই। সে বলল, 'উনি তো চান আমি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে বিশ্রাম নিই। কিন্তু জানি না...' পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুইস হোটেল, টহলদারদের উচ্চহাসি, কিলমানের ঘাড়, গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি আর তারপর সমস্ত ঘটনা—লুসিয়ঁর বন্য আচরণ ও ক্রুদ্ধ মুখ, একে একে মুশের মনে পড়ল।

অবিশ্বাস্য রকম খাটো পরিচ্ছদ থেকে বেরিয়ে থাকা নগ্ন কাঁধ দুটোয় পাউডারের পুরু প্রলেপ দিয়ে মাদাম মতিনি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, 'মঙ্গলবার একটা ভয়ানক দিন—মাংস নেই, মিষ্টি কেক নেই, মদ নেই। ভাগ্যিস, ফরাসীরা অত খুঁতখুঁতে নয়। জেনারেল, এই আর্মাঞ্যাকটা সুপারিশ করছি আপনাকে। আমার ভাইয়ের ভাঁটিখানার মদ। খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে আপনাকে, না?

'না, না, কিছু নয়। হ্যাঁ, এই আর্মাঞ্যাকটা খাসা।'

'কোন খবর আছে?'

'ভাল রকম কিছু নয়। মানে যুদ্ধের ভাল খবর কিছু নেই।' জেনারেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'ওরা বলছে, ওরা বার্জেন অস্লো রোড প্রতিরোধ করবে।

কিন্তু জার্মানরা সমস্ত কিছু ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলছে। উত্তরাঞ্চল বাদে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অবস্থা......'

শেষ কথাটা কানে গিয়েছিল তেসার, সে তৎক্ষণাৎ সায় দিল, 'অবস্থা নিঃসন্দেহে উন্নত হয়েছে বৈকি। আমি বড় রকমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আশা করেছিলাম কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, চেম্বারের সর্বসম্মত ভোট আমাকে অবাক করে দিয়েছে। কী রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধি! আজ আমরা সারা ফ্রান্সের প্রতিনিধি। তাই নয় কি, জেনারেল?'

বার্জেন আর পাহাড়ী খালের কথা বলতে শুরু করল পিকার্। সাড়ম্বরে হাত নাড়ল তেসা। বলল, 'ও হল সামান্য খুঁটিনাটি।'

পিকার্কে দেখেই তেসা বিরক্ত হয়ঃ লোকটার মধ্যে কেমন একটা সৈনিক-সুলভ অন্ধতা আছে। জার্মানরা কোথায় গিয়েছে? একটা বন্য দারিদ্র্যপীড়িত দেশে। পাহাড়ী খাল দেখতে গিয়ে মধ্যরাত্রির সূর্যকে তারিফ করাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির ব্যাপার। সুখের বিষয় যে জার্মানরা টোপ গিলেছে। ফলে ফ্রান্সের সীমান্ত থেকে বহুদূরে সরে যেতে হয়েছে তাদের।

'বৃটিশরাই কেবল নরওয়েতে একটা চাল মারবার তালে আছে। তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। অ্যাডমিরাল দার্লঁ্যা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছে। ও বলছে, এর চেয়ে হিটলার আসা অনেক ভাল।'

অবজ্ঞার হাসি হাসল ব্রতৈল। বলল, 'বৃটিশরা, হেঃ! ১৯১৬ সালে সম্-এ দেখেছিলাম তাদের। প্রতিদিন সকালে ট্রেঞ্চে বসে বসে দাড়ি কামাত। উত্তর দিকের বন্য তুন্দ্রা অঞ্চলে ওরা কি করে একবার দেখতে চাই।'

অতিথিরা একসঙ্গে সায় দিল। 'বসে বসে ওরা ওদের প্রিয় কড মাছ খাবে।' 'কিংবা কড মাছ ওদের খাবে।' 'রেনোটা কী ভয়ই না পেয়েছিল!' 'সত্যিই ক্ষুদে ভাল্লুকটার সময় আরামে কাটছে না। আমার ধারণা, অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেণ্ট সব চেয়েও বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে।' 'হাঃ, হাঃ, আমাদের অবস্থাটা ঠিক ক্যাঙারুর মত।'

গভর্নমেণ্টকে রক্ষা করা নিজের কর্তব্য বলে মনে করল তেসা। বলল, 'ঠিক কথা, রেনো লোকটা ইংলণ্ড-ভক্ত আর উঁচকপালে। কিন্তু কাউণ্টেস এলেন দ্য পর্ৎ অত্যন্ত চতুর মহিলা। উনি পুরুষমানুষের কাছে প্রেরণা ও সহায়তার প্রতীক। আমি অবশ্য কাউণ্টেসের বন্ধু বোদুয়ার মারফৎ কাজকর্ম করি।'

কে একজন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল, 'পরস্ত্রীর প্রেমিক!'

তেসা বলে চলল, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে ব্রতৈল ও লাভাল মন্ত্রিসভায় নেই। আমরা নরওয়েতে দুঃসাহসিক অভিযানে বার হচ্ছি না এ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত থাকুন। আমিই প্রথম ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য পাঠানোর কথা বলি। দুর্বলকে সাহায্য করতে ফ্রান্স সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু নরওয়ের ভাগ্যে আমরা কিছুমাত্র চিন্তিত নই। ওটা জার্মান আর ইংরেজদের মধ্যে একটা ঝগড়ার ব্যাপার। চার্চিল গিয়ে গণ্ডগোলটা মেটাক। আমাদের দেশের কথা বলতে গেলে, আমরা যে-কোন রকম আকস্মিক আক্রমণের জন্যে তৈরী। হল্যাণ্ডের পথ দিয়ে জার্মানরা অগ্রসর হতে পারবে না কারণ ডাচরা বাঁধগুলো খুলে দেবে! ওরা পরীক্ষা করেছিল, চমৎকার উৎরেছে পরীক্ষাটা। আর বেলজিয়ান প্রতিরোধ ব্যবস্থা তো ম্যাজিনো লাইনের মতই মজবুত। অবশ্য জার্মানদের কতকগুলো ভাল ভাল বিমান ও ট্যাঙ্ক আছে, কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। জেনারেল লেরিদো বলে যে জবরদস্ত আক্রমণ করতে হলে আমাদের একটা বন্দুকের মুখোমুখি জার্মানদের ছটা করে বন্দুক খাড়া করতে হবে। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে যে ওদের কোন আশা নেই।'

'আসলে বিপদটা দেশের ভেতরেই,' মিয়েঙ্গার বলল, 'কমিউনিস্টরা আবার মাথা তুলছে। কুরস্তভের ধর্মঘটটা ছড়াতে পারে। ওদের ইস্তাহারগুলো পড়ে দেখুন। এই যে, পড়ে দেখুন এগুলো।'

'অসহ্য!'

'ডেপুটিদের গুলি করে মারাই ভাল ছিল।'

'ওদের কিন্তু বেশ খেলো করা হয়েছে। বিচারের সময়ে গ্রঁজের বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করছে প্রত্যেকে।'

'সমস্ত বিচারটাই একটা মস্ত বড় ভুল। আমি দালাদিএকে এ কথা বলেছিলাম। দেশদ্রোহিতার অপরাধে ওদের বিনা বিচারে আটক রাখা উচিত ছিল।'

তেসা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আইন দিয়ে আমাদের হাত-পা বাঁধা। কথাগুলো মনে করে দেখো: দু বা তিন বছরের কারাবাস। কার সাধ্য তা আটকায়! রেনোটা বোকা। আর মাদেল অন্ধ হিটলার-বিরোধী—আর ভয়ানক বিপজ্জনক বক্তা ও। কমিউনের প্রতিনিধি হবার তালে ঘুরছে। আমি সেরলের সহযোগিতা পাব আশা করছি। লোকটা সমাজতন্ত্রী কিন্তু খাসা লোক। ভাগ্যিস,

আইন বিভাগের মন্ত্রীপদ পেয়েছে ও। লোকটা খোলাখুলি বলে যে মস্কোর মড়ককে আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।'

এক গ্লাশ আর্মাঞ্যাক্ খেয়েও বিষণ্ণ বোধ করছে তেসা। ভাবছে দেনিসকে ওরা তো গুলিও করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার একগুঁয়ে আর সাহসী হয়ে উঠল। অতিথিরা তাদের সমর্থনসূচক কথোপকথনে চাঙ্গা করে তুলল তাকে। চিনির ডেলা তুলবার চিমটে হাতে নিয়ে গোল টেবিলের ধারে বসে রইল তেসা। ভাবল, রাষ্ট্রের হাল ধরে বসে আছে সে।

তারপর পিকার্ আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। জেনারেল গর্ সম্পর্কে নানা রকম মজার গল্প বলছে সে।

যোসেফিন মতিনি তেসার কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'লুসিয়ঁ কোথায়?'

বিব্রত বোধ করল তেসা। এই প্রথম কেউ তাকে তার ছেলের খবর জিজ্ঞাসা করছে। কোন চিন্তা না করেই সে উত্তর দিল, 'ও নিরুদ্দেশ হয়েছে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল যে উত্তরটা তেমন স্পষ্ট হয়নি, তাই নিজেকে শুধরে নিল, 'হয়ত মারাই গেছে। বেচারী লুসিয়ঁ!' তেসার গলা কেঁপে উঠল।

যোসেফিন মতিনি এত বিচলিত হল যে কেঁদে ফেলল ঝর ঝর করে। তেসাও বুঝল তার চোখে জল জমছে, তাই আঙুল দিয়ে চোখ মুছল আর পাখীর মত নাক ঝাড়ল।

মতিনি আরো কাছে এসে দাঁড়াল। প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল তেসা: এই ভাবে ভেঙে পড়া ঠিক নয়। ক্লেমসোর মত দৃঢ় হতে হবে তাকে।

সে বলল, 'হিটলার আর একটা ভুল করেছে। জল-গণ্ডারদের সঙ্গে লড়তে চলেছে ও। ইতিমধ্যে আমরা নিজেদের কাজ করে যাব। দালাদিএ ফৌজ থেকে পাঁচ লক্ষ কৃষককে রেহাই দেবে বলে স্থির করেছে। চাষবাস করতে হবে আমাদের। রুটি না খেয়ে বাঁচতে পারি না আমরা। তুকান আর ফুজে মূর্ছা গেলে আমাদের ক্ষতি নেই। পৃথিবীকে আমরা দেখিয়ে দেব যে ফরাসীদের সহ্যশক্তি কতখানি।'

মতিনি মাথা নাড়িয়ে সায় দিল। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক বটে। তারপর তেসাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল যাতে সবাই শুনতে পায়, 'পোয়াটুতে জমি কিনে কাজের কাজ করেছেন আপনি। জায়গাটা সীমান্ত থেকে অনেক

দূরে, ফ্রান্সের নাভিসূত্র বলা চলে। আমার জমিটা সাভয়তে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভয় পাচ্ছি। ইতালীয়ানরা একটা অদ্ভুত জাত, বুঝলেন! কিন্তু এখানে আপনি শান্তিতে ঘুমোতে পারেন। পোঁয়াটুতে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না আপনাকে। আমি ব্রতৈলকে সব সময়ে বলে আসছি যে আপনার মন খাঁটি রাজনীতিজ্ঞের মন।'

১৫

দালাদিএর গদি রেনো পেয়েছে, খবরটা পেয়ে ম্যিয়েজার গ্রঁদেলকে বলল, 'পয়লা মে একশো আশিটা বোমারু বিমান ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু অবস্থা বদলেছে এখন। মন্ত্রীমশাইকে বলবেন, বোমারু-গুলো আরো ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার।'

গ্রঁদেল হেসে উত্তর দিল, 'জানি, রেনো লোকটা দুঃসাহসিক। সত্যিকার যুদ্ধ পর্যন্ত বাধিয়ে বসতে পারে ও। শাস্তর আলপিনকে নারভিকএ পাঠাবার কি দরকার পড়ল? মনে হয় শিগগিরই ভাগিয়ে দেওয়া হবে ওকে। একবার হারলেই যথেষ্ট। জার্মানরা উঠে পড়ে লেগেছে। গুজব উঠেছে ও নাকি দেসেরকে অভিনন্দন জানিয়েছে। খুব ভাল লক্ষণ: দেসেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কোন সুবিধা হবে না ওর।'

দেসের, যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সর্বশক্তিমান ছিল, সম্প্রতি হাসির পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যঙ্গ-চিত্রকররা তার ছবি এঁকে বেশ দু পয়সা কামাচ্ছে। ব্রতৈল জোলিওকে নির্দেশ দিয়েছে, 'ও যে একটা আন্তর্জাতিক বণিক, কামান ব্যবসায়ী আর ধনতন্ত্রবাদী একথা প্রচার করতে থাক। অবশ্য যুদ্ধে জয় হোক তা ও চায়। তুমি যত ইচ্ছে ওর দুর্নাম রটাতে পার। তেসা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সেন্সার তাতে মাথা গলাতে আসবে না।'

মতিনিও জোলিওকে দেসেরের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করতে বলল। প্রতিবাদ জানাল ক্ষুদে সম্পাদকটি, 'রাজনৈতিক ধারার গতি পরিবর্তন করা যেতে পারে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু দেসের আমাকে অসময়ে সাহায্য করেছে। একজন পুরনো বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা কি জিনিস তা কি আপনি জানেন? আর তা ছাড়া লোকটা সাধু। অবশ্য ও মার্সাই-এর লোক নয়, কিন্তু মার্সাইকে ভালবাসে মনেপ্রাণে।

ও জেলেদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলে তা আমি শুনেছি। লোকটা খাঁটি ফরাসী। এখন আমায় লিখতে হবে ও একজন অস্ট্রেলিয়ান ইহুদি, আমেরিকানদের দালাল।'

অতীতে শীর্ষস্থানীয় লোক ছিল দেসের। টলটলায়মান অবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের ধারণা হল ও ডুবে যাচ্ছে। লোকে বলতে লাগল, 'একেবারে ডুবে গেছে ও,' যদিও তখনো সমস্ত কারখানা ও শেয়ার সম্পত্তি তার হাতে। তার কাজকর্ম কেমন চলছে একবার খুঁটিয়েও দেখল না কেউ। 'সীন' কারখানার ইঞ্জিনিয়াররা বলল, 'বার্ষিক সভা বসার আগে পর্যন্ত ও কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে চালিয়ে নেবে।' এমন কি, বাগানের পুরনো মালীটাও মনিবের ধনসম্পন্নতার ওপর সন্দেহ হওয়ায় মাইনেটা আগাম চেয়ে নিল।

ক্রমে ক্রমে মদের মধ্যে ডুবে গেল দেসের। জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখল নিজেকে, বুকের ব্যথার কথাটা চেপে রাখল জিনেত্তের কাছ থেকে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে সে ঠাট্টা করে বলে, 'এস, আমার নিজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই একবার—একজন অস্ট্রিয়ান ইহুদি বণিক যার মালী মাইনে আগাম না পেলে কাজ করে না।' যাদের সঙ্গেই কথা বলে সে, মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা; কেমন ভয় লাগে দেসেরের দিকে তাকাতে। রোগে এবং চিন্তায় কুৎসিত হয়ে আসছিল তার মুখ। তারপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত মুখটা কেমন থলথলে আর কদাকার হয়ে এল।

জিনেত্তের তীব্র ও অসহ্য করুণা হল দেসেরের ওপর। এই মনোভাব তাদের তুজনের কাছেই অপমানজনক, একাধিকবার জিনেৎ জোর করে ক্রুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করল, দেসেরকে কড়া কড়া কথা বলল যাতে সে ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু দেসের শুধু ঘাড় তুলে বুড়ো কুকুরের মত ম্লান চোখে তাকাল। জিনেৎ দেসেরের গলায় হাত রেখে নানা রকম প্রেম-সম্ভাষণ করল। মন্ত্রোচ্চারণের মত ফিসফিস করে দেসের বলল, 'জিনেৎ' যেন সে-ই একমাত্র তাকে রক্ষা করতে পারে। সে জানে, জিনেৎই তাকে জীবনের গ্রন্থিতে বেঁধে রেখেছে। মৃত্যুকে সে অত্যন্ত ভয় করে—তার যন্ত্রণাকে নয়, তার শূন্যতাকে। মৃত্যুতে ভাল মন্দ কোন কিছুই নেই তবু তার সামান্যতম চিন্তায় মানুষ আর্তনাদ করে ওঠে। অনেক সময় দেসেরের মনে হয় যে, সে জিনেত্তের

সর্বনাশ করছে। স্থির করল, জিনেতের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে সে এবং সেই প্রতিজ্ঞা টিঁকিয়ে রাখল কয়েক সপ্তাহ। তারপর হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে টেলিফোন করল জিনেৎকে, উদভ্রান্তের মত গিয়ে পৌঁছল তার কাছে। জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি?' জিনেৎ তার রুক্ষ শাদা চুলে হাত বুলিয়ে দিল, তার অশ্রুসজল বড় বড় আতঙ্কগ্রস্ত চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল গালের ওপর।

পয়লা মে কার্লতঁ বার-এ ঢুকতে গিয়ে ম্যিয়েজারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দেসেরের।

ম্যিয়েজার বলল, 'শুনলাম, তুমি নাকি অসুস্থ?'

'না, না, বেশ সুস্থ আছি আমি।'

'আসল কথা হল স্বাস্থ্য, বিশেষ করে আমাদের বয়সে। জান আজকের দিনটা কি? আজ পয়লা মে। কিন্তু কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না দিনটা নিয়ে। মনে আছে গত বছর কী দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়েই না আমরা কাটিয়েছিলাম! ভয় ছিল ধর্মঘট হবে, মিছিল বার হবে। কিন্তু এখন দিনটা সপ্তাহের অন্য যে কোন দিনের মতই। মন্দ না হলে কোন ভাল হয় না। ঠিক না?' দেসেরকে 'কমিউনিস্ট' বলে বলে ম্যিয়েজার এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে সে নিজে পর্যন্ত এই কুহকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। কিন্তু দেসের অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'সত্যি, চারদিক বেশ শান্ত। মনে হচ্ছে আমি নিজেও বেশ থিতিয়ে গেছি।' রাস্তায় একটি মেয়ে ফুল বিক্রী করতে করতে তার কাছে থামল। বলল, 'লিলি অফ দি ভ্যালি কিনুন। আনা দশেক দাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে আপনার।'

ইঁদুরের মত মেয়েটির দাঁত, শিকারীর মত চোখের দৃষ্টি। দেসের এক গোছা আধ-ফোটা ফুল কিনল। ফুলগুলি কি তার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে? না, তা নয়! ম্যিয়েজারের হাসি, ফুলউলী মেয়ের চোখ আর জিনেৎ ভেসে উঠল তার মনে। এর থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই। তারা সবাই মরে যাবে। কে? জিনেৎ, সে নিজে, আর প্রত্যেকে...কাছাকাছি একটা বার-এ গিয়ে অধৈর্য হয়ে কোনিয়াক খেল সে। রেডিওটা চিৎকার করে চলেছে:

'এই নদীটির ধারে কোথাও সুখ হয়ত আছে
কিন্তু সে সুখ যায় ভেসে যায় চঞ্চল তার স্রোতে।'

এক সপ্তাহ পরে জিনেতের সঙ্গে দেখা হল দেসেরের। জিনেৎ তাকে না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল, যেতে যেতে হাসছিল জিনেৎ। দেসের বুঝল তাকে

ছাড়াই জিনেৎ কেমন জীবন্ত হয়ে উঠছে। এখনি এর একটা মীমাংসা হওয়া উচিত!

বহুবার সে তাকে তার বাসা পরিবর্তন করতে বলেছে কিন্তু সে রাজী হয়নি। জিনেৎ এখনো রু বোনাপার্তের ছোট্ট পুরনো হোটেলটায় বাস করছে। দেসের সেই মোটামত পাউডার-মাখা বাড়ীউলীকে জানে আর জানে জিনেৎ কেমন করে অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে—প্রতি মুহূর্তে হাঁপায় আর সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। যাতায়াতের পথে পায়খানা, শস্তা সুগন্ধী আর রান্নার গন্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তাকের ওপর দাফ্‌নিস-এর একটা নোংরা ব্রোঞ্জ মূর্তি ক্লো-কে চুমু দিচ্ছে। কারা থাকত আগে ওখানে? প্রাচীন গৌরবের স্বপ্নে বিভোর এক শিল্পী? ফোলি বের্জেরের এক সুন্দরীর প্রেমে পাগল এক হিসেব-রক্ষক? চুলে মলম দেওয়া আর জমকালো টাই-পরা কোন এক কুৎসিত লোক? কিংবা অনুমতিপত্রহীন কোন এক জার্মান আশ্রয়প্রার্থী? ঐ গুমোট আর বিশ্রী ঘরে নিঃসঙ্গতা এসে চেপে বসে মনের ওপর।

দেসের শান্তভাবে জিনেৎকে বলল, 'আমাদের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নয়।' এই সমস্ত কথা ভেবে চিন্তে এসেছিল দেসের। ভয় ছিল, জিনেৎ হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, 'কেন?' কিংবা তার দিকে এমনভাবে তাকাবে যে, সে তা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু জিনেৎ দূরে সরে বলল, 'হ্যাঁ।' মনে মনে ভাবল, 'আর কিছু অবশিষ্ট রইল না, এমন কি প্রতারণা পর্যন্ত না।' ভালই হল! দেসের নিজের স্থিরতায় নিজেই অবাক হয়ে গেল: এই তো মৃত্যু, কিন্তু যতটা ভয়াবহ মনে করছিল ততটা নয়।

মে মাসের উষ্ণ রাত্রি। অন্ধকার শহরের ওপর ঝিকমিক করছে তারাগুলো। বাদাম গাছের পাতাগুলো মর্মরিত হয়ে উঠছে থেকে থেকে। প্রতি পনের মিনিট অন্তর গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে।

'প্রেমিকদের উপযুক্ত এই রাত,' দেসের হাসল। জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'আজ আর প্রেমিক নেই। আছে শুধু গ্রহ, গাছপালা, কবিতা। দেসের, তুমি আর আমি দুজনেই বুড়িয়ে গেছি।' জিনেৎ বলল।

'তুমি আজও জীবনে পল্লবিত হয়ে উঠতে পারনি। পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি। তোমাকে বাধা দেব না আর। তোমার পথের কাঁটা হব না—আর বাঁচতে চাই না আমি...'

তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষের কথাগুলি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। নিজের ওপর

চটে উঠল সে : এবার জিনেৎ করুণা করবে তাকে। ভাববে, অনুনয়-বিনয় করছে সে। দেসের ভাল করেই জানে, পয়সা দিয়ে ভালবাসা কেনা যায় না এবং চোখের জলে গলবার পাত্রীও জিনেৎ নয়। তার উচ্ছ্বাসকে লক্ষ্য না করে জিনেৎ বলল, 'আমিও বাঁচতে চাই না। এক সময়ে বাঁচতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সফল হতে পারিনি। তোমার ব্যাপারটা কি ?'

'মৃত্যুকে আমি ভয় পাই। অর্থাৎ মৃত্যু কি জিনিস আমি জানি না।'

দেসের চলে যাচ্ছে এমন সময় বিমান-বিধ্বংসী কামান গর্জে উঠল। এ যেন এক পাল শিকারী কুকুর বন্ধনমুক্ত হয়ে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে প্রাণপণে। কোমল মখমলের মত আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সার্চলাইটের আলোয়। সাইরেনগুলোর উন্মত্ত আর্তনাদে কেমন একটা জীবন্ত ও বন্য আকুতি।

'এ আবার কি ?' জিনেৎ জিজ্ঞাসা করল।

'খুব সম্ভবত শুরু হল। এটা বসন্তকাল। তোমাকে আগেই বলেছি এ হল প্রেমিকদের উপযুক্ত রাত। ওরা ভেবেছিল জার্মানরা বসে বসে অপেক্ষা করবে। ম্যিয়েজার খুশি হয়েই আমাকে বলল, দেখেছ, কেমন শান্ত! যত সব অপদার্থ! না, তারও অধম। ওরা বিশ্বাসঘাতক। যাই হোক, তাতেই বা কি ?......... জিনেৎ, তুমি কি বলতে চাও তুমি মৃত্যুকে একেবারেই ভয় পাও না ?'

'না, একেবারেই না।' নীরস অথচ দৃঢ় গলায় উত্তর দিল জিনেৎ।

কামানগুলো অক্লান্তভাবে গর্জে চলেছে।

এক সময় বিমান-আক্রমণ ধ্বনি শেষ হল। জানলার ধারে একটা আর্ম-চেয়ারে এসে বসেছে দেসের ; জিনেৎকে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে সকাল না হওয়া পর্যন্ত সে এখানে থাকবে কিনা। সহজ ছোট ছোট শব্দে পাখীরা ডাকতে শুরু করেছে, তেরছাভাবে এসে পড়েছে সূর্যের আলো, ছায়াগুলো কেমন লম্বা। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। সবজি-বোঝাই গাড়ীগুলো বাজার-মুখো চলেছে। এক দুধ-উলী চলে গেল সামনে দিয়ে। দেসেরের মনে হল যেন কোথাও কিছু হয়নি,—রাত্রের বিমান-আক্রমণের সংকেতধ্বনি, পারস্পরিক বোঝাপড়া, যেন সমস্ত কিছুই মিথ্যে। দেসের জিনেতের দিকে তাকাল। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখে কেমন একটা শান্ত আর নির্লিপ্ত ভাব। ভাবল, ঘুমোলে জিনেৎকে অন্য যে কোন মেয়ের মতই দেখায়। মনে হল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে দেসেরের চিন্তাকে ধরতে পেরেছে। জেগে উঠেই একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখল। দেসের মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

'সুপ্রভাত, দেসের।' জিনেৎ আনন্দিত হয়ে বলল।

হয়ত সেও সব কিছু ভুলে গিয়েছে। স্কুলযাত্রী ছেলেমেয়েদের হাসির শব্দ আসছে রাস্তা থেকে।

'যদি বেহেমথ তম্বি করে তাহলে নির্ঘাত গণ্ডগোল বেধে যাবে একটা।' একজন বলল। 'চৌবাচ্ছার সমস্যা নিয়ে আমি বড় মুশ্‌কিলে পড়েছি।' আরেকজন বলল, 'একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমরা—মৃত্যুর চুম্বন।'

তারপর রেডিওতে সংবাদ-ঘোষকের নাকী সুর বেরিয়ে এল, 'তৃতীয় ঘা পড়লেই ঠিক সাতটা বেজে এক মিনিট হবে। এবার আমরা সকালের খবর বলব। গত রাত্রে জার্মান সৈন্যবাহিনী হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামে প্রবেশ করেছে.........'

জিনেৎ চিৎকার করে জানলায় ছুটে গেল। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবর শুনছিল: 'ডাচ্‌ অঞ্চলে প্যারাস্যুট বাহিনী নেমেছে ......' স্ত্রীলোকটির হাতের ঝুড়িটা পড়ে গিয়ে ম্লান গোলাপী স্ট্রবেরীগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে।

জিনেতের দিকে তাকাল দেসের। বলল, 'আগেই বলেছি, এ তো সবেমাত্র শুরু।'

রাস্তায় খবরের কাগজের কিয়স্কে জনতা এসে ভীড় করেছে—শ্রমিক, দোকানদার, স্ত্রীলোক—সবাই আলোচনা করছে খবরটা নিয়ে।

'ঠিক সেই ১৯১৪ সালের অবস্থা...ওরা এখানেও ধাওয়া করতে পারে ...'

'ওখানেই ওরা আটক পড়বে। ধরো, এমন কি হল্যাণ্ড পর্যন্ত ওরা নিয়ে নিল। কিন্তু তারপর?'

'ওতে তো আমাদেরই সুবিধা।'

'খবরের কাগজে তো খুব লম্বা চওড়া লিখেছিল, ডাচরা নাকি জলে ডুবিয়ে দেবে সব কিছু ...'

'ওরা খবরের কাগজে যা লেখে সব ফাঁকা! লেখবার জন্যে পয়সা পায় ওরা। কিন্তু জার্মানরা প্যারাস্যুটে করে একেবারে সাঁজ-দ্য-মার-এ নামতে পারে ...'

দেসের শব্দ করে জানলাটা বন্ধ করে দিল। 'এমনি কত লোককেই না প্রতারিত করেছে ওরা!' সে আর্ম-চেয়ারে এসে বসল। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে তার, হাত আর কাঁধ দুটো কেমন ব্যথা-ব্যথা করছে। 'জিনেৎ, একবার তাকিয়ে দেখ আমার দিকে। তোমার চোখ দেখে ভয় পাই আমি ... নজর দাও! ভাল করে নজর দাও! আমিও প্রতারণা করছি। হয়ত অন্যের চেয়েও

বেশী! আমি রক্ষা করতে চেয়েছিলাম...কাকে? তেসাকে? এই তার শাস্তি। জানি না আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে। হিটলার আসবে। তারপর লোপ পাবে ফ্রান্সের অস্তিত্ব। পিয়েরই ঠিক। সে বলেছিল—লুকিয়ে দাও সব জঞ্জাল। আমি মরে গেছি। ওরা কিন্তু আমার বদলে পিয়েরকেই মারল। জিনেৎ, তেসাকে না মারলেই বাঁচি! আচ্ছা, বিদায়! দেখেছ, আমাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কি জিনিস এসে মিলেছে! রঙ্গমঞ্চের মতই এর তাৎপর্য কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ...আর ভয়াবহ।'

থেমে থেমে কেমন নির্লিপ্তভাবে কথা বলল দেসের। তারপর টুপিটা মাথায় দিয়ে দরজার কাছে ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ চুমু খেল জিনেতের হাতে। চুম্বন, কুব্জ পিঠ আর হাতের কাঁপুনির মধ্যে প্রবাহিত হল তার আবেগময় চিন্তাশক্তি, অসুস্থতা ও হতাশা।

'জিনেৎ, তোমার জন্যে আমি একটা পাশপোর্ট আর ভিসা সংগ্রহ করব। এখান থেকে সোজা বেরিয়ে পড়! আমেরিকা চলে যাও।'

জিনেৎ মাথা নাড়ল। না, ও বড় ক্লান্ত। কেমন একটা করুণার বিশাল ঢেউ এসে আঘাত করল ওকে যা সত্যিই অসহ্য। ওলন্দাজ, রাস্তার কলরব-মুখর মানুষ আর দেসের—প্রত্যেকের জন্যে ও দুঃখিত। বিশেষ করে দেসেরের জন্যে ও অনেক বেশী দুঃখিত। লোকের ধারণা, দেসের সব কিছু করতে পারে কিন্তু ও জানে দেসের ওর চেয়েও বেশী হতভাগ্য। ও একটা গোলাম, একটা পুতুল, একটা ছায়া মাত্র। এবং এই প্রথমবার ও দেসেরকে তুই বলে সম্বোধন করল।

'ভাবনা চিন্তা করে বুড়িয়ে যাসনি। এ সমস্ত কিছুর একদিন অবসান ঘটবে। লক্ষীটি দেসের, বিদায়!'

১৬

মেজর লেরয়ের মুখ কালো হয়ে উঠেছে ধমক খেয়ে। স্বগতোক্তিতে তার চোয়াল কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'আমি বুঝে উঠতে পারি না এর সঙ্গে সাঁকোর কি সম্পর্ক?' জেনারেল লেরিদো বলল।

'জেনারেল মোকে তো তাই বলেন...আমি টেলিফোনে কথা বলেছিলাম।'

'এই ধরনের কথাবার্তার জন্যে সামরিক আদালতে জেনারেল মোকের বিচার হওয়া উচিত। দুশমন তো সাঁকো থেকে ষাট মাইল দূরে। আমি জানি, আমাদের সৈন্যবাহিনী কাতো-ভেরভ্যাঁর দিক দিয়ে বেলজিয়মে ঢুকেছে বলে এ একটা ওদের আক্রমণ করার ছল। ধরুন যদি বিপজ্জনক একটা কিছু ঘটেই—মানে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়, তাহলে মার্শ-এ পৌঁছুতে জার্মানদের অন্তত চার সপ্তাহ লাগবে, যদি খুব দ্রুত গতিতেও অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদের পাল্টা-আক্রমণ সম্পর্কে কি মনে করছেন? সপ্তম সৈন্যবাহিনী তো অ্যান্টওয়ার্প পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এটা আত্মরক্ষা না আক্রমণ—কী মনে হয় আপনার?, যখন সমস্ত সামরিক ক্রিয়াকলাপ আক্রমণের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে তখন একমাত্র নির্বোধরাই সাঁকো উড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে। বুঝতে পারলেন আমার কথা? এবার নিজের মনে মনে বিড়বিড় করা বন্ধ করুন।'

'কিন্তু আমি...'

'আপনি? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গত যুদ্ধে আপনি সমস্ত সময় পারীতে বসে বসে কাটিয়েছেন। প্রথম কথা হল স্থৈর্য। যুদ্ধ এখন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। হবারই কথা। কিন্তু আগের মতই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এই হল যুদ্ধ জেতার রহস্য। যাক, এখন আজকের কাগজে কি কি খবর আছে বলুন দিকি?'

লেরয় নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল। বলল, 'ল ফিগারোর সামরিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন নামুর-অ্যান্টওয়ার্প রণাঙ্গনেই দুশমনকে বাধা দেওয়া চলতে পারে।'...আবার কাঁপতে শুরু করেছে তার চোয়াল। 'জেনারেল, জার্মানরা কিন্তু চল্লিশ মাইল দূরে আছে, ষাট মাইল দূরে নয়। ওরা মার্শ অধিকার করে বসেছে।'

'আপনার কথা শুনে যে কোন লোকের ধারণা হবে যে, আপনি একজন অফিসার নন, সামান্য একজন সহকারী মাত্র। প্রথমত, আপনার রিপোর্ট সমর্থিত নয়। দ্বিতীয়ত, দুশমনরা যদি মার্শ পর্যন্ত এসেও থাকে, তাতেই বা কি এল গেল? আপনি যান। কর্নেলকে একবার পাঠিয়ে দিন।'

লেরিদো একটা বড় মানচিত্র খুলে বসেছে। মোরো তার স্বাভাবিক উদাসীন ভঙ্গীতে এসে ঢুকল। বলল, 'কী চমৎকার দিন! এই মাত্র ট্যাঙ্ক পরিদর্শন করে ফিরছি। সত্যিই, অদ্ভুত সুন্দর এই জায়গাটা: জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়!'

লেরিদো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। সে উত্তর দিল, 'সমস্ত অঞ্চলটা খুব দৃঢ়ভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ভয় পাওয়া বোকামি। এইখানে দেখুন— নীল পেন্সিল দিয়ে ফ্রন্টকে চিহ্নিত করেছি। আপনার খবরের সঙ্গে কি মিলছে?' বেঁটে লেরিদোর পাশে কর্নেলকে দেখাচ্ছে বিরাট দৈত্যের মত। জেনারেলের প্রতি বিনয় প্রকাশ করল সে। বলল, 'ওটা কিন্তু ফ্রন্ট নয়। আপনি মার্শ লিব্রাম-এ দাগ কাটছেন। কিন্তু সে ছিল সকালে, এখন হল বিকেল চারটে।

'আপনি বলতে চান ওরা অগ্রসর হয়ে আসছে?'

'বেমালুম এগিয়ে আসছে ওরা।'

মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে চোখ বন্ধ করল লেরিদো। তার গাল দুটো বেশ রক্তাভ আর মাংসল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার স্থৈর্য ফিরিয়ে এনে বলল, 'আরও সাংঘাতিক হবে ওদের অবস্থা। চক্রটা অবশ্য বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু দু দিকেই সৈন্য আছে আমাদের। এখন ওদের দুর্বল জায়গাটা খুঁজে বার করতে হবে। জেনারেল পিকারের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। ভালই হল, আপনি আমার সঙ্গে আছেন। এদিকে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন আমাদের মেজর। মোকেরও সেই অবস্থা। অবশ্য অবস্থাটা ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়। কর্নেল, আপনি কি মনে করেন?'

'জেনারেল পিকার্ রিজার্ভ-ফৌজ দিতে চাইবেন কি না সন্দেহ। যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আপনার অজানা নয়।'

'হ্যাঁ, অবস্থাটা কিন্তু এখন বদলে গেছে। ওরা এগিয়ে আসছে। আমাদের সক্রিয় না হয়ে উপায় নেই।'

'আমার মনে হয় আমাদের কিছু করবার নেই। ওরা কমসে কম সাতশো ট্যাঙ্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদিকে আমাদের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল। সাতচল্লিশ মিলিমিটার কামানের উপযুক্ত গোলা আমাদের নেই।'

'ও সব খুঁটিনাটির ব্যাপার। আমাদের সৈন্যরা ফিল্ড্ কামান ব্যবহার করলেই পারবে। আপনি দেখছি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। ১৯১৪ সালের আগস্টের কথা মনে করুন। তখন এর চেয়েও শোচনীয় অবস্থা। শার্লরোয়া থেকে মেওতে পালানোর কথা আমার মনে থাকবে চিরদিন। গোলন্দাজরা কামান ছেড়ে ঘোড়ার ওপর উঠে বসল। কিন্তু সপ্তাহ দুই পরেই জার্মানদের আমরা আইনে পর্যন্ত হটিয়ে দিয়ে এলাম। ফন ক্লুক তার দক্ষিণদিকটা শক্তিশালী করতে পারেনি বলে ক্ষতি স্বীকার করল। এবার ওরা কিন্তু অত্যন্ত অল্প

সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ স্রেফ পাগলামি! যাতায়াতের পথে যে কোন সময় হামলা করতে পারি আমরা।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সমরবিন্যাস বিধি, সামরিক ভাগ্য ও ফরাসী পদাতিক বাহিনীর গুণাগুণ সম্পর্কে বলে চলল। কর্নেল তাকিয়ে রইল জানলার দিকে—ঢালু পাহাড়গুলো কেমন ছককাটা মাঠ বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। তার মুখে একটা বিমূঢ় হাসি। পরে সে বিমান-বিধ্বংসী কামানের ঘাঁটি পরিদর্শনে বেরুল। একা পড়ে রইল লেরিদো। রুমাল দিয়ে ভুরু মুছে সে ভাববার চেষ্টা করল। মোরো লোকটা কেমন স্থিরবুদ্ধি! সে যদি ভয় পায় তাহলে বুঝতে হবে লক্ষণ সুবিধার নয়। স্বীকার না করে উপায় নেই যে শত্রু বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসছে। হয় জার্মানরা মাথা-খারাপ নয় দানবের মত শক্তিশালী। পরিকল্পনা মাফিক সামরিক ক্রিয়াকলাপের বদলে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কার সাধ্যি এ সব নিয়ন্ত্রণ করে? ম্যাজিনো লাইনের অবস্থা এর চেয়ে অনেক শান্ত। কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। এরই নাম আধুনিক যুদ্ধ? সমস্তটা একটা গুণ্ডামী ছাড়া কিছু নয়।

এপ্রিল মাসে অনেক অদল-বদল হল। সে সময় সেড্যান অঞ্চল একেবারে পেছনে—শান্তিপূর্ণ এলাকার মধ্যে। সৈন্যরাও বেশ খোশ-মেজাজে—মনের আনন্দে নিষিদ্ধ বেলজিয়ান তামাকের ধোঁয়া টানছে। কিন্তু লেরিদো একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে উঠল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, জার্মানরা বেলজিয়মের মধ্যে ঢুকবে না। সে বলল, 'উইলহেল্‌ম্‌-এর ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে যাবে কেন ওরা?' সে খুব মনোযোগ দিয়ে নরওয়ের ব্যাপারগুলো অনুধাবন করতে চেষ্টা করল আর গাল দিল বৃটিশদের: ওরা যোদ্ধা নয়, খাঁটি বেনিয়া! সন্ধ্যাবেলা সে হয় কর্নেলের সঙ্গে বসে বসে দাবাবড়ে খেলে, নয় সে দীর্ঘ চিঠি লিখতে বসে সোফিকে:

গায়িকা লক্ষ্মীটি,

গত তিনদিন হল তোমার চিঠিটা পেয়েছি। একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছি ভাবনা চিন্তায়। সাঁজে বলছিল, পারীতে নাকি ভয়ানক পেটের ব্যারাম হচ্ছে। কাঁচা ফল আর সালাড কিন্তু কক্ষনো খেও না, লক্ষ্মীটি। আমি খুব সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ আছি যদিও গত কয়েক দিন ভয়ংকর পরিশ্রম গেছে। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছ যে, শত্রুপক্ষ বড় রকমের হামলা শুরু করেছে। ওরা কিন্তু বেশী দিন যুঝতে পারবে না। গতকাল মেজর দ্য গ্রাভ্ দেখা করতে

এসেছিল, জেনারেল পিকারের সহকারী। ছোকরার সংগীতের ওপর দখল আছে। ও আমাদের গ্রেগ বাজিয়ে শোনাল। অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম আমার সোফির চেয়ে অনেক নীচু স্তরের গাইয়ে ও। লক্ষ্মীটি, তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে! আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখছি যেদিন তোমার ছোট ছোট হাত দুটো গাংচিলের মত পিয়ানোর ওপর ডানা ঝাপটিয়ে উঠবে। স্তঁধাল ঠিক কথাই বলেছিলেন যে, সত্যিকার ভালবাসা...

বিস্ফোরণের শব্দে লাফিয়ে উঠল লেরিদো। খানিকটা কালি পড়ে গেল কাগজের ওপর। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল রাগে। জানানি না দিয়েই মোরো এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

বলল, 'আমাদের একেবারে নীচে চলে যাওয়া দরকার।'

তলঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। তাকের ধূলি-ধূসর বোতলগুলো ঝকমক করছে রহস্যজনকভাবে। মদের গন্ধ। অফিসাররা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। মোরো একটা মদের পিপের ওপর বসে হেসে উঠল। চিঠিটা শেষ না করতে পারায় জেনারেলের মনটা কেমন খিঁচড়ে গেছে, তাকে একটা টুল এনে দিল ওরা।

'ওরা এইখানে লক্ষ্য ঠিক করেছে।' আধো আধো গলায় বলল লেরয়।

মোরো মাথা নাড়ল। 'ওদের গুপ্তচরবৃত্তি ভয়ানক জোরালো। আমরা কোন এক জায়গায় বাসা বাঁধতে না বাঁধতেই ওরা গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে অভিনন্দন জানাতে কার্পণ্য করে না। সকালে আমাদের অন্য কোথাও সরে যেতে হবে। কিন্তু নতুন জায়গায় কিছুতেই ঘুম হয় না আমার।'

'কোন উপায় নেই।' জেনারেল উত্তর দিল, 'এটা একটা যুদ্ধ, ছল করা সৈন্য-সঞ্চালন নয়। কিন্তু আমি বলি মানুষ বন্য হয়ে গেছে। গত যুদ্ধে সেনা-কর্তৃপক্ষের গায়ে হাত দিত না কেউ। পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকা উচিত একটা। কিন্তু এখন ওরা আমাদের সাধারণ ফৌজ পেয়েছে। সমস্ত শৌর্য হারিয়ে ফেলেছি আমরা। এখন ওরা সব কিছু করতে পারে। কর্নেল, পম্‌পের কথা মনে আছে আপনার? কর্নেই-এর এ একটা মহৎ সৃষ্টি—বিশেষ করে সেই দৃশ্যটা যেখানে কর্নেলিয়া পম্‌পের জন্যে অনুতাপ করতে করতে তার চক্রান্তের কথা জানতে পারল। সে সীজারকে বলছে, 'তুমি আমার শত্রু। আমার দেশের ওপর তুমি কালছায়া ফেলেছ। এখন দাসরা তোমার পতন

ঘটানোর জন্যে চক্রান্ত করেছে। কিন্তু আমি বলবো [illegible]
তো চরিত্র! কী মহৎ লাইনগুলো!'

বিস্ফোরণের প্রতি কোন দৃষ্টি না দিয়ে সে কর্নেলিয়ার বক্তৃতার বর্ণনা দিয়ে চলল। তারপর ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেল। হাই তুলতে লাগল। মেজরের একটা সিগারেট ধরানো দরকার! ঠোঁটের কাছে নিয়ে যেতে যেতে হাতটা কেঁপে উঠল। কিন্তু সাঁজে শিস দিয়ে চলেছে: তুত ভা বিয়ঁ, মাদাম লা মারকিস।

'থামুন!' মেজর চিৎকার করল।

'আমি দুঃখিত। এই পরিবেশ—বোতল, পিপে আর কবিতাই এর জন্যে দায়ী। মনে হচ্ছিল, আমি যেন মঁমার্ৎ-এর কাবেরেতে বসে আছি।'

বোমাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর লেরিদো তার অসমাপ্ত চিঠিটা শেষ করতে চাইল। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হল আবার। মোরো এসে ঘরে ঢুকল।

'ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই থামেনি। জার্মান ট্যাঙ্ক পালিজেল-এ এসে পৌঁচেছে।' সে বলল।

একবার মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে লেরিদো পায়চারি করতে শুরু করল। অত্যন্ত চিন্তিত সে; কিন্তু সে যে ভুল করেছে একথা জানতে দিতে চায় না মোরোকে।

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি, এ নিছক পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। ওদের চক্রটা বাড়াবার চেষ্টা পর্যন্ত ওরা করছে না।' কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে রইল। তারপর আবার বলল, 'যাই হোক, আমার মনে হয় মঁতেরম্ আর নুজোঁর মাঝামাঝি সমস্ত সাঁকো উড়িয়ে দেওয়া উচিত। মোকের সঙ্গে যোগাযোগটা ঠিক আছে তো?'

'সকালে ঠিকই ছিল কিন্তু মনে হচ্ছে নুজোঁ থেকে সরে গেছে ওরা।'

'তাহলে ক্যাপ্টেন সাঁজেকে পাঠিয়ে দিন। আর হাতের কাছে 'স্যাপারদের' যদি না পাওয়া যায় তাহলে বোমা ফেলে উড়িয়ে দিন সাঁকোগুলো।'

অবশেষে তার লেখা শেষ হল:

'পরিস্থিতিটা অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু আশা করছি তোমার সঙ্গে আগামী মে মাসে দেখা হবে। এত পেট্রল আর মানুষ খুইয়ে থামতে বাধ্য হবে ওরা। নিজের ওপর যত্ন নিতে ভুলো না কিন্তু।'

সাঁজে কফির কাপে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে গিলে ফেলল, তারপর বিদায় জানাল লেরিদোকে।

'ভ্রমণটা কিন্তু সুখের হবে না, কি বলেন ?' সাঁজে বলল।

এক ঘণ্টা পরে মেজরের কাছে খবর এল যে সাঁজে আর তার মোটরচালক এখান থেকে বেরিয়েই গুলি খেয়ে মারা গেছে। চাষীরা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল : 'ঐ জার্মানদেরই কাণ্ড !'

লেরিদো চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমাদের মাথা! আমি নিজে গিয়েই দেখছি ব্যাপারটা।'

সাঁজেকে কে খুন করেছে—ব্যাপারটা রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। গাড়ীর মধ্যে মৃতদেহ দেখে সে অভিবাদন জানাল। কেমন শান্ত দেখাচ্ছে লেরিদোকে।

'আপনি কি যেতে বলেন আমাকে ?' কর্নেল মোরো জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

লেরিদো কাকে পাঠায় তা দেখবার জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে উঠে লেরিদো বলল, 'কারও যাওয়ার দরকার নেই। হাজার হোক, মোকে তো আর ছেলেমানুষ নয়। আকাশ থেকে বোমা ফেলে ও নিজে থেকেই সাঁকোগুলো উড়িয়ে দেবে। আপনি ভেতরে আসুন, কর্নেল।'

আমরা কি ফিরে যাচ্ছি ?'

'না! রেতেল-এ যাচ্ছি আমরা। জীবন বিপন্ন করবার অধিকার আমাদের নেই। এ তো অ-আ-ক-খর মত সোজা কথা।' মৃত ক্যাপ্টেনের হাঁ-করা মুখ মনে পড়তেই সে ঠোঁট চাটল। 'আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমাদের পেছনদিকের অবস্থাও খুব ভাল নয়।'

আস্তে আস্তে গাড়ীটা এগিয়ে চলল; রাস্তাগুলো ট্যাঙ্ক, লরি আর ঘোড়ায় ভরতি—ওরা সব এগিয়ে আসছে। লেরিদো খানিকটা শান্ত বোধ করল। বলল, 'যাক নতুন সৈন্য না বাড়ালে যে অগ্রগতি ঠেকানো যাবে না তা বুঝতে পেরেছে।'

শার্লভিলের কাছাকাছি আসতেই কয়েকজন সৈনিক চিৎকার করে গাড়ী থামাল। জেনারেলকে দেখতে পেয়ে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না তাদের।

'কী হয়েছে ?' লেরিদো জিজ্ঞাসা করল।

পেছন থেকে কে একজন বলল, 'জার্মানরা !'

তারপর একসঙ্গে তারা রব তুলল : 'প্যারাস্যুটে করে নেমেছে...........স্টেশন মাস্টারকে খুন করেছে ওরা !......প্যারাস্যুট !......গুলি করেছে দুজন অফিসারকে......'

লেরিদো সামনের দিকে ঝুঁকে মুখিয়ে উঠল, 'চুপ! তোমরা এদিকে কোথায় চললে?'

সৈনিকরা নিরুত্তর রইল।

মোরো হেসে বলল, 'সহজ কথা—সব ছেড়ে ছুড়ে পালাচ্ছে ওরা!'

কথা শুনে পেছন থেকে কার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হে হে, পালিয়ে যাচ্ছ নাকি, জেনারেল?'

লেরিদো সংযম হারাল না। বলল, 'চুপ!' যে লোকটি তাকে অপমান করেছে তার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার: আহত সৈনিক সে। তার চারদিকে সমস্ত মাটি রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। লেরিদো তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিল। মোটরচালককে বলল, 'মিয়েজার, এ্যাম্বুলেন্স-স্টেশনে নিয়ে চল লোকটাকে।'

আহত লোকটিকে ওরা মোটরচালকের পাশের সিটে তুলে দিল। লোকটি কোন কথা বলল না, বন্ধ হয়ে এল তার চোখ দুটো।

হতাশ হয়ে মিয়েজার হর্ন বাজিয়ে চলেছে। রাস্তায় দলে দলে ভীড় করেছে আশ্রয়প্রার্থীরা। অনেকে আবার তাদের গরুবাছুর পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে চলেছে। এ সবের মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছে গাড়ীটাকে। দুটো সার বেঁধে চাষীদের গরুর গাড়ীগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করতে করতে চলেছে।

লেরিদোর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল: 'এইভাবে আমরা কখনো পেরে উঠব না! স্রেফ আতঙ্ক! তা ছাড়া আর কিছু নয়!'

মিয়েজার গাড়ী থামিয়ে শুনল। জেনারেল জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখল। মাথার উপর বোমারু উড়ছে। আশ্রয়প্রার্থীরা আর সৈনিকরা মাঠজঙ্গলের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আর একটুও এগোনো সম্ভব নয়। গাড়ী আর গরুবাছুরে সমস্ত পথটা আটকে গেছে। জেনারেলের গাড়ীটাকে একপাশে সরিয়ে রাখা হল। কর্নেল একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, মিয়েজারও তার পথ অনুসরণ করল। লেরিদোর পক্ষে ব্যাপারটা কিন্তু খুব লজ্জাকর। সে দাঁড়িয়ে রইল—বেঁটে কিন্তু সৌম্যদর্শন, আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সে। মাথার ওপর নটা উড়োজাহাজ উড়ছে।

লেরিদো বলল, 'বেশ দল বেঁধে উড়ছে কিন্তু ওরা।' কাছাকাছি একটা ছোট জঙ্গলে একটা বোমা পড়েছে। যখন তারা গাড়ীতে ফিরে এল, স্ট্রেচারের ওপর ছ-সাত বছরের একটা মেয়ে নজরে পড়ল জেনারেলের; বোমার

স্‌প্লিণ্টার লেগে উড়ে গেছে তার পা দুটো। লেরিদো নাক ঝেড়ে মৃদুস্বরে কর্নেলকে বলল, 'দেখেছ, কী ভয়ানক!'

তারপর আহত সৈনিকটির দিকে দেখল। বলল, 'বীর পুরুষটির কি খবর?'

সৈনিকটি কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে মিয়েজার বলল, 'অনুমতি দেন তো লোকটাকে বাইরে ফেলে দিই! বারবার ঢলে পড়ছে আমার দিকে। অসুবিধা হচ্ছে।'

'তুমি একটি পাগল! আহত লোককে ফেলবে কেন?'

'মারা গেছে ও। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

সৈনিকটির শরীর দোল খেতে লাগল, পেছন থেকে মনে হল সে ঢুলছে। রেলওয়ে স্টেশনের ধারে তারা থামল—রেডিয়েটারে জল নেবে মিয়েজার। প্ল্যাটফর্মটা গোলাবারুদে বোঝাই। লেরিদো গাড়ী থেকে নেমে সেগুলো দেখতে গেল। বলল, '৪৭নম্বর মিলিমিটার কামানের গোলা! আপনি বলছিলেন এ জিনিস নাকি একটাও নেই। এ সব এখানে পড়ে কেন? এমনি অব্যবস্থার কথা কস্মিনকালেও শোনেনি কেউ।'

সমস্ত স্টেশনটা ঘুরে একটা জনপ্রাণীরও সাক্ষাৎ মিলল না। টেলিগ্রাফ আপিসের মেঝের ওপর বসে বসে খোলা পায়ে একটা প্রাইভেট কি যেন চিবোচ্ছে। জেনারেলকে দেখে ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি বুট জোড়া পায়ে দিতে লাগল।

লেরিদো জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার রেজিমেণ্টের নম্বর কত?'

'১৭৩ নম্বর। পায়ে ফোস্কা হয়ে অকেজো হয়ে গেছি।'

'তোমার বন্দুক কোথায়?'

প্রাইভেটটি উত্তর দিল না।

'স্টেশনমাস্টার কোথায়?'

'ওরা সবাই পালিয়ে গেছে। লোকে বলছে, জার্মানরা নাকি কাছাকাছি এসে পড়েছে। মোটর সাইকেল করে আসছে ওরা। সাংঘাতিক কথা!'

লোকটা ছোট ছেলের মত ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল। ঘেন্নায় ভুরু কোঁচকাল লেরিদো।

জল ভরে আবার তারা রওনা দিল। জেনারেলের মুখে একটাও কথা নেই। কেবল রেতেল-এ ঢোকবার মুখে সে হঠাৎ মোরোকে বলল, 'যুদ্ধজয়ের আর কোন আশা নেই! ডেপুটিরা কি ভাবছে জানি না। এক পাল দুঃসাহসী আর

মূর্খের সর্দার হয়ে বসেছে রেনোটা। কিন্তু এখন আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারি। আমাদের যা সাধ্য আমরা করেছি। রোমানরা যেমন বলত : অন্যে এসে ভাল করুক যদি পারে।'

১৭

কর্মব্যস্ত পৃথিবীর অনেক দূরে এক গ্রামে এসে সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি করেছে। এখানকার চাষীরা ঝাউগাছের ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালায়, চিমনির ধোঁয়ায় শুয়োরের মাংস সেদ্ধ করে। মোটাসোটা গরুগুলো প্রাচীন দেবতাদের মত তাকিয়ে থাকে সামরিক লরিগুলোর দিকে। মাঠে মাঠে ঘাস-গাছ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, ধূসর-রঙা ক্রোকাস ফুল ফুটে উঠেছে গাছের গুঁড়ির নীচে।

সংবাদপত্র এলেই সৈন্যরা পেছনকার পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। জার্মানরা কত টন জাহাজ ডোবাল বা ট্রনডিএম-এর যুদ্ধে কি হল, সে খবরে আগ্রহ নেই তাদের। পারীতে কি কি ঘটছে সে সব খবর তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, বিজ্ঞাপনগুলো গেলে। বহুদূরে ফেলে এসেছে তারা রঙ্গমঞ্চ, কাফে আর মেয়েদের। কত ঝলমলে ফিটফাট সব মেয়ে !

পারীর কথা ভেবে আঁদ্রের মন কেমন করে না। নরমাণ্ডির এক চাষীর ছেলে সে, গ্রামের ধীরগতি একটানা জীবনের সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এমন কি তার অতীতের স্মৃতিগুলো পর্যন্ত তার কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট, ভৌতিক ছায়া বলে মনে হয় : জিনেতের হাসি, কিংবা সেই ক্যানভাস যেগুলি সে এঁকে শেষ করতে পারেনি—ছাই-রঙা বাড়ীঘর কিংবা ঘুঘু-রঙা সীন নদী।

সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়ে চাষীদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসল। জিভের কবিতা লিখে চলল এক বিকৃতচক্ষু গণিকার উদ্দেশ্যে, মেয়েটিকে ভৈরবীর সঙ্গে তুলনা করে সে। লরিএ একটা বাঁশি জুটিয়ে নিয়ে বিবাহ-উৎসবে বাঁশি বাজানো আরম্ভ করল। নিভেল বিজ্ঞের মত স্থানীয় এক কাফের মালিককে বুঝিয়ে ছাড়ল যে, 'ক্রুসিফিক্স্' ভারমুথ বিক্রী করার চেয়ে 'সিনৎসানো' বিক্রী করা অনেক লাভজনক। ইভ্ বলে, 'মাইরি, এখানকার মাটিটা বেশ খাসা।' সে এই ভেবে অবাক হয় যে, মাটি সব জায়গায় একই রকম ভাল। আঁদ্রে সকলেরই প্রিয়পাত্র। তেমনি অদ্ভুত হাসি হেসে সে শেষ খাম্‌চি তামাকটা ইভের হাতে তুলে দেয়, জিভেরের একটা ছবি এঁকে দেয় 'তার ভালবাসার পাত্রীর জন্যে'।

শান্তির সময়ে কোম্পানী-কমাণ্ডার লেফটেনেণ্ট ফ্রেসিনে ছিল ফটোগ্রাফার; বিবাহিত যুবক-যুবতী, সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের ছবি তুলে বেড়াত। লোকটা বেশ স্বচ্ছন্দ কিন্তু খুঁতখুঁতে আর একটু বেশী রকম স্পর্শপ্রবণ। লোককে ভের্দ্যঁর গল্প বলতে বড় ভালবাসে সে। বলে, 'তখন লোকগুলো ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। বোকা হলেও অনেক বেশী ভদ্র ছিল তারা।' সৈনিকরা অমায়িকভাবে হাসে। বীরত্বে তারা বিশ্বাস করে না, কীর্তি-স্থাপনে তাদের আস্থা নেই। এই যুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে জড়াতে পারেনি তারা কারণ এই যুদ্ধকে তারা বোঝে না—নিজেদের বলেও মনে করতে পারে না। ফ্রেসিনে রাত্রে বসে বসে ভাবে, 'এ কি একটা ফৌজ? ওরা গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেবে আমাদের। কিন্তু দালাদিএটা কিছু বুঝতে পারে না।'

গম-গাছগুলো কেঁপে ফুলে উঠতে শুরু করেছে। বাছুরগুলোরও কেমন একটা ফূর্তিহীন ভাব, কেমন একটা অকাল বিষণ্ণতার ছাপ তাদের চোখে। গ্রীষ্মের দিন আসছে এবার। কাফেতে বসে সৈনিকরা গ্রগ-এর বদলে বিয়ার দিতে বলল। গ্রামোফন রেকর্ড বাজিয়ে চলল মনের আনন্দে। মাত্র কয়েকটা রেকর্ড বৈ তো নয়, তার মধ্যে নাকী সুরের রেকর্ডটা বিলাপ করে চলেছে, 'না, না, তুমি তো জানই এর শেষ নেই।' ঐক্যতানে প্রত্যেকটি সৈনিক যোগ দিচ্ছে। ব্রিটানির ছোট্ট শাদা বাড়ীটার কথা মনে পড়ল ইভের। আঁদ্রে তাকিয়ে রইল তারাভরা আকাশের দিকে—হের্শেলের নেবুলার কথা মনে পড়ছে।

কিন্তু হঠাৎ, কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ মানুষ—সবাইকে যুদ্ধ একটা আচমকা ঘা দিল। ১৯৩৮এর শরৎকালে সৈন্যরা যুদ্ধ এবং মৃত্যুর জন্যে অনেক বেশী তৈরী হয়েছিল কিন্তু এতদিন নিষ্ক্রিয় থেকে সমস্ত শক্তি ক্ষয়ে গিয়েছে। লরিএ যখন ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে উঠল, 'শুরু হয়ে গেছে,' কেউ তাকে বিশ্বাস করল না। ইভ্ খানিকটা গালাগালি দিয়ে তাসটা ভাল করে ফেটিয়ে নিল। নিভেল বলল, 'বালোনি, শয়তানই জানে তুই শালা কেমন তাস দিয়েছিস এবার!'

চার দিন কেটে গেল। যেমন ছিল ঠিক তেমনটি থাকল সব কিছু। রেডিও ঘোষণা করল যে ফরাসী সৈন্যবাহিনী হল্যাণ্ডের সীমান্তে গিয়ে পৌঁচেছে; জার্মান আক্রমণে খাপ্পা হয়ে উঠেছেন রুজভেল্ট্; বেলজিয়াম সম্রাট ওরফে 'ল রোয়া শেভালিএ' লিএজের বীর প্রতিরোধকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু পঞ্চম দিন ভোর থেকে মোটর গাড়ী আর মোটর-সাইকেলের দ্রুত যাতায়াত

আরম্ভ হল। সবুজাভ সকালের প্রশান্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দূরাগত কামানের গর্জনে। ফ্রেসিনে মুখ কালো করে বলল, 'হল্যাণ্ডে তো জিতছি আমরা !'
দুপুরবেলা জার্মান বোমারু আকাশ থেকে বোমা ফেলল গির্জা ও আরো কতকগুলো বাড়ীর ওপর। একটি স্ত্রীলোক মারা গেল। সংকীর্ণ মেঠো পথে আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়। তারা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে, 'জার্মানরা মেরে ফেলছে লোকদের।' গ্রামবাসীরা বোমায় ভয় পায়নি কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীদের দেখে তারা কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। আর্তনাদ করে উঠল মেয়েরা, তারপর ক্যাঁচকেঁচে গরুর গাড়ীতে যথাসর্বস্ব বোঝাই করল ; শুয়োরছানাগুলোকে মেরে, গরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলল পুরুষরা। একজন চাষী আগুন ধরিয়ে দিল তার ঘরে, আর সেই আগুন নিবুতেই হিমসিম খেয়ে গেল সৈনিকরা। সবাইকে শান্ত করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল ফ্রেসিনে। জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় চললে তোমরা ? রাস্তাতেই মারা পড়বে।' কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিল না। তারা নিষ্প্রভ বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল ফ্রেসিনের দিকে। সন্ধ্যাবেলা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল সবাই। আঁদ্রে একটা ঘরে ঢুকল : সে ঘরে স্টোভটা তখনো গরম আছে আর এক হাঁড়ি স্টু চাপানো আছে তার ওপর।
আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে সৈনিকরাও মিশে আছে, সেই সব সৈনিক যারা নিজেদের বন্দুক ছেড়েছুড়ে পালাচ্ছে। লোকে বলছে, জার্মানরা নাকি মাত্র পাঁচ মাইল দূরে এসে পৌঁচেছে।
'ট্যাঙ্কও আসছে।' লোকে বলাবলি করল।
'আমাদের লোকরা গুলি ছুঁড়ছে না কেন ?'
'গুলি ঠিকই ছুঁড়ছে কিন্তু গোলাগুলো সুবিধার নয়। জার্মানদের ট্যাঙ্কগুলো কিন্তু পাহাড়ের মত বড় বড়।'
নিভেল তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরাও যাবো নাকি ?'
চটে গিয়ে থুথু ছিটোল ইভ্। বলল, 'যে চুলোয় যেতে হয় যাও।'
নিভেল রাগে ফুঁসে উঠল। উত্তর দিল, 'আমায় ভীতু ভাবলে নাকি ? তুমি যদি থাকতে রাজী হও, আমিও আছি।'
আঁদ্রে ইভের দিকে সবিস্ময়ে তাকাল। কে আর এমনি চিন্তা করবে ? এই লোকটাই শুধু বলতে পারে : 'মাইরি, এখানকার মাটিটা বেশ খাসা।'
আঁদ্রে এখন বুঝল এই পরিত্যক্ত গ্রাম আর জমির প্রতি তার যোগ কত গভীর। এক ঘণ্টা আগে পর্যন্তও সে ভেবেছিল যে এই যুদ্ধের সঙ্গে তার

কোন যোগ নেই, যুদ্ধটা কেবল ছোট ছোট নিশান-চিহ্নিত মানচিত্র আর তেসার নীতি। কিন্তু এখন একেবারে যুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। চিন্তা বা তর্ক করার এতটুকু ইচ্ছা তার নেই। অনাবৃত পাহাড়ের ওপর শুয়ে শুয়ে সে অপেক্ষা করে রইল। মাঠ, পপ্‌লার-ঢাকা পথ আর পাহাড়ের নীচে ছোট ছোট ঘর—এই সব ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে? কক্ষনো না। তার সমস্ত ভাবনা চিন্তা মুছে গেল, কেবল একটা অস্পষ্ট চাপা আবেগ জ্বলে জ্বলে উঠল, 'আমি কক্ষনো যাব না।' তার পাশেই জিভের শুয়ে—রোগা ছেলেটা অনেক দিন কঠিন কণ্ঠনালী-প্রদাহে ভুগছে, বসে বসে ভৈরবীকে নিয়ে কবিতা লেখে। ইভের মত সেও বলল, 'আমরা এক পাও নড়ব না...' লরিএ রসিকতা করতে চেষ্টা করল, 'চুপ কর ইভ্! ট্যাঙ্কগুলো ভয় পেয়ে যাবে তোমার কথা শুনে। ভাববে ফাঁদে পড়ল বুঝি!' ইভ্ কিন্তু সেখানেই মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লেফটেনেণ্ট ফ্রেসিনে বিষণ্ণভাবে বলল, 'তুয়ার্ম-র অবস্থা এর চেয়েও খারাপ ছিল। তবে হ্যাঁ, মানুষগুলো ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম।'

'আমাদের কথা বলছেন?' আঁদ্রে প্রশ্ন করল।

'না, কিন্তু পারী......' ফ্রেসিনে তার হাত ঝাঁকাল।

রাত হয়ে এল। সমস্ত গ্রামে একই রকম অবস্থা: কুকুর ডাকছে, বুড়োরা নাক ডাকছে ঘরের কোণে, শিশুরা কাঁদছে। কিন্তু এই গ্রামে কোন কুকুর, শিশু বা বুড়ো-বুড়ী নেই। সারা গ্রামটা কেমন নির্জীব হয়ে গেছে। সৈনিকরা বোবার মত জমিতে গড়াগড়ি দিল। রাতটা সংক্ষিপ্ত। ভোর হল চারটের সময়; সূর্যের প্রথম কিরণ বিচ্ছুরিত হবার আগেই উড়োজাহাজ দেখা দিল আকাশে। ব্যাটালিয়নের ১০৯ জন লোকের প্রাণ গেল।

সৈনিকরা আবার পেছন দিকে ছুটতে শুরু করেছে। চিৎকার করছে, 'গোলা নেই! গত বৃহস্পতিবার থেকে গোলাবারুদ পাঠাচ্ছে না। ওরা বলছে, পেট্রল নাকি ফুরিয়ে গেছে......কী ভাবে ওরা? ঘুষ পেয়ে দাগা দিয়েছে আমাদের!'

নিভেল্ ভাবল, সে চলে যাবে কিন্তু একা যেতে চাইল না। নইলে সবাই হাত ঝাঁকিয়ে বলবে, 'যেতে হয় যে চুলোয় ইচ্ছে যাও!' নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে হিসেব করতে শুরু করল সে: ক্ষতি কম হয়নি, মোট শক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খোয়া গিয়েছে। অর্থাৎ ১৬৬ জনের মধ্যে ৬৭

জন……আর তিনজন আহতের মধ্যে একজন নিহত। তার মানে শত্তকরা সতেরজন নিহত। বাঁচা সম্ভব……

রেল স্টেশনের ইঁটের পাঁজার ধার দিয়ে জার্মান ট্যাঙ্কবাহিনী হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে। পাহাড় ঘুরে আসছে ওরা। এবার চারদিকে গুলির শব্দ শোনা গেল। তারা পাহাড়ে বসে বসে কী করছে ? সামনে পেছনে, জার্মানরা ঘিরে ফেলেছে তাদের। বাঁ দিকের কী খবর ? বাঁ দিকে কি হচ্ছে কে জানে। ওরা তো আমাদের নিজেদের লোক, তৃতীয় ব্যাটালিয়ন। কিন্তু বাঁ দিকেও তো সবাই পালাচ্ছে……পালিয়ে গেলে কেমন হয় ? না। এই পাহাড়টাকে কেমন আপন বলে মনে হচ্ছে, অপরিচিত নয়, খবরের কাগজে বর্ণিত 'ঘাঁটি' নয়, জীবনের অবশিষ্ট আশাভরসার প্রতীক। আঁদ্রের মনে হল যেখানে সে শুয়ে আছে ঠিক সেই জায়গাতেই মেশিনগানের পাশে সে জন্মেছে। সবাই ঠিক আঁদ্রের মতই নিজেদের সম্বন্ধে ভাবল। জিভের কি যেন বিড়বিড় করছে ধীরে ধীরে ; কবিতা নয়, অভিশাপ। ফুঁসে ফুঁসে উঠছে সে।

আবার বোমারুগুলো এগিয়ে এল। নিভেল নিহত হল এবার। সেই হাসি-খুশি ওয়েটারটা আর বেঁচে নেই ! এবার আর কেউ তিক্ত-মধুর ক্ষুধা-উদ্রেককারী মদ সম্পর্কে আলোচনা করবে না। কেউ প্রশ্ন করবে না : 'তারার সংখ্যা কত জান ? কোথায় যেন পড়ছিলাম আঠার হাজার তারার নাম দেওয়া হয়েছে। তাকে একশো দিয়ে গুণ কর…………'

নামওলা আর নামহীন তারার সমারোহ নিয়ে আরেকটি রাত্রি এল। শুকনো বিস্কুট চিবিয়ে খেল লোকে। ক্লান্ত আর ভগ্নোৎসাহ হয়ে তারা অপেক্ষা করে রইল সকালের জন্যে……যুদ্ধ আর মৃত্যু একটা বিস্তার নিয়ে আসবে তাদের জীবনে।

সাড়ে চারটের সময় ফ্রেসিনে নির্দেশ দিল, 'মেশিনগান চালাও !'

লরিএ দেখল রাস্তার পেছনে হালকা রূপোলী কুয়াশাটা কেঁপে উঠে নড়তে শুরু করেছে।

'মেশিনগান নং ১, ফিল্ড নং ৯৭ !'

'গুলি চালাও !'

জার্মানরা ভেবেছিল কোন বাধা পাবে না, ফরাসীরা অনেক আগেই পালিয়ে গিয়েছে। আঁদ্রে মনে মনে অদ্ভুত আনন্দ বোধ করল। চিন্তাটা মদের মত উঠে

গেল মাথায়। পাশ থেকে ইভ্ চিৎকার করে উঠল, 'লেজ তুলে পালাচ্ছে ওরা!'

রাস্তার ধারে এক থানার মধ্যে জার্মানরা আশ্রয় নিয়েছে। মিনিট বিশেক পরে কামানের গুলি ছোঁড়া শুরু হল পাহাড়ের চুড়োর উদ্দেশ্যে। প্রথম প্রথম গুলিগুলো পাহাড় টপকে চলে গেল।

'একেবারে গ্রামের মাঝখানে গিয়ে পড়ছে। নিজেদের লোকদের ওপরই গুলি চালাচ্ছে ওরা।'

তারপর গোলাগুলি পাহাড়ের ওপর এসে পড়ল। মাটির ঝড় উঠল আকাশে! দুটো বিস্ফোরণের মাঝখানে আর্তনাদ করে উঠতে লাগল মানুষ। কেমন অবাস্তব শোনাল মরিয়া মানুষের আর্তনাদ, তাদের চোখগুলো ঝলসে উঠল সূর্যের আলোয়; একমাত্র চিন্তা, তারা পিছু হটবে না; মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে তারা, তারপর কম্পমান মাটির ঝড়ের সঙ্গে উড়ে যাবে, তবু পরাজয় স্বীকার করবে না।

তারপর সমস্ত কিছু নিস্তব্ধ হয়ে এল। মনে হল কেউ কোথাও নেই। তাকাতে গিয়ে জিভেরকে দেখে অবাক হয়ে গেল আঁদ্রে, সে চোখ মিটমিট করছে। তাহলে সে বেঁচে আছে। লরিএ হাসছে। ঘাসের ওপর বসে আপন মনে ডাকছে একটা বোকা পাখী। ফ্রেসিনে ধূমপান করছে। কিন্তু ইভ্ কোথায়? হয়ত মারা গেছে। সমস্ত চিন্তাগুলি তার মনকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে গেল এবং করুণা বা ভয় কিছুই বোধ করল না সে। ভাবল, 'এখনি হয়ত আমি মারা যাব। তাতে কীই বা যায় আসে? শুধু একটিমাত্র কথা— জার্মানদের কাছে আসতে দেবে না তারা। মেশিনগানকে সে এখন যতটা আবেগভরে ভালবাসছে তেমন আর কখনো ভালবাসেনি অন্য কাউকে।

'ছশো পঞ্চাশ।'

আবার উড়োজাহাজ দেখা দিয়েছে। পাথরের মত বোমাবৃষ্টি হচ্ছে আকাশ থেকে।

হাঁটুর ওপর একটা ব্যথা অনুভব করল আঁদ্রে। কি হয়েছে একবার দেখবে মনে করল। বহুক্ষণ ধরে চোখ রগড়াল: ঘুম পাচ্ছে তার। ঘুম থেকে উঠেই সে লরিএকে দেখল। রক্তে ভেসে গেছে তার সমস্ত মুখ। কুছ পরোয়া নেই। ওদের কিন্তু কাছে আসতে দেওয়া হবে না।

তাকে টেনে পাশে সরিয়ে দেওয়া হল। 'জিভের, তুমি কর্ণোর জায়গায় যাও!

কাঁটাওলা ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে রইল আঁদ্রে। আবার আক্রমণ চালিয়েছে জার্মানরা।

অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে শুয়ে মেশিনগানের গর্জন শুনল আঁদ্রে। অবস্থা-ঘটিত কাহিনীর কথা মনে করে সে অনেক শান্ত বোধ করল। আচমকা মেশিন-গানের গর্জন থেমে গেল। জিভের চিৎকার করে উঠল, 'ড্রাম বাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

আঁদ্রে শক্তি সঞ্চয় করে বন্দুকের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কথা বলতে চাইল, প্রকাশ করতে চাইল নিজেকে কিন্তু অবাধ্য জিভ কথা শুনল না। হাত তুলে সে প্রাণপণ চেষ্টায় হাতের তালু দিলে ড্রামের ওপর আঘাত করল। 'ঐ!' কথা বলেই হাঁপাতে লাগল আঁদ্রে। মাটির ওপর পড়ে গেল মাথাটা। যখন ঘুম থেকে উঠল তখন রাত হয়েছে। তার চারদিকে সমস্তই খড় আর খড়। প্রথমে তার মনে হল, মাঠের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। তার বাবাকে বলছিল, 'এত তাড়াতাড়ি ফসল তুলছ কেন?' তারপর তার মনে পড়ল যে সে আহত হয়েছিল। লরিএ শুয়ে আছে তার পাশে। সে মুখটা দেখতে পেল না কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনল, 'তুমি নাকি?'

'হ্যাঁ আমি।'

বেদনায় আঁদ্রে ভুরু কোঁচকাল। কত কথাই না তার বলার আছে।

'লরিএ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? মেশিনগান আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তেসার ঐ নোংরা নাকটার কথা মনে আছে তোমার? ও বেটা জমি কিনে বেড়াচ্ছে। আমার তো ভয় হচ্ছে, ওরা মেরে ফেলেছে ইভ্‌কে—মাইরি, এখানকার জমিটা বেশ খাসা। সত্যিই, মজার ব্যাপার, কি বল? না, না, এ কিন্তু এখানে কক্ষনো থামবে না, দেখে নিও।'

'কক্ষনো থামবে না!' মৃদু গলায় বলল লরিএ।

এবার যখন আঁদ্রের ঘুম ভাঙল তখন সে বিছানায় শুয়ে। কে যেন তার পাশে এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে মাথা ফেরাল সে।

'ইভ্! আমি ভেবেছিলাম তোমাকে মেরে ফেলেছে ওরা!'

'আমাকে?' ইভ্ বিরক্ত হল। 'চুলোয় যাক ও সব কথা! তোমার এখন কথা বলা উচিত নয়—নার্স বলল। আমাকে তো ঢুকতেই দিচ্ছিল না ও।'

'বাজে কথা রাখ! ইভ্, জার্মানরা ঠেকাতে পেরেছিল?'

'পেরেছিল। কিন্তু আমাদের ট্যাঙ্ক গ্রামটা পুনরধিকার করেছে। মাত্র চারটে

ট্যাঙ্ক। ঠিক সাতটার সময়। তারপর এক পত্রবাহক এল হেড-কোয়ার্টার থেকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ নিয়ে।'

'কী বলছ ?'

'হ্যাঁ, জেনারেল পিকার্ অর্ডারটা দিয়েছে। ফ্রেসিনে হুকুমনামাটা পড়েই রিভলবারটা টেনে বার করল, তারপর দম্! ঠিক মগজের মাঝখানে গিয়ে বিঁধল গুলিটা! সত্যি বলছি, রীতিমত ভাল ছিল লোকটা, একটু দুর্বল— এই যা! ওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মোমবাতি জ্বালাব আমি। নিভেলের জন্যেও জ্বালাব একটা। পাহাড়টা ছেড়ে আসাতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।'

আঁদ্রেও দুঃখিত হয়েছে। পপলার-ঢাকা পথ, পাহাড়ের পাদদেশে ছোট ছোট ঘর আর কাঁটাওলা ঘাসের কথা মনে পড়ল তার। মাইরি এখানকার মাটি বেশ খাসা! মাটি, জিনেৎ...

'ইভ্, ছেড়ে যেও না। কক্ষনো না। আমায় শুনতে পাচ্ছ? কক্ষনো ছেড়ে যেও না কিন্তু।'

১৮

সংবাদপত্রওলারা বলল যে, জার্মানরা সময় নিচ্ছে। কিন্তু পরাজিত নবম সৈন্যবাহিনীর লোকরা পারীর পূর্ব উপকণ্ঠে এসে পৌঁছতে লাগল। মতিনি তার পরিবারকে পাঠিয়ে দিল বিয়ারিৎস-এ। কাদিলাক, হিসপানো-সুইজা, বুইক, সৌখিন মোটর গাড়ীগুলো শহর ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করল। ট্রেঞ্চ কাটা হল বোয়া দ্য বুলোঞ্-এ। রহস্যজনক প্যারাস্যুটিস্ট আর পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে কথা বলাবলি করতে লাগল লোকে। ব্রতৈল বলল, বিদেশী লোক আর আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়েই পঞ্চম বাহিনী। তার নির্দেশ মত পুলিশ কয়েক হাজার জার্মান ইহুদী, ফ্যাশিস্ট ইতালী হতে পলাতক মজুর আর স্প্যানিশ রিপাব্লিকানদের গ্রেপ্তার করল। পুলিশদের হাতে রাইফেল তুলে দেওয়া হল, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল তারা। বৃহৎ শহরের দৈনন্দিন জীবন আগেকার মতই প্রবাহিত হতে থাকল। কাফেতে লোকদের প্রচণ্ড ভীড়, দোকানগুলোয় ফলাও ব্যবসা; মারি আঁতোয়ানেৎ-এর অটোগ্রাফ আর দিরেক্তোয়ার আসবাবপত্র নীলামে বিক্রীর জন্যে এল। আসন্ন শীত ঋতুর জন্যে প্রস্তুতি করতে লাগল ফ্যাশন-হাউসগুলো। বিশেষ করে শেয়ার বাজার

ভয়ানক তেজী। এ সব সত্ত্বেও, প্রত্যেকটি শেয়ারের কয়েক পয়েণ্ট করে দাম বেড়ে গেছে। মিলিটারি থেকে নিয়ে নেওয়ার ফলে বাসগুলো রাস্তা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাস উঠে যাওয়ায় কেমন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পারীবাসীরা। মার্ন-যুদ্ধের আগেকার দিনগুলির কথা মনে পড়ল তাদের, যখন জেনারেল গালিএনি ট্যাক্সির সাহায্যে জার্মান বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

১৬ই মের সকালবেলা তেসার সেক্রেটারী তাকে খবর দিল যে জার্মান ট্যাঙ্ক লাওঁ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে! তারপর অর্থপূর্ণভাবে বলল, 'পাঁচ দিনে একশো চল্লিশ কিলোমিটার পথ এগিয়েছে ওরা। এখন লাওঁ থেকে পারীর দূরত্ব হল মাত্র একশো ত্রিশ কিলোমিটার।'

তেসা ক্ষেপে আগুন। চিৎকার করে বলল, 'কী সাহসে এই সব গুজব ছড়াচ্ছ তুমি? আমাকে তাহলে কড়া ব্যবস্থাই নিতে হবে!'

সেক্রেটারী চলে যাওয়ার পর রেনোকে টেলিফোনে ডাকল তেসা, 'শুনুন, জার্মানদের সম্পর্কে যা শুনছি মনে হচ্ছে সবই বাজে কথা, কি বলেন?'

'ওরা লাওঁর কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে।'

'তাহলে আপনি বলতে চান পারীতে আসবার আঁটঘাট বাঁধছে ওরা।'

'সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।'

'তাহলে তো এখানে পৌঁছতে বড় জোর চার দিন সময় লাগবে ওদের। দিনে ত্রিশ কিলোমিটার এগোচ্ছে ওরা। আমি হিসেব করে দেখেছি।'

'গামল্যাঁ তো বলছে ওরা আজ সন্ধ্যা নাগাদ পারীর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছবে। আমি সরকারী দপ্তরগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি। শহর ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি করে রাখা উচিত। এক ঘণ্টার মধ্যে আবার ফোন করব আপনাকে।'

তেসা সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাল, বলল, 'একটু কড়া কথা বলে ফেলেছি খানিক আগে। কিন্তু বুঝতেই পাচ্ছ খবরটা যে কোন লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য আমি নিজে একটুও বিচলিত হইনি। কিন্তু যে কোন ঘটনার জন্যে তৈরী থাকতে হবে আমাদের। প্রথমে, সরকারী দপ্তরগুলো পুড়িয়ে ফেল। দ্বিতীয়, যে সব সরকারী কর্মচারীদের শহর ত্যাগ করা দরকার তার একটা তালিকা তৈরী কর। আমার সোফারটাকে বল গাড়ী তৈরী রাখতে। এক মুহূর্তের জন্যেও যেন গাড়ী ছেড়ে না যায়। হয়ত লাঞ্চ খেয়েই বেরিয়ে পড়ব আমি।'

পলেতের কথা মনে পড়ল। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। লোকে ক্ষেপে আছে। পলেতের কথা কারও অজানা নয়। হয়ত বিশ্রী ঘটনা ঘটতে পারে। সমাজতন্ত্রীরা ব্যাপারটা নিয়ে তিলকে তাল করবে। কিন্তু পলেৎকে কি করে বলা যায় কথাটা? ও এ জগতের মানুষ নয়। ও হয়ত কেঁদে ভাসাবে। তার চেয়ে কথাটা ফোনে বলা অনেক ভাল:

'লক্ষ্মীটি, এখান থেকে তুমি এক্ষুনি চলে যাও......তোমায় বলতে পারছি না... খবরটা এত ভয়াবহ...সন্ধ্যাবেলা ওরা এখানে এসে পৌছবে। কোন সন্দেহ নেই তাতে। লোকে কিন্তু এ সম্পর্কে এখনো কিছু জানে না। তুমি কিন্তু একটা কথাও কাউকে বোলো না। আতঙ্ক সৃষ্টি করে কি লাভ? গার্ দ্য লিয়ঁতে গিয়ে প্রথম ট্রেনটা ধর...আমি? না, না, আমি যেতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আমাকে আমার জায়গায় থাকতেই হবে। আমাদের বলতে হয় না, আমাদের নিজে থেকে বীর হতে হয়...আচ্ছা বিদায়, লক্ষ্মীটি!'

রিসিভারটা নামিয়ে হঠাৎ টেবিলের ওপর কপাল রেখে কাঁদতে লাগল তেসা। কী শোচনীয় দুর্ভাগ্য! এক সপ্তাহ আগে সমস্ত কিছু শান্ত আর সুন্দর ছিল। ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগে! তারা নরওয়ের সামরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করছিল। তেসা ভাবছিল পলেৎকে নিয়ে একবার প্রে-দে দ্যাঁ-এ ঘুরে এলে কেমন হয়? পাঁচ দিনে একশো চল্লিশ কিলোমিটার। কী অদ্ভুত কাণ্ড! নিশ্চয়ই সেনাবাহিনী ছুটতে ছুটতে এসেছে সারাটা পথ! হয়ত দোষটা তাদের নয়। মিছিমিছি কে প্রাণ দিতে চায়? বেচারী ফ্রান্স!

শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকাল তেসা। রেনো এখনো ফোন করল না? তারা কি সবাই পালিয়ে গেছে, একেবারে ভুলে গেছে তার কথা।

তেসা ঘণ্টা টিপে সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাল। 'বের্ণারকে গাড়ী তৈরী রাখতে বল। আর হ্যাঁ, পেট্রলের কয়েকটা বাড়তি টিন নিয়ে রাখতে বল সঙ্গে। রাস্তায় কি অবস্থা হবে তা কেউই বলতে পারে না।'

সেক্রেটারী মাথা নাড়ল। বলল, 'ক্ষমা করবেন, মসিয়ঁ দেসের বিশেষ দরকারে দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

'দেসের?...কী অদ্ভুত লোক! এখন কি দরকার পড়ল তার? আচ্ছা আসতে বল তাকে।'

দুজনে নীরবে করমর্দন করল, পরস্পরে যাতে চোখাচোখি না হয় তার চেষ্টা করল

দুজনে। তেসার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। দেসের বুড়িয়ে গেছে; তার ম্লান চোখের তারাগুলো ধূসর-রঙা ঝাঁকড়া ভুরুর মধ্যে ভাল করে চোখেই পড়ছে না। দস্তানার ভাঁজ ঠিক করে সিগারেটের বাক্স বার করল পকেট থেকে কিন্তু সিগারেট ধরাল না।

কাগজ-চাপাটা একবার সামনে আর একবার পেছনে নাড়াতে থাকল দেসের। তেসার কাছে অসহ্য মনে হল এই মৌন।

'জুল, কী বলতে চাও তুমি?' সে জিজ্ঞাসা করল।

দেসের সোজা তার দিকে তাকাল। সে নিজেই জানে না কেন সে তেসার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, পাগলের মত ছুটোছুটি করছে সর্বত্র। সেনা-কর্তৃপক্ষ আর মন্ত্রীদের সকলের কাছে সে হয়ে এসেছে। রেনো, মাদেল, জেনারেল জর্জ—এদের সে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ভয় দেখিয়েছে, প্রমাণ উপস্থিত করেছে। কিন্তু অত্যন্ত অমায়িকভাবে বাইরে বেরুবার পথটা দেখিয়ে দিয়েছে এরা।

শেষ পর্যন্ত সে কথা বলা শুরু করল, 'জার্মানরা কালই হয়ত পারী অধিকার করে বসবে। কয়েকটা মুহূর্ত শুধু অবশিষ্ট আছে। সরে দাঁড়াও! নয়ত বল শিরদাঁড়া উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াবে তোমরা। যা বলবে মন সাফ করে বলবে কিন্তু। চারদিকে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ধরে ধরে গুলি করে মারো। মজুরদের নয়—ঐ লাভাল, গ্রঁদেল, ব্রতৈল আর পিকার্‌কে।'

'যা বলছ ভেবে দেখেছ তার গুরুত্বটা? অবশ্য আমরা দুজন পুরনো বন্ধু, কিন্তু দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত আছি আমি। আমি একজন মন্ত্রী আর তুমি রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাতে চাও আমাকে দিয়ে?'

'আমি বলছি তুমি বিদেয় হও। নয় যুদ্ধ করো। এক-একটা রাস্তা ধরে পারীকে রক্ষা করতে পারি আমরা।'

'ধন্যবাদ! তাহলে মজুর মহোদয়দের কমিউন প্রতিষ্ঠা করতে খুব সুবিধা হয়, তাই না? না, নিজের সম্মান বাঁচানোর পথই বেছে নিয়েছি আমি।'

'কিন্তু ফ্রান্স ...... '

'১৮৭১-এর ধাক্কার পরও ফ্রান্স উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবারও দাঁড়াবে।'

'সে সময়ে বেলফর রুখে দাঁড়িয়েছিল আর ওরা যুদ্ধ করেছিল লয়ারের

ধারে। গ্যামবেত্তা নিজে সৈন্যবাহিনী তৈরী করেছিল, পারী প্রতিরোধ করেছিল আর ছিল গেরিলা বাহিনী। কিন্তু এখন জার্মানদের দেখেই পথ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসছে প্রত্যেকে।'

'তুমি কী করতে চাও?'

'প্রতিরোধ করতে চাই। যদি পারীকে ঠেকানো না যায়, এস লয়ার-এ গিয়ে রুখে দাঁড়াই আমরা। তাও যদি ভেঙে ফেলে, আমরা আলজিএর-এ গিয়ে প্রতিরোধ করব। আমি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজী আছি, শুধু অর্থ নয় প্রাণ পর্যন্ত দিতে তৈরী। আর আমার মত আরও বহু লোক আছে। তোমার জানা উচিত তোমাদের মন্ত্রীদের আর এতটুকুও বিশ্বাস করে না কেউ।'

তেসা উষ্মা প্রকাশ করল। বলল, 'তোমার আত্মবিশ্বাসে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের পেছনে সমস্ত চেম্বারের অর্থাৎ দেশের লোকের সমর্থন রয়েছে। কাল হয়ত তুমি বলে বসবে ম্যাদাগাস্কারে যাওয়া উচিত আমাদের।'

দেসের বুঝল তেসা কতদূর গিয়েছে। এতক্ষণ সে অনুরোধ জানিয়েছে, এবার সে গলার স্বর পালটাল।

বলল, 'পল, তুমি নিজেই ভেবে দেখ! যদি জার্মানরা জেতে তাহলে পার্লামেণ্টের অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকবে না। এখানেও ওরা গাউলাইতর খাড়া করবে—ব্রতৈল বা লাভাল। এমনিতে যথেষ্ট আপোষরফা করেছ। কী করতে চাও এখন?'

'যে করে হোক চালিয়ে নেব। কমিউন প্রতিষ্ঠা হবার চেয়ে ব্রতৈলের শাসন অনেক ভাল। তুমি বদ পরামর্শদাতা। আমি গোঁড়া নই, তের নম্বরটা আমার কাছে শুভ। চোদ্দ তারিখে আমালি মারা গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজস্ব কতকগুলো গোঁড়ামি আছে। আমি দেখেছি তুমি সব সময়ে দুরদৃষ্ট নিয়ে আস। ঠিক বৃটিশদের মত। তুমি ব্রতৈলকে সমর্থন করেছিলে, ফলে পপুলার ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হল। ভীইয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে, সঙ্গে সঙ্গে পতন হল লোকটার। তুমি প্রতিরোধ করতে বলছ তার মানে নির্ঘাত আত্মসমর্পণ আছে আমাদের কপালে।'

দেসের উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হল। তেসার দুঃখ হল লোকটার

ওপর। বলল, 'জুল, তুমি আমেরিকা চলে গেলেই পার। প্রচুর পয়সা আছে তোমার। আমেরিকা দেশটা একটা স্বর্গ। আমি যেতে পারছি না কারণ এখানে জড়িয়ে আছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা, অবশ্য তা তোমার জন্যেই... ....একটু অপেক্ষা কর, এটা ঝগড়া করার সময় নয়। আমার কথা শোন—যেখানে হোক এক জায়গায় চলে যাও।'

দেসের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এল। চক চক করে উঠল চোখ দুটো, হাসল সে। বলল, 'চলে যাব? জানি, আমি একজন অপদার্থ ফরাসী। রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রথম লোকটাই যদি আমাকে অপমান করে তাতেও আমি আশ্চর্য হব না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম নিয়ে বলছি যে এসব সত্ত্বেও আমি একজন ফরাসী।'

তেসা কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে দরজাটা দেসেরের পিঠের ওপর বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল সমস্ত কথা। নিজের সঙ্গে কি কি জিনিস নিয়ে যাবে তার একটা ফর্দ বানিয়ে ফেলল: একটা সামরিক মানচিত্র, ডাকঘরের ফর্ম, এক কপি লা রেভ্যু দে দ্যু মনদ্, যকৃতের নির্যাস, এক বোতল পুরনো আর্মাঞ্যাক্ মদ আর এক কপি রাস্তার বিবরণ-দেওয়া বই। ঠিক বেরুতে যাবে এমনি সময়ে রেনোর টেলিফোন এল:

'লাওঁ জেলার অবস্থা অনেকটা উন্নত হয়েছে,' রেনো বলল, 'প্রথম সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রধানত আক্রমণ চলছে। তার মানে স্যাঁ ক্যাঁতাঁ পেরন অঞ্চলে। বুঝতেই পাচ্ছেন প্রতিরোধ ভেঙে তীরে পৌঁছবার ফিকিরে আছে ওরা। আমি আজই চেম্বারে একটা বক্তৃতা দিচ্ছি।'

খুশিতে উপচে উঠল তেসা। আত্মসন্তুষ্টির হাসি হেসে তেসা তার সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাল, 'আমি বলেছিলাম আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। বুড়ো হলেও সাহসিকতার শিক্ষা আমাকেই দিতে হচ্ছে যদিও ওটা তরুণদেরই ধর্ম।'

পলেৎকে ফোন করল তেসা। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে: ইতিমধ্যে সে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। তারপর জোলিওকে ডেকে দেখা করতে বলল। উদ্‌ভ্রান্তের মত উত্তেজিত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল ছোট্ট খর্বকায় সম্পাদকটি। তারপর একেবারে ফেটে পড়ল, 'সমস্ত শহরে একটা আতঙ্ক। মতিনিটা কেটে পড়েছে। আমার ক্যাশ-বাক্‌সে মোট একশো ফ্রাঁ আছে। সব কটা কাগজই পারী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যাই কোন্ চুলোয়?

মার্সাই-এ? কিন্তু রোম কি বলছে তা আমি নিজে শুনেছি। আমার ধারণা, আগামীকাল ইতালিয়ানরা আমাদের আক্রমণ করবে।'

'অর্থ-সমস্যার একটা ব্যবস্থা করছি আমরা।' তেসা বলল, 'বুঝছি না এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন। বহুদিন থেকেই তো অবস্থাটা খুব শান্ত নয়। তুমি ভাবছ জার্মানরা পারীতে আসছে? মোটেও না! লণ্ডনে যাচ্ছে ওরা।' তেসা সন্তোষের হাসি হাসল।

জোলিও আপত্তি জানিয়ে বলল, 'ওরা খুব ভাল করেই জানে, এখানে কি ঘটছে না ঘটছে। তাছাড়া ওরা কি মতলব এঁটেছে, তাই বা কে জানে?'

যাই হোক তেসা যখন বলল যে সে তার গুপ্ত অর্থ-ভাণ্ডার থেকে তিন লক্ষ ফ্রাঁ তাকে সাহায্য করবে তখন একেবারে থিতিয়ে গেল জোলিও। কাগজের আপিসে ফিরে সম্পাদকীয় লিখতে আরম্ভ করল: 'শত্রুর গতিবিধি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মিত্রপক্ষের ফ্রণ্টে যা সব চেয়ে দুর্বল জায়গা—সেই গ্রেট বৃটেনকে দখল করতে চায় জার্মানরা। আমরা অবশ্য নিশ্চিন্ত যে আমাদের চ্যানেল পারের বন্ধুরা এ সম্পর্কে অবহিত আছেন।' বাড়ী ফিরে সে স্ত্রীর ওপর ফেটে পড়ল, 'মালপত্র সব খুলে ফেল। জার্মানরা ইংলণ্ড যাবে বলে মোড় ফিরেছে। তেসা তিন লক্ষ ফ্রাঁ দিয়েছে আমায়। ইংলণ্ডের কি অবস্থা তা এখান থেকে অনুমান করতে পাচ্ছি! ওরা আমাদের এক মাস সময় দিয়েছে, এর জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ওদের কাছে।'

জোলিওর প্রবন্ধ পড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পারীবাসীরা। খবরের কাগজে দুটি সরকারী নির্দেশ ছেপে বার হল। আগামীকাল নৎর্ দাম-এর গির্জায় প্রার্থনা সভা হবে—আর সেখানে স্বয়ং রেনো উপস্থিত থাকবে। আর পারীর সমস্ত কমিউনিস্ট সংগঠনগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে স্বরাষ্ট্র আর আইন মন্ত্রীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। আটজন মজুরের হাতে 'লুমানিতে' কাগজ পাওয়ায় তাদের পাঁচ বছর কারাবাসের হুকুম দেওয়া হল। সংবাদপত্রে জানা গেল যে বেলজিয়মে জার্মান সৈন্যরা প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করছে এবং কতকগুলি ইউনিট যুদ্ধ করতেই চাইছে না। শেয়ার বাজারের কাজকর্ম কেঁপে উঠতে লাগল।

সাহস আর দৃঢ়তার সঙ্গে রেনো চেম্বারে বক্তৃতা দিল। বক্তৃতা শেষ হলে অভিনন্দন জানাল তেসা, 'আজ আপনার বক্তৃতাটা চমৎকার হয়েছে। ভাগ্যিস,

সকালে গভর্নমেণ্টের পতন হয়নি। যখন আপনি বললেন যে জার্মানরা ইংলণ্ডের দিকে যাচ্ছে......'

অবাক হয়ে রেনো ভুরু কোঁচকাল, 'ইংলণ্ডের দিকে যাচ্ছে? আমি তো বলেছিলাম তীরের প্রতিরোধ ভেঙে এগোতে চাইছে ওরা। আমাদের সৈন্য-বাহিনীকে ঘেরাও করার জন্যে আমিএঁ যাচ্ছে। বুঝলেন?'

তেসা মাথা নাড়ল কিন্তু এতটুকু বিশ্বাস করল না। মিনিট পাঁচেক পরে ব্রতৈলকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'রেনো তার প্রভুর জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠেছে। ওর কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারা যায়? আসলে ও ইংরেজদের সহিস। কিন্তু এখন ও শেষ অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। জার্মানরা যদি আমিএঁ পর্যন্ত পৌঁছয় তাহলে রেনোর পতন অনিবার্য। আর যত তাড়াতাড়ি তা হয় ফ্রান্সের পক্ষে ততই ভাল।'

১৯

কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না। ভাঙা কণ্ঠস্বরটা কিছুতেই ধরতে পাচ্ছে না জেনারেল। হ্য ভিসে চিৎকার করে উঠল, 'কিছু শুনতে পাচ্ছি না।' কলরবের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে তার কথা। হঠাৎ শান্ত হল কলরব, পিকারের গলাটা গম গম করে উঠল যেন পাশের ঘর থেকে কথাটা আসছে: 'শত্রু লাওঁ-এর ওপর চড়াও হয়েছে। ফলে রাজধানী বিপন্ন হয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে।'

হ্য ভিসে চটে উঠল, 'বাজে কথা! ওরা লাওঁ আক্রমণ করার ভান করছে মাত্র। আসলে আক্রমণটা আমিএঁর দিকে। আপনি যদি আরো সৈন্য পাঠান তাহলে এখানকার অবস্থাটা গুছিয়ে আনতে পারব। হ্য গলের ট্যাঙ্ক বাহিনী পাঠিয়ে দিন এখানে......শুনলেন কথাটা?'

আবার চিৎকার শুরু হয়েছে। একটি স্ত্রীলোক ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বিড় বিড় করে চলেছে, 'পারী...পারী...' অবশেষে হ্য ভিসে শুনতে পেল: 'ট্যাঙ্ক বাহিনী... পাঠানো......হবে না।'

ঘরের মধ্যে কী অসহ্য গরম! উত্তপ্ত টেলিফোন রিসিভারটা থেকে কেমন একটা অপ্রীতিকর গন্ধ বেরুচ্ছে। হ্য ভিসে কলারটা ঢিলে করে এক গ্লাশ গরম জল খেল। তার না-কামানো মুখ বেয়ে নেমে এল ঘামের ধারা। তার রক্তাক্ত চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন। গত তিন রাত্রি চোখের পাতা ফেলেনি সে।

সামরিক দপ্তরের কর্তা এসে ঢুকল, 'জেনারেল গর এইমাত্র খবর পাঠিয়েছেন যে ওরা সকাল ছয়টায় হামলা করবে।'

'১১নং ডিভিশনের খোঁজ পেয়েছেন?'

'জেনারেল ভিঞঅ বিমূঢ় হয়ে বসে আছেন। তিনি বললেন ডিভিশনটাকে একেবারে লাইন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাঁ দিকে আক্রমণ ঠেকাবার দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'ট্যাঙ্ক-আক্রমণ?'

'না, পদাতিক বাহিনী। মোটর-লরি করে আসছিল ওরা।'

'ও,' জেনারেল ক্রুদ্ধ হয়ে আরেক গ্লাশ জল খেল।

'কী বিশৃঙ্খলা! কিন্তু এসব সত্ত্বেও, বৃটিশকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। একটা সিদ্ধান্ত করার আগে জেনারেল গর আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে পারতেন। ১১নং ডিভিশনের দপ্তর এখন কোথায়?'

'গ্রাঁজে-এ।'

'জায়গাটা কত দূর এখান থেকে?'

'সতের কিলোমিটার। জানি না ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে কি না। শত্রুপক্ষ এখন কোথায় আছে না আছে তা ঠিক করে বলা যায় না। এ ঠিক নেপোলিটান আইসক্রীমের মত: আমরা, ওরা, আমরা, ওরা।

রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। ট্যাঙ্ক এসে আটকে আছে একটা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছাগল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সারাটা রাস্তায় ভাঙাচোরা গাড়ী এলোমেলো ছড়ানো। আশ্রয়প্রার্থীরা, বেশীর ভাগই বেলজিয়ান, বিধ্বস্ত বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ভীরু চোখে।

জেনারেলের গাড়ী আধ ঘণ্টার জন্যে আটকে গেল। একটা চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে, সঙ্গে বাড়তি চাকা নেই। চাষী পরিবারের এক বুড়ী এসে দাঁড়াল জেনারেলের কাছে। তার ঘন বাদামী কোঁচকান মুখটা দেখাচ্ছে ফাটা জমির মত। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মুছছে।

'সৈন্যরা কেন যাচ্ছে? আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে নাকি ওরা?' বুড়ী জিজ্ঞাসা করল।

দ্য ভিসে উত্তর দিল, 'ঠাণ্ডা হও। আমি নিজে একজন বুড়ো লোক আর বুড়ো সৈনিক। আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলব না। জায়গাটা আমরা ছেড়ে যাব না। এদিকে তোমরাও ছেড়ে যেও না।'

গ্যাঁজে পৌঁছবার ঠিক আগে সোফারকে গাড়ী থামাতে বলল জেনারেল। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বার করল।

'কি হে, প্রেফে মশাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

বোতাম-ঘরে লাল গোলাপ লাগানো সুন্দর সুট-পরা লম্বা লোকটা ঘাবড়ে গেল। গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে নীচে পড়ে গেল একটা দস্তানা। গাড়ীর মধ্যে একটি তরুণী—মালপত্র আর কার্ড-বোর্ডের বাক্স পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছে: প্রেফে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের ছাড়িয়ে একেবারে আগে থাকবার চেষ্টা।

'আমি......' তোতলাতে লাগল সে।

ভিসে চিৎকার করে উঠল, 'তোমার সম্পর্কে স্পষ্ট করে একটা কথা বলছি। তুমি কাপুরুষ!'

মাটি থেকে দস্তানা কুড়িয়ে নিল প্রেফে। শান্ত আর নির্লিপ্ত হবার ভান করে বলল, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশ মতই কাজ করছি। তোমার গৌরবময় অতীতের কথাটা ভেবে তোমার অপমানটা.........'

কথাটা শেষ হবার আগেই দ্য ভিসে একটা চড় মারল প্রেফের মুখে। গাড়ীর ভেতর থেকে মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল, 'গাস্ত!' তারপর জেনারেলের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'কসাই!'

অপ্রীতিকর ঘটনার কথাটা তৎক্ষণাৎ ভুলে গিয়ে আগামী কাল সামরিক গতিবিধি কি হবে তাই নিয়ে চিন্তা করতে বসল দ্য ভিসে। জার্মানদের পক্ষে ব্যাপারটা অনেক সহজ—কারণ ওরা একজনের কর্তৃত্বাধীন। জেনারেল গর তার পরামর্শ নিল না কেন? বেলজিয়ানরাও নাকি নিজেদের খুশিমত কাজ করছে। বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত! কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই। বৃটিশরা অন্ততপক্ষে আট ডিভিশন সৈন্য সরিয়ে নেবে। বিমানবহর ঠিক মত কাজ সারতে পারলেই হল!

সমস্ত আক্রমণ-পরিকল্পনাটা জেনারেল ভিঞঅকে বোঝাল দ্য ভিসে; সেও নিরুত্তর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝল। দ্য ভিসে ভাবল তাকে একবার নাড়া দেওয়া দরকার। বলল, 'মোট কথা, পারীর ওপর দৃষ্টি দিও না। ওরা গোলযোগ বাধিয়ে বসেছে। ওরা ভেবেছিল যুদ্ধটা কেবল বিতর্ক—হিটলারের তিনটে বক্তৃতা আর দালাদিএর ছুটো অভিভাষণ—এই নিয়ে যুদ্ধ। ওরা যা কিছু করেছে সমস্তই বোকামি। হল্যাণ্ডের ব্যাপারটাই ধরুন না কেন......জার্মানরা ভাল করেই জানত যে আমাদের ছুর্বল জায়গাটা হল নবম সৈন্যবাহিনী। লেরিদোর

কথা ছেড়ে দিন। ও একটা অপদার্থ জেনারেল। কিন্তু পরিবর্তনের কিছু কিছু আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। রাজকীয় বিমানবহর খাসা কাজ করছে। জেলখানার বন্দীরা বলছে জার্মানদের ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ। আরাস অঞ্চলে পদাতিক বাহিনী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওদের ট্যাঙ্কবাহিনী। আশা করছি ওরা দ্য গল ব্রিগেড পাঠাবে এখানে। আগামীকাল কি হয় তার ওপর নির্ভর করছে সব কিছু। আমরা তো......'

ভিঞঅ বাধা দিল। বুড়োর চেহারাটা বেশ খাসা, লালচে মেয়েলি মুখ, পরিচ্ছন্ন শাদা গোঁফ। বলল, 'জেনারেল রামিএকে বলেছি আরো সৈন্য না পাঠালে আমার ডিভিশনের পক্ষে আত্মরক্ষা করা পর্যন্ত সম্ভব হবে না। গত তিন দিন ধরে আমাদের বিমান বহরের তো পাত্তাই নেই। আপনি বলছেন জার্মানদের ট্যাঙ্কবাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমাদের গুলি লেগে ওদের সাঁজোয়া গাড়ীর প্লেট পর্যন্ত ছেঁদা হয় না। আপনার আমার কারও অজানা নয় এ কথাটা। গত কাল আমাদের তিন হাজার দুশো লোক প্রাণ হারিয়েছে। মনোবল ভেঙে পড়েছে আমাদের লোকদের। অফিসাররা নির্দেশ পালন করে না। আপনি যখন দেখতে পাচ্ছেন যে জার্মানরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে......'

দ্য ভিসে টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুষি মারল। গড়াতে গড়াতে মেঝের ওপর পড়ে গেল ছাইদানিটা।

'মুখোমুখি অবস্থায় এসে পৌচেছি আমরা,' দ্য ভিসে গর্জন করে উঠল, 'এ সব কি কথা বলছেন আপনি? ওরা এগোচ্ছে.........হ্যাঁ নিশ্চয়ই, না বাধা দিলে ওরা তো এগিয়েই আসবে। আপনি বলছেন অফিসাররা নির্দেশ পালন করছে না! এ তো সোজা কথা। ওদের কাছে দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে কে! আপনি নিজে। আক্রমণের পরিকল্পনাটা আপনাকে দেখালাম আর নাকী-কান্না শুরু করলেন আপনি। সামরিক আদালতে আপনার বিচার হওয়া উচিত। লজ্জার কথা, আপনার মত একজন অভিজ্ঞ লোক কচি খোকার মত ব্যবহার করছে।'

একাদশ সৈন্যবাহিনীর কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্য ভিসে। জেনারেল ভিঞঅ তার সহকারীকে বলল, 'আমাদের দ্বারা আক্রমণ সম্ভব নয়। সামরিক আদালতে কার বিচার হয় একবার দেখতে চাই আমি।'

একাদশ সৈন্যবাহিনীর লোকজন এক বিরাট খামারে এসে তাঁবু ফেলেছে। সব ছেড়েছুড়ে চলে গিয়েছে খামারের মালিক। মুরগীগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে খুদের

সন্ধানে। চশমা-পরা তরুণ লেফ্‌টেনেণ্টটি মুরগীগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। দ্য ভিসেকে দেখেই সে অভিনন্দন জানিয়ে দ্রুত গতিতে কথা বলা শুরু করল, 'জেনারেল, আক্রমণ করার নির্দেশ দিন। নইলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে লোকগুলো।' দ্য ভিসে মাথা নাড়িয়ে পেছন ফিরল। মনে হল ভয়ানক বিচলিত হয়েছে সে। ৪২ নং ডিভিশনের ঘাঁটিতে যাবার জন্যে নির্দেশ দিল সোফারকে।

পেরনের রাস্তা ধরে তারা চলেছে। রেডিওটা খুলে দিল জেনারেল। পারীতে ফক্‌স্‌-ট্রট হচ্ছে। ফরাসী স্টেশন ডিঙিয়ে স্টাটগার্ট ধরল দ্য ভিসে: 'ডাচ সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ যা এতদিন ধরে প্রতিরোধ করছিল তা গতকাল আত্মসমর্পণ করেছে। আমাদের সৈন্যবাহিনী স্যাঁ ক্যাঁতাঁ শহর অধিকার করেছে এবং লিল ও পেরনের মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত ফ্রন্ট জুড়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ডাচদের বাদ দিয়েই আমরা মোট এক লক্ষ দশ হাজার সৈন্যকে বন্দী করেছি এবং অনেক গোলা বারুদও আমাদের হাতে এসেছে। সুইস সাংবাদিকদের সংবাদে প্রকাশ, পারী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বহু মন্ত্রী ইতিমধ্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। চুক্তি সম্পাদনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কাউণ্ট সিয়ানো বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন: ইতালী আর দর্শকের মত পাশে সরে থাকতে পারে না।'

দ্য ভিসে ভাবতে আরম্ভ করল। হয়ত জার্মানরা কালই পেরনে এসে উপস্থিত হবে। শেষ অঙ্কের অভিনয় আসন্ন। ওয়েগাঁ্যা কি গামলাঁ্যার চেয়ে উপযুক্ত? ওরা দুজনে আলাদা জাতের মানুষ কিন্তু গড়নটা এক রকম; দুজনেই অতীতকে আঁকড়ে আছে, কিছুতেই বুঝবে না যে সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। আর একদল মূর্খ আর অপদার্থের হাতে পড়েছে দেশের শাসনভার। তেসার কথাগুলো তার মনে আছে, 'সৈন্যবাহিনী থাকবে একেবারে পেছন দিকে।' জার্মানরা ইতিমধ্যে পারীও দখল করতে পারে। ফ্রান্সের জীবন্ত প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করাই তার উদ্দেশ্য। আগামী কালের সামরিক কার্যকলাপের ফলাফল সম্পর্কে দ্য ভিসের সন্দেহ হল। প্রত্যেক জায়গায়ই ভিঞঅর মত কাপুরুষ ছড়িয়ে আছে—আর তার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা কত তাই বা কে জানে?

রেডিওর সুইচটা আবার পারীর দিকে ঘোরাল। ঘোষকের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল: 'আজ চার্চিল এক বিবৃতিতে বলেছেন—ফ্রান্সের শাসকরা আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যত অঘটনই ঘটুক না কেন ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত লড়বে।' দ্য ভিসে হাসল। চার্চিলকে এই প্রতিশ্রুতিটা দিল কে? তেসা বোধ হয়?

নিশ্চয়ই। 'আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব' কথাটা তেসাই বলেছে। কিন্তু তার প্রণয়িনীকে নিয়ে সে নিজেই প্রেকের মত কেটে পড়েছে। অবশ্য একটা কথা ঠিক: সৈন্যদের শেষ পর্যন্তই লড়তে হবে। কিন্তু তারা কেউ লড়তে চাইছে না। *পিকার্ আর ভিঞেন্স কিসের স্বপ্ন দেখছে? আত্মসমর্পণ! নিজের* জায়গায় টিঁকে থেকে প্রাণের বিনিময়ে দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া প্রয়োজন। তাহলে উত্তর পুরুষরা জানবে যে এই ভীষণতম যুদ্ধেও কতকগুলো খাঁটি ফরাসী অংশ গ্রহণ করেছিল। তরুণ চশমা-পরা লেফটেনেণ্টের কথা মনে পড়ে গলায় কি যেন একটা দলা পাকিয়ে গেল দ্য ভিসের। তার উপযুক্ত মৃত্যু কামনা করল সে। স্বভাবতই সে প্রার্থনা করতে শুরু করল, যেমন ছোট ছেলেরা পরীক্ষায় বসার আগে ভগবানের নাম জপ করে। সে লক্ষ্য করল না যে তারা পেরনে পৌঁছে গেছে।

সহকারী গাড়ী থেকে নীচে নামল। কয়েক মুহূর্ত পরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে ফিরে এল সে, বলল, 'অদ্ভুত কাণ্ড! ওরা বলেছিল হেড-কোয়ার্টারটা স্কুল ঘরে করেছে।'

কাউকে জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই—সমস্ত শহরটা একেবারে জনশূন্য হয়ে গিয়েছে। লোকেরা বোধহয় বোমার ভয় পেয়েছিল। বিক্ষিপ্ত খানা-ডোবা, ভাঙাচোরা আসবাবপত্র আর বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ী, এ সবের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব। জেনারেল নীচে নেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। একটা দরজা দিয়ে একজন বুড়ী বেরিয়ে আসছে।

'আচ্ছা বুড়ী-মা, এখানে মিলিটারি কোথায় থাকে বলতে পার?'

টাউন হলের দিকে আঙুল দেখিয়ে কাঁদতে লাগল বুড়ী। দ্য ভিসে খালি ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করল। কাগজপত্র, টিনের টুপি আর রসদের ঝুলিতে মেঝেটা ভর্তি হয়ে গেছে। সহকারীকে খবরাখবর নিতে পাঠিয়ে একটা বড় টেবিলের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল দ্য ভিসে। তার সামনের একটা কাগজের দিকে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকল সে। কাগজটা কার জন্মের নিদর্শন-পত্র। চিন্তা এসে আবার ভীড় করল তার মনে— ভার্লেঁস-এ তার বাড়ীর কথা মনে পড়ল। তার আদুরে নাতনীটা হয়ত বেড়াল-ছানার সঙ্গে খেলা করছে। তাদের কারও সঙ্গেই আর দেখা হবে না তার...... বীরের মত মৃত্যুবরণ করাই এখন একমাত্র করণীয় কাজ।

চোখ খুলতেও কেমন কষ্ট হচ্ছে দ্য ভিসের.........এত পরিশ্রান্ত যে চোখ দুটো

ঘুমে ঢুলে আসছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন জার্মান অফিসার আর কয়েকজন সৈন্য। অফিসারটার গালে একটা ক্ষতচিহ্ন। তার এক চক্ষু চশমাটা ঝলক দিয়ে উঠল। অভদ্রের মত দাঁত বের করে ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে সে বলল, 'আপনিই জেনারেল ত্য ভিসে, না? আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে.........'

২০

'দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে.........এবং এই অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ডও উপযুক্ত শাস্তি নয়। মনে রাখবেন, আমাদের সৈনিকরা লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দিচ্ছে। কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব আমরা! ফ্রান্সকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র অলৌকিক শক্তি এবং সেই শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি!'

রেনোর বক্তৃতা শেষ হবার পর ভদ্রভাবে হাততালি দিল সেনেটররা। পুরনো ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ তারা। তারা জানে শিগগিরই মন্ত্রী সভার পতন ঘটবে। ডেপুটিদের গ্যালারিতে বসে বসে ফুজে কাঁদছে। দাড়িওলা স্বপ্ন-বিলাসীকে ছিটের রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে দেখে হেসে উঠল সাংবাদিকরা।

তেসা যেই গাড়ীতে উঠে বসেছে ওমনি গিয়ে তার হাত ধরল ফুজে। বলল, 'এক্ষুনি তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। রেনো ঠিক কথাই বলেছে যে, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। বেশ নির্ভীক ও অকপট উক্তি, চাবুকের মত ধারালো! এখন আমাদের কাজ করা দরকার.........'

গত কয়েকদিন ধরে কেমন অসোয়াস্তির মধ্যে কাটিয়েছে তেসা, ঔদাসীন্য আর হতাশার মধ্যে দোল খেয়েছে। পরস্পরবিরোধী সংবাদ আসছে। কতকগুলি সংবাদে প্রতি-আক্রমণের সাফল্য, আবার কতকগুলিতে পারীর পতনের পূর্বাভাস। পেতঁ্যা ঘোষণা করেছে যে ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী বলে কোন কিছু নেই। যা অবশিষ্ট আছে তা হল কতকগুলো বিচ্ছিন্ন সৈন্য-দল। মাদেল প্রমাণ করছে যে প্রতিরোধ করা সম্ভব। মন্ত্রীরা একবার ঠিক করছে, পারী ত্যাগ করাই শ্রেয়, আবার ঘোষণা করছে রাজধানীতে কোন আশঙ্কা নেই। তেসার আহার-নিদ্রা বন্ধ। তার ধারণা সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ভীত হয়ে সে ফুজের দিকে তাকাল—লোকটার মুখদর্শন পর্যন্ত করতে চায় না তেসা।

কিন্তু ফ্রুজে গাড়ীর মধ্যে উঠে বসে চেঁচাতে শুরু করল, 'গণবাহিনী গঠন করব আমরা!'

ক্লান্তভাবে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে তেসা বলল, 'অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর সম্ভব নয়। আমি তান্ত্রিক নই, দৈব-ক্রিয়ায় বিশ্বাস করি না আমি। গতকাল জার্মানরা আরাস আর আমিএঁ দখল করেছে। আজ সমুদ্রতীরে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘিরে ফেলেছে আমাদের সৈন্যদের।'

'ওখানে আমাদের চল্লিশ ডিভিশন সৈন্য আছে। ওদের ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব।'

'কারা ভেদ করবে? বেলজিয়ানদের ওপর ভরসা কোরো না। প্রত্যেকেই জানে রাজা লিওপোল্ড জার্মানদের পক্ষে। বৃটিশরা আজ দু ডিভিশন সৈন্য বাপোম থেকে ডানকার্কে সরিয়ে নিয়ে গেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জেনারেল গরের মুখোমুখি হতে চায় না ওয়েগ্যাঁ। এক কথায় এ ভড়পানো ছাড়া কিছু নয়।'

'এ সব কথা বলছ তুমি? একটু আগে রেনো বলল—কাপুরুষদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। তাহলে তো তোমাকেই প্রথমে গুলি করে মারা উচিত!'

চিৎকার করে উঠল ফ্রুজে, তেসার সর্বাঙ্গে থুথু ছিটোল; তার দাড়ি দুলে দুলে উঠল বারবার।

'গলাবাজি করে কোন লাভ হবে না।' তেসা শান্ত হয়ে উত্তর দিল, 'রেনো জনসাধারণের ভালর জন্যেই কথাটা বলেছে। কথাটা তোমার শোনা উচিত··· তুমি সরল কিন্তু স্বপ্নবিলাসী। তুমি ভাল করেই জান যে তুমি ঘৃণা কর আমায়। কিন্তু তুমি ভুল করেছ। তোমায় যখন মার্সাই-এ আক্রমণ করে তখন ভয়ানক ব্যথা পেয়েছিলাম আমি।'

ফ্রুজে বলল, 'তুমি কী ভাবছ বল দিকি? হাত জোড় করছি ছোটখাটো রাজনৈতিক বাদ-বিসম্বাদের কথা ভুলে যাও। ফ্রান্স মরতে বসেছে। গোষ্ঠী বা দলের ওপরে উঠতে চেষ্টা কর।'

'স্বপ্নবিলাসী! তার চেয়েও বেশী—অতীত যুগের মানুষ তুমি। সত্তর টনের এক-একটা ট্যাঙ্ক। আর তাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়েছে? না, নাগরিক ফ্রুজে। হয়ত তুমি 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকার' ঘোষণা করেই জেনারেল ফন ক্লিস্ট্‌কে কাত করতে পারবে, কি বল?'

'তামাসা করার সময় নয় এটা।'

'তামাসা করছি না। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে আর কখনো কথা বলিনি আমি। আমাদের যুগ কেটে গেছে, বুঝতে পারলে? হয়ত ব্রতৈল টি`কে থাকবে। কিন্তু ও লোকটাও প্রাচীন-পন্থী। গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে ও। গ্রঁদেল, লাভাল, মিয়েজার—ওরা সবাই টি`কে থাকবে। তুমি ভাবছ আমি শয়তান, যদিও আমরা দুজনেই র‍্যাডিকাল। তুমি দুকানকে শ্রদ্ধা কর। কার্শ্যাকেও। আমি বলব ওরাও বিগত যুগের বীর। অন্যান্য দেশে গত যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই উনিশ শতকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সে এখনো বেঁচে আছে। আমাদের বুড়ো লোকগুলোর মরবার তাড়া নেই। পেতঁ্যার বয়স তো আশির ওপর। কিন্তু ওর কথা শোনা উচিত তোমার, নানা রকম পরিকল্পনা আর উচ্চাশায় ঠাসা ওর মাথা। যা বলছিলাম, গত যুগ শেষ হয়ে গেছে। ঠিক তোমার ঐ দেসেরটার মত। ভাল কথা, ও দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে। কী পরামর্শ দিয়ে গেছে আঁচ করতে পার? আমাদের পারী প্রতিরোধ করা উচিত।'

'ঠিক কথাই বলেছে। ওরা বলেছিল মাদ্রিদ দু-দিনও প্রতিরোধ করতে পারবে না। কিন্তু দু-বছর ঠেকিয়ে রেখেছিল মাদ্রিদ। মজুরদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দাও, তখন দেখবে কী কাণ্ড করে ওরা!'

তেসা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়। অতীত যুগে পড়ে আছ তুমি। তুমি কি ভাবছ সত্তর ডিভিশন সৈন্য আর তিন হাজার ট্যাঙ্ককে ব্যারিকেড দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে? আর তা ছাড়া কমিউনিস্টদের হাতে রাইফেল দেওয়া নিছক পাগলামি। অবশ্য তুমি তাতে খুশি হবে। কিন্তু তুমি একটা ব্যতিক্রম। সমাজতন্ত্রীদের কথা বাদ দিলেও র‍্যাডিকালরা ভয়ানক সোরগোল তুলবে। দক্ষিণপন্থীদের কথা যদি বল তাহলে পিকার্ তো একবার আমায় বলেইছিল যে শ্রমিকেরা যদি ক্ষমতা নেবার জন্যে প্রস্তুত হয় সমস্ত ফ্রন্টের মুখ খুলে দিয়ে চলে আসবে সে।'

'ওকে তোমাদের গ্রেপ্তার করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ব্রতৈলকেও। রেনো বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে কি বলেছে? আমি চাই তুমি তোমার নাগরিক কর্তব্য পালন কর। তোমার জানা উচিত যে এই সব লোক তোমায় ঘৃণা করে। যদি ব্রতৈল ক্ষমতা পায় তাহলে তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না ও। ওর ধারণা তুমি একজন র‍্যাডিকাল, তান্ত্রিক আর পপুলার ফ্রন্টের হাতের পুতুল। দেখ, তোমার সম্পর্কে কি লিখছে ওরা।'

একটা ইস্তাহার বার করে দিল ফুজে। তেসা দেখল তার নাম লেখা আছে তাতে। তার হাত দুটো ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। বলল, 'পড়া বড় কষ্টকর। হাত দুটো এমন কাঁপে।' তবু কোন রকমে কথাগুলো পড়ল: 'আমরা ওকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে ফাঁসি দেব।' ইস্তাহারের নীচে লেখা—'মন্ত্রশিষ্যদের হেড-কোয়ার্টার।'

গাড়ী ধীরে ধীরে পরিষদের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। তেসা দুর্বল কণ্ঠে বলল, *'মাফ কোরো যদি তোমায় ব্যথা দিয়ে থাকি। কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা ভয়ানক কঠিন, সত্যিই ভয়ানক কঠিন।'*

তার ঘরে গিয়ে তেসা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ইস্তাহারটা পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল—ফুজেই ঠিক: তার মুষ্টিবদ্ধ হাত, ভীইয়ারের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা কিংবা দেনিসের হয়ে ওকালতির জন্যে কখনো তাকে ক্ষমা করবে না ব্রতৈলের বন্ধুরা! আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল সে; ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল: আশ্রয়প্রার্থী, ট্যাঙ্ক আর ফাঁসিকাঠ। ঘুমিয়ে উঠে সোফায় বসে হাঁটু দুটো চেপে ধরল হাতের মধ্যে, তারপর সজোরে বলতে শুরু করল, 'প্রশ্নটা আমাকে নিজেকে নিয়ে নয়। গোটা ফ্রান্সের কথা ভাবতে হচ্ছে আমাকে।' এক সপ্তাহ আগে সে সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাবে ভেবেছিল। এখন সে শান্ত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। তবু তার দায়িত্ব আছে—সে একজন মন্ত্রী। দেশকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবে সে।

দুকানটার অবশ্য কোন অসুবিধা নেই। পাগলাটা নিজেকে নিয়েই মত্ত। ও যুদ্ধে গিয়েছে স্রেফ নিজের প্রচারের জন্যে। লোকটার কী দুরবস্থা—একজন ডেপুটি কিনা লেফটেনেণ্টের পোষাক পরেছে! ওসব করে কী হবে? ও ছাড়া যেন আর লেফটেনেণ্ট নেই!

না! এখন দরকার নতুন চালাকি, নতুন পন্থা আর অসাধারণ চালবাজী। মাদেলের মত, মস্কোর সঙ্গে ফ্রান্সের বন্ধুত্ব করা উচিত। জার্মানরা বহুদিন থেকে বুঝেছে যে রাশিয়ার সঙ্গে একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার। কিন্তু ঐ নির্বোধ দালাদিএটার জন্যেই রাশিয়ানদের সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রী সম্ভব হয়নি (এতক্ষণে তেসার মনে পড়ল যে সে ম্যানারহাইমকে সাহায্য করার বিরোধী ছিল)। দ্য ভিসে বলছে, আমাদের বিমানবহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কিন্তু রাশিয়ার কাছ থেকে হাজার খানেক বোমারু কেনা বা বিনিময়ে নেওয়া এমন কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

তেসা উৎসাহী হয়ে উঠল : একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। তার চারদিকে হ্যাকা-বোকা লোকদের ভীড়—ময়ূরপুচ্ছ রেনো আর নির্বোধ দালাদিএ। কিন্তু সে একটা জোরালো রকমের খেলা খেলতে যাচ্ছে ; মস্কোর সঙ্গে বোঝাপড়া করবে সে। তাহলে আর ইতালীর এদিকে এগোনোর সাহস হবে না। আর জার্মানীও ভীত হয়ে উঠবে। একটা পরিবর্তন দেখা দেবে ফ্রান্সে। জনসাধারণও যুদ্ধজয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। প্রত্যেকে বলবে, তেসাই দেশকে বাঁচিয়েছে, যেমনি ক্লেমসো বাঁচিয়েছিল ১৯১৭ সালে।

ফুজেকে ডেকে পাঠাল তেসা। বলল, 'ওহে, দেখা করতে এসেছ বলে ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে কথা বলবার পর আমি অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, আমরা মাছের তেলে মাছ ভাজছি। কিন্তু আরো একটু ব্যাপকভাবে ভেবে দেখ। আমি এক্ষুনি আমার পরিকল্পনাটা তোমায় বলছি। হয় তোমায় নয়তো কৎকে মস্কোয় পাঠাব আমরা।'

'মস্কোয় ? কিসের জন্যে ?'

'তোমাকে ওরা ভীষণ শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তুমি যদি না যেতে চাও তাহলে আমরা কৎকে পাঠাব।'

'কিন্তু কিসের জন্যে ?

'কিসের জন্যে ? এতে একটা মস্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এর প্রভাব পড়বে ইতালীর ওপর। আমাদের মনোবল দৃঢ় হবে। আর তাছাড়া, রাশিয়ানরা আমাদের গোলাবারুদ দিতে পারে—উড়োজাহাজও দিতে পারে গোড়ার দিকে।'

ফুজে ক্ষেপে গেল। চিৎকার করে বলল, 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ? রাশিয়ানরা তোমায় কি করতে উড়োজাহাজ দিতে যাবে ? মাস দুয়েক আগে তুমি নিজেই গলাবাজি করে বেড়াচ্ছিলে—বাকুকে ধ্বংস করে ফেলা উচিত।'

'ব্যাপারটা আসলে ঠিক তা নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে এর বিরোধীই ছিলাম। ও সমস্তই দালাদিএর একগুঁয়েমি। ওকে 'ভাক্লুসের ষাঁড়' বলাটা ঠিক নয়। ও একটা গাধা। কিন্তু অতীতের কথা খুঁচিয়ে লাভ কি ? বর্তমানে আমরা বন্ধুভাব রাখতে চাই। তুমি তাতে আমাদের সাহায্য করতে পার।'

'রাশিয়ানরা জাহান্নমে পাঠাবে তোমায়, আর সেটা কিছু অন্যায় হবে না। প্রথম প্রশ্ন হল : তুমি কাদের প্রতিনিধি ? তোমার পেছনে তো কোন সমর্থন নেই। মজুরদের এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। খবরের কাগজে আজ আরো

আটজন কমিউনিস্টের বিচারের কথা বেরিয়েছে। তোমার ঐ 'ডাক্লুসের গাধাটাই' তো পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী। ফরাসী জনসাধারণ মস্কোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারে—কিন্তু তুমি পার না। তুমি একটা কাজ করতে পার—মন্ত্রীসভার সভাপতিকে চিঠি দাও আর পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দাও তোমার। আমাদের একটা জননিরাপত্তা সমিতির দরকার।'

ফুজে দরজায় ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তেসা ভাবতে লাগল—আর কি করতে পারে সে। কমিউনিস্টদের কাছে একটা আবেদন জানালে মন্দ হয় না! কী দুর্ভাগ্য, দেনিসের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তার!

তেসা ফেরনে-র সঙ্গে কথা বলবে স্থির করল; লোকটা উকিল, আদালতে প্রায়ই কমিউনিস্টদের পক্ষ সমর্থন করে। তাকে শিগগিরই এসে দেখা করতে বলবে সে।

'জানি বহু কমিউনিস্টের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার। দয়া করে এই চিঠিটা দিয়ে দিবেন।' তেসা বলল।

'কাকে?'

লজ্জিত হয়ে উঠল তেসা। বলল, 'আমার মেয়েকে। চিঠিটা ভয়ানক জরুরী। যত তাড়াতাড়ি পারেন দেবেন—এর ওপর আমার একজন প্রিয়জনের জীবন নির্ভর করছে।'

'আচ্ছা,' ফেরনে বলল। তারপর ম্লান হেসে যোগ দিল, 'অবশ্য যদি আপনার পুলিশরা আমার পিছু না নেয় তাহলে চিঠিটা বিকেলেই দিয়ে দেব।'

তেসা লিখেছে:

দেনিস,

তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। কথাটা ব্যক্তিগত নয়, জরুরী জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে। কাল সকালে নটার সময় আসবার জন্যে তোমায় অনুরোধ করছি। আবার বলছি কথাটা আমাকে নিয়ে বা অন্য কোন গোপন ব্যাপার সম্পর্কে নয়। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার আসার খবর ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না।

তোমার হতভাগ্য বাবা
পল তেসা

সন্ধ্যাবেলা তেসাকে মন্ত্রীদের এক সভায় যেতে হল। অন্যমনস্কভাবে রেনোর রিপোর্টটা শুনল: 'ওয়েগাঁ ফিরে এসেছে। অবশ্য অবস্থাটা সত্যিই শোচনীয়,

তবু আমরা প্রতি-আক্রমণের তোড়জোড় করছি। বৃটিশরা ইতিমধ্যে আক্রমণ শুরু করেছে। ৫নং সৈন্যবাহিনী আরাস-এর কাছাকাছি পৌছল বলে।' তেসা কিন্তু নিজের চিন্তায় ডুবে আছে। সভা শেষ হবার পর সে রেনোকে পাশে ডেকে নিয়ে গেল।

'মস্কোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?' তেসা শুধোল।

'গত কয়েকদিন থেকে পরিস্থিতিটা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে আমি সামরিক বিষয় নিয়েই ডুবে আছি। কূটনীতিক ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিয়েছি বোদুয়াঁর হাতে।'

তেসা বাড়ী ফিরে ঘুমের ওষুধ খেল। ঘুম ভাঙল ঠিক আটটায়। প্রাতর্ভোজন করতে করতে শুনল কে একজন মহিলা ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার সঙ্গে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছে। তেসা চিৎকার করে বলল, 'ওকে এখানে নিয়ে এস।'

রাজনৈতিক খেলা নিয়ে সে এমন মেতে উঠেছে যে পিতৃসুলভ হৃদয়বৃত্তি পর্যন্ত মুছে গিয়েছে তার মন থেকে। তার মনে হল যেন কোন মহিলা রাজপ্রতিনিধিকে সে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

দেনিস নীরস গলায় বলল, 'উত্তেজনা সৃষ্টিই যদি এর উদ্দেশ্য হয় তাহলে কোন ফল হবে না বলে দিচ্ছি। পার্টিকে জানিয়েই আমি এখানে এসেছি।'

তেসা বলল, 'পার্টিকে জানিয়ে এসেছিস? চমৎকার! দেনিস, বুঝতেই পারিস, অবস্থাটা কী রকম গুরুতর। পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। এ সময়ে আত্মাভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। ফ্রান্সের মুক্তি আজ সংকটাপন্ন। কিন্তু উদ্দীপনা না হলে দেশকে রক্ষা করা যাবে না। আমিই প্রথম কমিউনিস্টদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। দমননীতি তুলে নিতে রাজী আছি আমরা। কিন্তু কমিউনিস্টরাও তাদের প্রচার বন্ধ করুক। বুঝলি ব্যাপারটা। কমিউনিস্টদের নাগরিক কর্তব্য হল মস্কোর ওপর প্রভাব বিস্তার করা। আমরা বোধ হয় কৎকে মস্কো পাঠাচ্ছি। প্রথমে ফুজের কথা ভেবেছিলাম কিন্তু ও লোকটা বুড়ো আর উঁচকপালে পণ্ডিত। অবশ্য কথাটা তোর আর আমার মধ্যেই থাকে যেন। আমার প্রস্তাবটা তুই তোরে, দুক্লো বা কাশ্যাঁ অর্থাৎ তোর মনিবদের কাছে গিয়ে বলবি। দরকার হলে আমি ওদের সঙ্গে দেখা করব। আমি যথাসাধ্য করতে প্রস্তুত আছি।'

দেনিস বলল, 'আমার মনে হয় না তোমার কথায় কেউ গুরুত্ব দেবে। এখনো চৌত্রিশ হাজার কমিউনিস্ট জেলে পচছে! আগে তাদের ছাড়, তোমরা বিদেয় হও আর জনসাধারণের হাতে তুলে দাও ক্ষমতা।'

'ক্ষমতাটা মোড়কের মত তুলে দেওয়া যায় না।' তেসা চটে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংযত করল নিজেকে। 'গঠনতন্ত্র মাফিক আমরা চলি। যতক্ষণ না পর্যন্ত পার্লামেণ্টের আস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ততক্ষণ বিদায় নিতে পারি না। ধৃত লোকদের মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভয় হচ্ছে, ব্যাপারটা হয়ত সম্ভব হবে না। সমাজতন্ত্রীরা এর বিরুদ্ধে। সেরল্ আমায় গতকাল বলছিল যে কমিউনিস্টদের সে দেওয়ানি আইনের পর্যায়ভুক্ত করতে রাজী নয়। কিন্তু আমি যখন তাকে বর্তমানে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তায় কথা বললাম, সে বলল—কমিউনিস্টরা আগে নিজেদের নিরস্ত্র করুক। বুঝতেই পারিস ব্যাপারটা কী রকম ঘোরালো। দক্ষিণপন্থীরা তো একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই আছে। আমরা যদি কমিউনিস্টদের ছেড়ে দিই তাহলে প্রথম ব্যালটেই মন্ত্রীসভার পতন ঘটবে।'

দেনিস অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠেছে। গত কয়েকদিন ধরে সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভীরুতার ভয়াবহ কাহিনীগুলো কানে এসেছে তার। আশ্রয়প্রার্থীদের অবিচ্ছিন্ন স্রোত মানবিক দুঃখবোধের মতই সমস্ত পারীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের ধরপাকড় সমানে চলেছে। গতকাল লুসিকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। দেনিস যখন ওর সঙ্গে কারখানায় কাজ করত তখন সারাক্ষণ হাসিতামাসা করত মেয়েটি। রাস্তার ওপর পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করেছে। মেয়েটি বাড়ীতে তার কোলের শিশুটাকে রেখে এসেছিল, বাড়ী গিয়ে তাকে আনতে চাওয়ায় পুলিশ বলেছে, 'ওকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোমায়।' মিশো উত্তরে অবরুদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আটক পড়েছে। মে মাসের যুদ্ধের পর আর কোন চিঠি পায়নি দেনিস। সমস্ত স্নায়ুগুলো কেমন দুর্বল হয়ে এসেছে তার। দেনিস কেঁদে ফেলল।

অত্যন্ত বিচলিত বোধ করল তেসা। ফুজের আর তার নিজের পরিকল্পনার কথা সমস্তই ভুলে গেল সে। এই তো তার মেয়ে দেনিস! বড্ড রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা! নিশ্চয়ই বড় দুঃসময় যাচ্ছে। লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে বোধ হয়, প্রতি রাত্রি কাটাচ্ছে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায়।

'বেচারী মেয়ে!' মৃদুভাবে বলল তেসা।

কথাটা শুনে দেনিস প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল তেসার দিকে।

'তুমি কক্ষনো বুঝবে না কেন আমি কাঁদছি। তুমি আমার বাবা এবং আমরা দুজনেই ফরাসী বলি ও একই বোমায় মারা পড়তে পারি আমরা দুজনে—কথাগুলো ভাবতেই কেমন ভয় হয় আমার। তুমি বুঝবে না! তোমার সঙ্গে যে যুক্ত আছি—এ আমার পক্ষে একটা অসহ্য যন্ত্রণা।'

'কিন্তু তুই যে আমার মেয়ে এ কথা কোনদিন আমি ভুলিনি।' তেসা ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল। ভাবল, দেনিসকে রাজী করাতেই হবে। 'দেনিস, আমাদের দলগত ঝগড়া তোলা থাক এখন। তোকে সাহায্য করতেই হবে। আমি ফ্রান্সকে রক্ষা করতে চাই, সুতরাং ফ্রান্সের খাতিরে......'

'থাম! আগে যেমন তুমি বলতে 'মা-র খাতিরে।' কিন্তু ফ্রান্স সম্পূর্ণ আলাদা কথা।'

দেনিস থামল। আশ্রয়প্রার্থী আর সৈনিকদের কথা মনে হতেই কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার। কিন্তু তেসা পাছে আবার তার দুর্বলতা লক্ষ্য করে এই ভেবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দেনিস।

তেসা দুঃখিত হয়ে মনে মনে ভাবল, 'কী ভয়ানক গোঁড়া মেয়েটা।' লুসিয়ঁটা অপদার্থ ছিল ঠিকই কিন্তু অনেক বেশী দয়ামায়া ছিল তার। আর এই মেয়েটা নিজেও বেঁচে নেই, অন্য কেউ বাঁচুক তাও চায় না! অদ্ভুত মূর্ছাগ্রস্ত জীব একটা!

কৎ-এর দৌত্য সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে বোদুয়ঁার সঙ্গে দেখা করতে গেল তেসা। বোদুয়ঁা ফাঁকা ফাঁকা জবাব দিল আর ইতালীর প্রসঙ্গে টেনে ঘুরিয়ে নিল আলোচনাটা। তার ধারণা, কিছু ত্যাগস্বীকার করা উচিত এখন, জিবুটি কিংবা টিউনিসিয়ার একটা অংশ ছেড়ে দেওয়া হোক এবং চাপ দেওয়া হোক বৃটিশদের ওপর—ওরাও কিছু ছাড়ুক, যেমন ধর মাল্টা। মুসোলিনী তো আপোষ করতে রাজীই ছিল; কিন্তু কোন উপযুক্ত লোক পাঠানো উচিত রোমে—লাভাল কিংবা ব্রতৈলকে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে তেসা ফুজেকে টেলিফোন করল। বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আমার কথাটা সঠিক বুঝতে পারনি তুমি। আমরা তোমায়

কিংবা কৎকে যা হোক কিছু একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে চাই। যেমন ধর, গালিসিয়ান শিল্পের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে একটি মীমাংসা করতে বা কাঠ কিনতে গেলে তুমি। তারপর সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে দেখলে। বাইরেতে এর ফল কিন্তু একই রকম হবে। এতে আমরা কোন বাঁধাধরায় পড়ছি না। দক্ষিণপন্থীদের আমরা বলব: মস্কোতে আমাদের একজন রাজদূত পর্যন্ত নেই। ব্রতৈলও কোন ঝগড়া পাকিয়ে তুলতে পারবে না কারণ এদিকে আমরা মুসোলিনীর সঙ্গে আপোষরফা করছি! নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মধ্যে থেকে বৃটিশরা ইতালিয়ান্ জাহাজ বাদ দিয়েছে। এই তো একটা জিত। বুঝলে?'

কোন জবাব এল না। রাগে রিসিভারটা নীচে রেখে দিয়েছে ফুজে।

তেসার পরিকল্পনা কার্যকরী হল না। শহরের বাইরে গিয়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চাইল সে। কী অদ্ভুত সুন্দর দিন! লিলাক, জেসমিন আর উইস্তারিয়া ফুল ফুটে রয়েছে, চারদিকে তার মৃদু সৌরভ। তেসা সত্যিই সান্ত্বনা পেল; এ সমস্ত সত্ত্বেও বসন্ত এসেছে আবার।

ফিরবার পথে বোয়া দ্য ভ্যাঁসেন-এ কয়েকটা সৈন্যের সঙ্গে দেখা হল তার। ট্যাঙ্ক-বিরোধী ট্রেঞ্চ কাটছে তারা। পথে থেমে তাদের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত গল্প করল তেসা; নির্ভয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পারীতে ঢুকবার এতটুকুও ফাঁক পাবে না ওরা। সিংহের মত আত্মরক্ষা করবে পারী।'

২১

পিকার্ডির সমস্ত শহরগুলোর মত এও একটা অত্যন্ত ছোট্ট শহর: একটা স্কোয়ার আর একটা দীর্ঘ পথ, তারপরেই বেঁটে বেঁটে ইঁটের বাড়ী। স্কোয়ারের মধ্যে একটা ষোড়শ শতাব্দীর টাউন হল, তার চূড়োর ওপর সোনার সিংহ-মূর্তি। টাউন হলের পরেই দুটো কাফে, একটা বিভাগীয় দোকান ও 'শাদা ঘোড়া' নামে একটা হোটেল।

শহর থেকে মাইল খানেক দূরে একটা সাইকেলের কারখানা। সেই কারখানার কর্মচারীরাই এই শহরের জনসংখ্যার প্রধান অংশ। আবার অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা ভাল ফিতে তৈরী করতে পারে! খোলা জানলার ধারে বসে বসে তাদের বুনবার কাঠি চালাতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে গ্রীষ্মকালে টহলদাররা

আসে। তারা টাউন হল দেখে স্কোয়ারে গিয়ে বিয়ার নিয়ে বসে। শীতকালে কাফেগুলোতে মজুররা আড্ডা জমায়, লম্বা লম্বা মাটির পাইপ টানে আর রাজনীতি আলোচনা করে। যুদ্ধের আগে এক কমিউনিস্ট নগরকর্তা ছিল, টাউন হলের ওপর তেরঙা আর লাল দুটো ঝাণ্ডাই তুলেছিল সে। দেওয়ালের ওপরকার সেই লেখাগুলো আজও মুছে যায়নি: 'ফ্যাশিজম ধ্বংস হোক!' 'পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ!' আর তারই সঙ্গে অত্যন্ত আনাড়ী হাতে আঁকা হাতুড়ী-কাস্তের প্রতিকৃতি। রবিবার দিন লোকে জিন খায় আর বসে বসে মোরগের লড়াই দেখে। সেদিন সিনেমায় 'মৃত্যুর চুম্বন' ছবিটা দেখানো হয়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা খালের ধারে বেড়াতে বেড়াতে পদ্ম ফুল পেড়েছে। অত্যন্ত সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে সমস্ত শহরের লোক; রাত এগারোটায় রাস্তায় একটি জনপ্রাণীরও চিহ্ন নেই। কেবল টাউন হলের ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি সময় নির্দেশ করছে বা কতকগুলি স্ত্রীলোক ছোট ছোট ঘরের মধ্যে শিশুদের ঘুম পাড়াচ্ছে: 'সোনা মানিক আমার, কেঁদো না, ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীটি। খোকা ঘুমোলো!'

রেল-স্টেশনের কাছাকাছি দুটো বাড়ীর ওপর প্রথম বোমাটা পড়ল। এক বুড়ো কামার মারা গেল আর জখম হল দুজন স্ত্রীলোক। দ্বিতীয় বোমায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল টাউন হলটা। পাথর আর ইঁটের ভগ্নাংশে ছেয়ে গেল সমস্ত স্কোয়ারটা। সোনার সিংহমূর্তিটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। অধিবাসীরা পালাতে আরম্ভ করল। আঠারো হাজার লোকের মধ্যে অবশিষ্ট রইল মাত্র একশোজন।

একটি স্ত্রীলোক নীল এনামেলের কফি-পট এনে মিশোর জন্যে কফি ঢালল। শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি চলে যাচ্ছ?'

'এই তো সবে এসে পৌঁচেছি আমরা।'

'ওরা বলছিল তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ। সবাই চলে গেছে। কিন্তু মা অসুস্থ বলে আমায় থেকে যেতে হল। আমি মাকে প্রায়ই বলি যে তোমরা নিশ্চয়ই ছেড়ে যাবে না।'

মিশো হাসল, 'নিশ্চয়ই যাব না। চারদিকে যা ব্যাপার ঘটছে তা দেখে-শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। লোকে কেবল এলোপাথাড়ী ছুটছে আর অন্ধের মত এগিয়ে চলেছে। কেউ থামাচ্ছেও না তাদের। কী চমৎকার অদৃষ্ট! ওরাই আমাদের ফিনল্যাণ্ডে পাঠাতে চেয়েছিল আর এখন ওরাই জার্মানদের দেখে

পালিয়ে যাচ্ছে। লজ্জার কথা! আমাদের অদৃষ্ট যদি অন্য রকম হত!' সাহস হারিও না। চলে যাচ্ছি না আমরা। ভাল তলঘর আছে তোমার? তাহলে সবকিছু সেখানে নিয়ে গিয়ে চুপচাপ বসে থাক। অন্য সব ব্যবস্থা আমরাই করছি।'

ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ফেব্‌র্ যে কোন উপায়ে শহরকে রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছে। সবাই মনে করে লোকটা নির্দোষ; সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্ষুধা উদ্রেককারী মদ খায় আর ক্যাকটাসের সৌন্দর্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়। কিন্তু গত কয়েক দিন থেকে অত্যন্ত সাহসী আর জ্ঞানী বলে খ্যাতি হয়েছে তার। কামব্রাই থেকে পিছু হটার সময় ব্যাটালিয়ন জোর প্রতিরোধ দিয়েছে শত্রুকে। দু দুবার প্রতি আক্রমণ চালিয়ে জার্মানদের হাত থেকে বিশজন বন্দীকে ছিনিয়ে এনেছে। যখন ডুবুরী বোমারুর আক্রমণ শুরু হল, ফেব্‌র্ একজন সৈনিকের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে বোমারুর উদ্দেশ্যে গুলি করতে লাগল। ফলে, শান্ত হল লোকে, কেউ আর তেমন আতঙ্কগ্রস্ত হল না। একটা বোমারু সত্যি সত্যিই গুলিতে ঘায়েল হল। তবু আট দিনে এক তৃতীয়াংশ শক্তি ক্ষয় হল ব্যাটালিয়নের। ওপরআলার নির্দেশ পেয়ে রীতিমত ঘাবড়ে গেল ফেব্‌র্, 'যে কোন উপায়ে শহরকে রক্ষা করা' বলাটা ওদের কাছে সহজ। জার্মানরা যদি তাদের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক আক্রমণ করে তাহলে কী দিয়ে ঠেকাবে তারা?

ফেব্‌র্ জানে, দলের মধ্যে মিশো অত্যন্ত জনপ্রিয়। কর্নেল কোরিয়ে ভীত হয়ে দুটো কোম্পানী ভেঙে দিতে চাইলে ফেব্‌র্ প্রতিবাদ করল। এবং লা হেভ্‌র্-এর বিদ্রোহের কথাটাও চাপা পড়ে গেল। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ফেব্‌র্ মিশোকে জিজ্ঞেস করে, 'মসিয়ঁ ডন কুইকসোটের মতামতটা কি?' এবারও সে তাই করল।

মিশো বলল, 'আমরা প্রতিরোধ করব।'

পার্টির নির্দেশ কি তা মিশোর জানা নেই; বহু দিন হল তার কোন যোগাযোগ নেই পারীর সঙ্গে, সুতরাং তাকে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হল! দ্বিধাবোধ করল না মিশো। না, কমিউনিস্টরা কাপুরুষ নয়! তারা দেখিয়ে দেবে—তারা লড়তে পারে। এখন প্রশ্নটা রেনো, তেসা বা দালাদিএকে নিয়ে নয়, এ হল ফ্রান্সের জন্যে সংগ্রাম করার প্রশ্ন।

চারদিকে শত্রু। কেউ হাতে হাতকড়া পরাচ্ছে, কেউ বোমা ফেলছে।

থায়েলমানকে ফাঁসিকাঠে উঠিয়েছিল আর স্পেনকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল যে মৃত্যু-দূত নাৎসীরা, তারা এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যেও ফ্যাশিস্টরা সক্রিয়— হিটলারের বন্ধু ব্রতৈল, গ্রঁদেল আর পিকার্।

শান্তিপূর্ণ আর নিরুপদ্রব ফ্রান্সের মৃত্যু হয়েছে। শত্রুর দাক্ষিণ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত দেশকে। এমন কি এখানেও সেই ধ্বংস আর মেয়েদের আর্তনাদ। 'তোমরা কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?' মিশো টাউন হলের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে রইল। অধ্যাপক মালে একবার বাড়ী সম্পর্কে বলেছিলেন—'রেনেসাঁর মুক্তো।' একটা দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা কথা চোখে পড়ল মিশোর—'রুটি, শান্তি, স্বাধীনতা।' ১৯৩৬-এর কথা মনে পড়ল— ধর্মঘট, ঝাণ্ডা আর সংগীতের সমারোহ।

দেশের এই দুর্দিনে তার দেশপ্রেম তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কত জিনিসের সংমিশ্রণেই না এই আবেগের সৃষ্টি—সাভোয়ার পর্বতমালা, গুঞ্জনমুখর নদী আর রোদ ঝলসানো মাঠ যেখানে সে তার শৈশব কাটিয়েছে; পারী—তার নিজের দেশ পারী, ধূসর-রঙা বাড়ী আর হাস্যমুখর শহর, যে শহরে জিনোর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু ক্ল্যমাঁস বেঁচে আছেন, পারী আর দেনিস। সে জানে, পাহাড়ী ফুলের মত ক্ষীণপ্রাণ এক নীল-চোখ মেয়েকে সে রক্ষা করতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই সে আবৃত্তি করল, 'ফ্রান্স...দেনিস...'

সারা দিন ধরে ওরা ট্রেঞ্চ কাটল, বালির বস্তা ভরল আর ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান ও মেশিনগান আড়াল করার কাজে ব্যস্ত রইল। সন্ধ্যাবেলা হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলল ফেব্র্। ওরা বলল, 'সর্বত্রই আমরা শত্রুকে ঠেলা মারছি। আমরা নতুন সৈন্য পাঠাচ্ছি আপনাদের জন্যে। যদি পিছু হটেন তাহলে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নকে পেছন দিককার কাজে ব্যবহার করবেন।'

মিশো একবার কারখানার দিকে তাকিয়ে দেখল। মেশিনগান লাগানো হয়েছে। গতকালই ওখানে বোমা পড়েছিল। বৃষ্টি হয়েছিল সকালের দিকে, কারখানার একটা বোমা-ধ্বসা গর্তে টল টল করছে সেই বৃষ্টির জল। জলের ওপরে যন্ত্রের কতকগুলি অংশ বেরিয়ে আছে। কারখানার আরেক অংশে যাঁতাকলটা একেবারে অক্ষত অবস্থায় আছে কিন্তু। মিশো মনে মনে খুশি হয়ে উঠল, তার কোন শৈশবের সাথীকে খুঁজে পেয়েছে যেন। যন্ত্রপাতি ভালবাসে সে। তাদের ধমক দিয়ে আর যত্ন করে প্রাণবন্ত করে তোলে—যেন ঐ যন্ত্রগুলো তারই ছেলেমেয়ে। লোকদের কী হয়েছে ভেবে রীতিমত অবাক

হয়ে গেল সে! তারা সবাই কাজ, ভালবাসা আর সুখ চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সমুদ্র আর মানুষ নিজেকে ভাসিয়ে রাখবার জন্তে আপ্রাণ সংগ্রাম করতে লাগল। বন্দরে পৌঁছুতে পারবে না সে, তার আগেই তার মৃত্যু হবে। কিন্তু অন্তরা পৌঁছুবে। পিয়ের, লেগ্রে, বুড়ো হ্যুশেন—ওরা থাকবে। যন্ত্রপাতিগুলো থাকবে—আর থাকবে দেনিস⋯ম্যাগ্‌নিটোগর্‌স্‌-এর মত বড় বড় কারখানা গড়ে তুলবে ওরা। ছবিগুলো তার স্পষ্টই মনে আছে। গতকাল তারা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে মার্চ করে এসেছে। চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে ফসলগুলো। আর কেই বা ফসল কাটবে? কিন্তু বসন্ত গেলে ওরা আবার ফসল বুনবে। সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে জীবন। কিন্তু এখন ভয়ানক শক্ত...

শহরের সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হল মিশো। তার সঙ্গীরা কোনমতে জেগে আছে, কী করে প্রতিরোধ করবে তা-ই আলোচনা করছে। তারা মাত্র তিনশোজন। এদিকে জার্মানদের সঙ্গে ট্যাঙ্ক আছে। মিশো তাদের উৎসাহ দিল এবং স্পেন-যুদ্ধের গল্প বলল:

'কখনো কখনো আমরা মাত্র ত্রিশজন একটা ব্যাটালিয়নের মুখোমুখি হতাম। ওদের ট্যাঙ্ককে শায়েস্তা করতাম হাত-বোমা দিয়ে। আমাদের হাতে আর অন্ত কিছু ছিল না। পেপে বলে একটা ছেলে আট-আটটা খতম করে দিয়েছিল।'

'ও ছিল অন্ত রকম ট্যাঙ্ক। কিন্তু জার্মানদের ট্যাঙ্কগুলো সাঁজোয়া—ও রকম ট্যাঙ্ক আর কারও নেই।'

'ওদেরও শায়েস্তা করা যায়। কিন্তু তার জন্তে দরকার স্পেনের সেই লোকদের মত যোদ্ধা। লোহা দিয়ে তৈরী মানুষ।'

'ওখানে তুমি জানতে কিসের জন্তে তুমি যুদ্ধ করছ। আমি নিজেও ওখানে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে তুমি কেন প্রাণ দিতে বসেছ? কাকে রক্ষা করছি আমরা? তেসাকে?'

মিশো জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই দিল না। সে নিজে চিন্তিত, তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সে সচেতন।

মিশো দৃঢ়ভাবে বলল, 'না, ওদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশটা আমরা পরে করব। কিন্তু এটা তো আমাদের নিজেদেরই দেশ। মেয়েদের দেখেছ তোমরা? ওদের স্বামীরা আমাদের সঙ্গে ফ্রণ্টে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা ফ্রণ্ট ছেড়ে চলে যেতে পারি না। কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই একটা দৃষ্টান্ত দেখাবে। আর

তাছাড়া, বাস্তবিকই সমস্ত কিছু ছেড়ে যাওয়া কি সম্ভব? একটা যাঁতাকল দেখেছি আজ...'

বক্তব্য শেষ করার আগেই বিস্ফোরণের একটা শব্দ হল। ভোর হওয়ার আগেই প্রথম গোলাটা এসে উপস্থিত হয়েছে। ছোট ছোট অপস্রয়মান তাঁরাগুলো এখনো দেখা যাচ্ছে ম্লান আকাশে। বিস্ফোরণগুলোর শব্দ রীতিমত ভয়াবহ; সূর্য ওঠার আগে গোলাবর্ষণ শুরু হবে একথা ভাবতে পারেনি কেউ। কেমন শীত শীত বোধ করল মিশো, বোধ হয় হিম পড়ছে; কিন্তু ঠাণ্ডাটা ভেতর থেকেই আসছে। মেশিনগানটা আঁকড়ে ধরে মুহূর্তে একটা প্রশান্তি বোধ করল সে।

মিনিট পনের পরে গোলাবর্ষণ থামল। ধীরে ধীরে সূর্য উঠছে আকাশে, মাঠে মাঠে পাখীর কলগুঞ্জন শুরু হয়েছে, কেমন গোলাপী হয়ে গেছে জলের রং। লোকগুলো চুপ মেরে আছে। দেনিসের কথা ভাবছে মিশো।

স্পেনে থাকতে যেমন সে দেনিসের স্তনের উষ্ণতা আর ঠোঁটের নোনা স্বাদ অনুভব করত আজও ঠিক তেমনি একটা অনুভূতি এল। পাইন পাতার গন্ধ ভেসে আসছে। মিশো মনে মনে বলল, 'দেনিস! প্রিয়তমা! এই-ই শেষ!' তামাসা করার সময় নয় এটা; অত্যন্ত বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কিন্তু ভয়াবহ নয় তাই বলে। একমাত্র দুঃখের বিষয় যে দেনিসের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না...

ট্যাঙ্কগুলো খালের ধারে এসে পৌঁচচ্ছে। চারদিকে প্রচণ্ড গর্জন; যেন পৃথিবীটাই আর্তনাদ করছে। মিশো তাকিয়ে দেখল, ফেব্‌র্‌ হাত দোলাচ্ছে।

'গোলা ছোঁড়ো ওদের ওপর!'

আর একবার নিস্তব্ধতা নামল।

'ওরা আবার এক্ষুনি শুরু করবে। ওরা জানে কোথায় আছি আমরা।'

'তাতে কোন ক্ষতি নেই।' মিশো হাসল। 'আমি ওদের স্পেনে দেখেছি। লোককে পালাতে ওরা দেখতে ভয়ানক ভালবাসে। কিন্তু পাল্‌টা আক্রমণ পছন্দ করে না ফ্যাশিস্টরা।'

'মিশো, তুমি কি চাও প্রতিরোধ করি আমরা?'

'আমি বলি, নিশ্চয়ই। ঠিক তাই!'

নটা নাগাদ জার্মানরা আবার আক্রমণ শুরু করল। গোলা লেগে চূর্ণবিচূর্ণ

হয়ে গেল হতভাগ্য বাড়ীগুলো। মিশোর কাছ থেকে তিন গজ দূরে একটা ট্যাঙ্কে আগুন ধরেছে।

'বাঁ দিকে, ঠিক আলুর ক্ষেতটা পেরিয়েই......'

জার্মান মোটরসাইকেল-বাহিনী এগিয়ে আসছে। ওরা থামল। তারপর ট্যাঙ্কগুলো অগ্রসর হতে শুরু করল। আহত লোকগুলোর ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে ট্যাঙ্কগুলো। চিৎকার করে উঠল ফেব্‌র্, 'শুয়োর! জানোয়ার! নিজেদের লোকদের চাপা দিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা!'

গুলি লেগে কোম্পানী কমাণ্ডারের মৃত্যু হল। দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে তলঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল সার্জেণ্ট। ফেব্‌র্ বুকে হেঁটে মিশোর কাছে এসে বলল, 'কারও কথা শুনো না। চালিয়ে যাও। টের পাইয়ে দাও ব্যাটাদের।'

সেই মুহূর্তের পর কত সময় কেটেছে—কয়েকটা মুহূর্ত না পুরো এক ঘণ্টা? ক্রমান্বয়ে কেবল বিস্ফোরণের শব্দ। মিশো তার বাঁ হাতে ঝাঁকুনি দিল, রক্তে ঢেকে গেছে সমস্তটা।

'হামাগুড়ি দিয়ে এস এদিকে!'

কিন্তু মিশো নড়ল না। এমন কি কথাটা শুনল না পর্যন্ত।

'আরেক বেল্ট্ গোলা দাও!.........এইবার, হারামজাদারা, এই নাও!......'

দুপুরে শান্ত পৃথিবীটার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে দুরান্তের জমকালো সূর্য। গুলির শব্দ বা আর্তনাদ থিতিয়ে গিয়েছে। নিস্তব্ধতায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আহতদের ঘেঙানি পর্যন্ত থেমে গিয়েছে। পরে তাদের একটা লরিতে বোঝাই করা হল। মিশো তার কমরেডদের দিয়ে নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধালো কিন্তু যেতে চাইল না। মৃতদের গোর দিল তারা। গরম জল খেল বসে বসে, জলে টিনের বাক্সের গন্ধ। যেন দীর্ঘ রোগ ভোগের পর কেমন একটা ক্লান্তি বোধ করছে সবাই। তারা হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাধারণ ও বিস্ময়কর ঘটনাগুলো মনে পড়ল তাদের— শহরের ওপরকার আক্রমণকে প্রতিহত করেছে তারা।

মিশোর কাছে গিয়ে ফেব্‌র্ বলল, 'সাবাস, ডন কুইকসোট! স্পেনে তুমি কী ছিলে?'

'লেফ্‌টেনেণ্ট।'

'এই জন্যে কর্নেল তোমায় হাজতে পাঠাতে চেয়েছিল, না? কিন্তু আজ

আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি জেনারেল করে দিতুম তোমায়। ওরা বলে তুমি নাকি কমিউনিস্ট? ব্যাপারটা কী হাস্যকর!......এখন আমরা জেনেছি তুমি সত্যিই কী!......'

চোখ দুটো মুছে বোতল থেকে এক ঢোঁক 'রাম' খেল সে।

'আমি হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি। সুসংবাদটা জানানো উচিত ওদের।'

সংযুক্ত হবার পর তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর কানে এল। গতকাল ওরা ফেব্র্‌কে বলেছিল, 'যে কোন উপায়ে ঠেকিয়ে রাখুন।' আজ ওরা তার যা বলার আছে সমস্তই শুনল, তারপর বলল, 'রাত্রির অন্ধকারে শহর ছেড়ে চলে আসুন।' ফেব্র্‌ চিৎকার করে উঠল, 'কেন?' উত্তর এল, 'নতুন ভাবে সৈন্য সমাবেশ করছি আমরা।'

রিসিভারটা সশব্দে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফেব্র্‌, 'জেনারেল? ও বেটা জেনারেল না আর কিছু। অপোগণ্ড একটা!'

'বিশ্বাসঘাতক ওরা!' মিশো তার কমরেডদের বলল, 'আত্মসমর্পণের পথে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে!'

সত্যটা উপলব্ধি করল প্রত্যেকে আর নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

বিদায়, যাঁতাকল! বিদায়, টাউনহলের স্বর্ণ সিংহমূর্তি! বিদায়, নীল কফিপটউলী মহিলা, অসুস্থ মা, আতঙ্কিত ও উন্মত্ত দুটি চোখ! ধূলি-ধূসর পথ দিয়ে বিষণ্ণভাবে হেঁটে চলল মিশো। এই পথ দীর্ঘ, এই পশ্চাদপসরণের পথ। দুপুরে উত্তাপ আর প্রশান্তির মধ্যে যুদ্ধ-জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল সে। আর সেই যুদ্ধজয়ের চোখ দুটি ছিল কফিপটউলী মহিলাটির মত...বিদায়, নির্বোধ স্বপ্ন!...

২২

সন্ধ্যাবেলা পারীকে মনে হয় নির্জন অরণ্যের মত; এমন কি ছোট ছোট নীল বাতিগুলো পর্যন্ত নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। পথচারীদের রাস্তায় থামিয়ে তাদের পরিচয়-পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। গুপ্তচর আর প্যারাস্যুটিস্টদের উপস্থিতি সম্পর্কে গুজব রটেছে নাকি। রু শের্‌স্‌ মিদির এক খোঁড়া দুধওলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; সে নাকি বিমানের উদ্দেশ্যে সংকেত পাঠাচ্ছিল। লোকে জোর

গলায় বলতে শুরু করেছে যে পারীতে ৪০,০০০ ছদ্মবেশী জার্মান সৈন্য এসে আশ্রয় নিয়েছে। তিনজন 'মন্ত্রশিষ্য'কে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল মাদেল। ইতালীয়ান নামঠিকানার তালিকা এবং বিমান-বিধ্বংসী কামানের অবস্থিতি চিহ্নিত পারীর মানচিত্র পাওয়া গিয়েছে তাদের কাছে। ব্রতৈল ক্ষেপে আগুন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সাধু ফরাসীদের গ্রেপ্তার করার অর্থটা কি?' পরের দিন সকালে 'মন্ত্রশিষ্য'রা ছাড়া পেল। ব্রতৈলের স্ত্রী কাঁদুনি গেয়ে চলল, 'জার্মানরা এসে পড়ল এখানে!' ব্রতৈল বলল, 'ভগবানের নাম নাও। কিন্তু কি হবে না হবে কে জানে? হয়ত মার্শাল পেতাঁই ফ্রান্সকে রক্ষা করবে...'

পথে পথে আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়। উদাসীনের মত রেল স্টেশনের চারদিকে তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শূন্য, নিরাসক্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পারীকে।

মহানগরীর কোলাহল কিন্তু তাদের কানে পৌঁচচ্ছে না। মোটরচালকরা ব্যর্থ হয়ে হর্ন বাজাচ্ছে, দাঁত খিঁচিয়ে উঠছে; আশ্রয়প্রার্থীরা শুনতে পাচ্ছে না কিছু; যেন অন্য কোন ভয়ানক শব্দে কান দিয়ে আছে তারা।

পরিশ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা ফুটপাথে এসে আশ্রয় নিয়েছে। লোকে তাদের চারদিকে ভীড় করে প্রশ্ন করছে—কোত্থেকে এসেছে তারা? এখনো পারীবাসীদের ধারণা যে যুদ্ধ অনেক দূরে; সংবাদপত্রওলারা এখনো উত্তর নরওয়ের যুদ্ধ সম্পর্কে খবরাখবর দিচ্ছে। কেবল আশ্রয়প্রার্থীরাই শান্তিভঙ্গ করে বলছে, 'জার্মানরা মেরে ফেলছে লোকদের। কোনক্রমে বেঁচে গেছি আমরা।' শ্রোতাদের ভীড় সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। ভয়াবহ গল্প শুনে কী লাভ?

বেশী সতর্ক যারা তারা প্রদেশে তাদের আত্মীয়দের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে। অন্যেরা কাজকর্ম করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, ফূর্তি করছে। প্রথম দিনের বিমান-সংকেতধ্বনির পর যে ক্যাবারেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলো খোলা হবে কি হবে না তাই নিয়ে আলোচনা করছে সংবাদপত্রওলারা। বৃদ্ধরা তরুণদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, '১৯১৪ সালের মত এবারেও ওদের হটিয়ে দেওয়া হবে।'

পেতাঁর প্রতিভা, ওয়েগাঁর নীতি বা দৈব ঘটনা—কোনটিতেই আস্থা নেই ভীইয়ারের। তার ধন-সম্পত্তি বাক্সবন্দি করতে ব্যস্ত সে। ভোরবেলা থেকে তার ফ্ল্যাটে হাতুড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুলিরা আসছে আর যাচ্ছে।

ছবিগুলোর ভাগ্য ছাড়া আর কোন কিছুতেই আগ্রহ নেই ভীইয়ারের। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি ক্যানভাস কালো বাক্‌সে রাখল, তারপর নির্লিপ্তভাবে চোখ বুলিয়ে নিল খবরের কাগজে। বুঝল, সমস্ত কিছু ডুবে গেছে। যবনিকা-পতনের জন্যে অপেক্ষা করতে কেমন বিরক্ত বোধ করল সে।

তার বিরক্তির মধ্যে ক্রোধও আছে। তার স্বাভাবিক শান্ত ও বিষণ্ণ চোখ দুটোর ওপর একটা ক্রুদ্ধ বিস্ফার ঝিলিক দিয়ে উঠল। কেন ওরা তার কঠোর জীবনকে নিরুপদ্রবে কাটাতে দিল না? সে জানে না কাকে দোষারোপ করবে। সুতরাং সবার প্রতি ঘৃণা বোধ করল ভীইয়ার; জার্মানরা আর দালাদিএ, তেসা আর কমিউনিস্টরা, বৃটিশরা আর অপদার্থ সেনাপতিরা।

পেরেক-আঁটা বাক্‌সগুলির দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের কথা মনে হল ভীইয়ারের। আভিঞঁতে তার ছোট বাড়ীটার কি হবে? উইসটারিয়া-ঢাকা ছোট্ট লতামণ্ডপ আর বাদামী বালির ওপর সূর্যের ঝিকিমিকির কথা ভেসে উঠল তার মনে। ডুবে গেছে পারীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু জার্মানরা যদি আরো অগ্রসর হতে চায়! না, তা অসম্ভব। তারা পারী ত্যাগ করবে, দু-তিন দিনের জন্যে পারীতে প্রবেশ করে প্রাশিয়ান অহমিকা চরিতার্থ করুক ওরা। তারপর তারা সন্ধি করবে। আসলে আলসাস-লোরেনটা একটা খেলার ঘুঁটি—সামনে পেছনে ছুটোছুটি করছে কেবল। বিশ বা চল্লিশ বছর স্ট্রাসবুর্গ জার্মানদের করতলগত থাকবে। অন্যদিকে কিন্তু এর ফলে শান্তি আসবে। কিন্তু তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। পারীর পতনের পরও যদি চার্চিল রেনোকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার প্ররোচনা দেয়? ফ্রান্স তো এখন বৃটিশদের একটা উপনিবেশ মাত্র। এই সময় ভীইয়ার কাশল আর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল তার চাকর আর কুলিদের দিকে। এতে আর ওদের কী? ওরা খাটে, চুরি করে আর ফূর্তি করে।

দরজার বেল বাজার শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে তেসা এসে ঘরে ঢুকল। তেসাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল ভীইয়ার। তেসার না-কামানো জীর্ণ মুখখানা দেখে কেমন একটা আনন্দ হল তার। তাহলে তেসারও দুঃসময় যাচ্ছে! জঞ্জালটা সে-ই সাফ করে দেখুক না!

সাড়ম্বরে আরম্ভ করল তেসা। বলল, 'মন্ত্রীসভায় মার্সাল পেতাঁকে নেবার সময় ভেবেছিলাম যে ও সমস্ত দুরূহ সমস্যাগুলোর সমাধান করবে। কিন্তু

পরিস্থিতিটা প্রতিদিনই জটিলতর হয়ে উঠছে। ভয়ানক দুঃসংবাদ জানাতে এসেছি তোমায়। বেলজিয়ামের রাজা আত্মসমর্পণ করেছে।' তেসা ভীইয়ারের দিকে তাকাল, নির্লিপ্ত হয়ে প্যাশনের লেন্স মুছছে সে। 'জেনারেল ব্লাশারকে একটু সতর্ক করল না আগে থেকে। সৈন্যবাহিনীর অবস্থা ভয়ানক খারাপ। শয়তানিটা কতদূর বুঝতে পারছ? লোকে ওর বাবা আলবেরকে বলত 'লা রোয়া শেভালিএ' কিন্তু ইতিহাসে লিওপোল্ডের নাম মূর্তিমান ধূর্ত হিসেবে অখ্যাত হয়ে থাকবে।'

'তার দিক থেকে রাজা অবশ্য কোন অন্যায় করেনি।' ভীইয়ার শান্তভাবে বলল, 'এ ছাড়া আর কীই বা করতে পারত সে? কতকগুলো অবস্থায় আত্মসমর্পণ করাটাই বীরত্বের কাজ।'

'আমরা ও রকম 'বীরত্ব' দেখালে হিটলার আমাদের কাছে কী শর্ত পেশ করত একবার ভেবে দেখছ? ও হয়ত আলসাস চেয়ে বসবে। এমন কি লিল্ অধিকার করতে চাইবে ও।'

'একথা তোমার আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। আমি দোষ দিচ্ছি না কিন্তু পরাজয়কে প্রতিরোধ করার মত কিছুই করোনি তুমি। যুদ্ধ না করেই ঘাঁটি-গুলো ছেড়ে দিয়েছ ওদের হাতে। হার তো মিউনিকেই তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সে সময় তুমি মন্ত্রীসভায় এসে ঢুকলে।'

'প্রসঙ্গক্রমে, তুমিও তা সমর্থন করেছিলে। তাছাড়া, হারের কারণই যদি খতিয়ে দেখ তাহলে ১৯৩৬-এর ধর্মঘট আর চুয়াল্লিশ ঘণ্টা সপ্তাহের কথা ভুলে গেলে চলবে না। শিল্পগুলোয় বিশৃঙ্খলা আনল কারা? আব স্পেনের কথাই ধর না। মুসোলিনীকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিল ব্লুম। তুমি ফ্রাঙ্কোকে ক্ষেপিয়ে দিলে, তারপর অবশ্য যুদ্ধজয়ে সাহায্য করলে বটে। এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে?'

গত কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সপ্তমে উঠল তেসার গলার আওয়াজ। ভীইয়ার অসংলগ্নভাবে কথা বলল; তার কাঁপা কণ্ঠস্বরটা শোনাল কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের মত। বহুক্ষণ তারা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করল। আর পুরনো পার্লামেণ্টারী চক্রান্ত, অবিবেচকসুলভ ঘোষণা এবং চেম্বারের অনৈক্যের কথা আলোচনা করল।

প্রথমে কিন্তু তেসাই দমন করল নিজেকে। বলল, 'পরস্পরকে গালিগালাজ করে কোন লাভ নেই। ধৈর্যের প্রশ্নটাই এখানে বড়। কিন্তু ভয়ংকর

একটা সময়ের মধ্যে বাস করছি আমরা, ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো উচিত আমাদের। আমি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি যে তুমি মন্ত্রীসভায় যোগ দাও। রেনো একটা কিছু চমকপ্রদ করবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। মন্ত্রীত্বসংকট দেখা দিলে বিদেশে একটা খারাপ ধারণা হবে, সুতরাং আমরা ঠিক করেছি ব্যাপারটা ঘরোয়াভাবে সেরে ফেলব। সর্বপ্রথমে, দালাদিএটাকে হটিয়ে দিতে হবে। গাধাটা ফ্রান্সকে একেবারে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে। আরো কিছু রদবদল করব আমরা। সারোকে সরাতে হবে। বোদুয়াঁ আর প্রুভোসকে দলে নিতে হবে। কাজের লোক ওরা। কিন্তু জাতির বিবেকের প্রতীক হিসেবে তুমি আমাদের কাছে অপরিহার্য। তাছাড়া তোমাকে পাওয়া মানে শ্রমিক শ্রেণীকে সঙ্গে পাওয়া।'

ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসল ভীইয়ার। ওরা কি বোকা ভেবেছে তাকে? আত্ম-সমর্পণের ঠিক আগেই সে মন্ত্রীসভায় ঢুকবে? তার মানে বশ্যতা স্বীকার করছে সে, আদর্শের জন্যে তার পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামকে মুছে ফেলবে একেবারে। আর কিসের জন্যে? না তেসা বাইরে বলে বেড়াবে, 'দেখ, ভীইয়ারও সই দিয়েছে।' না, নিজেকে অতটা নীচে নামাতে প্রস্তুত নয় সে!

ভীইয়ার বলল, 'রেনো আর তোমার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমি রীতিমত অভিভূত হয়েছি। কিন্তু মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে চাই না। আমার পার্টির প্রতিনিধি তো মন্ত্রীসভায় আছেই। সমাজতন্ত্রীরা যে দায়িত্ব এড়াতে চায় একথা বলতে সাহস পাবে না কেউ। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা আমাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। এমন কি ইংলণ্ডেও ওরা একজন তরুণকে পেলে খুশি হয়। কাজেই আমি নামে মাত্র মন্ত্রী থাকব শুধু।'

তেসা তর্ক করে তাকে রাজী করাতে চেষ্টা করল, 'ওগুস্ত, না বলতে পারবে না তুমি! খাদের মুখে এসে পৌচেছি আমরা। যা কিছু আমাদের প্রিয় সবই ধ্বংস হয়ে যাবে—ফ্রান্স, পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি, যার দুধ খেয়ে যে সব বোধশক্তি অর্জন করেছি আমরা......'

নিজের কথায় নিজেই অভিভূত হয়ে গেল তেসা; মনে পড়ল আমালির মৃত্যু, দেনিসের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎ, আশ্রয়প্রার্থী, পেতাঁর জেদ আর সমস্ত কিছুর উত্তরে সেই একই জবাব: 'অনেক দেরী হয়ে গেছে।' তার কণ্ঠস্বরে অশ্রুপাতের আভাস।

ভীইয়ার স্বস্তি বোধ করল কিন্তু সন্তুষ্ট হল না। সে মর্মান্তিক আঘাত দিতে

চাইল তেসাকে। বলল, 'কী সব বাজে কথা বলছ? আমাদের দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। অবশ্য অর্থনৈতিক উদারনীতির কথা যদি বল তাহলে বলব তোমার চিন্তাধারা দেউলে হয়ে গেছে। কিন্তু আমি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলেছি। হিটলার কী নিয়ে আসছে? সমাজতন্ত্রবাদ! কথাটা নিঃসন্দেহে কিছুটা বিকৃত কিন্তু জার্মান রীতিনীতির সঙ্গে মিশ-খাওয়ানো। কিন্তু আমরা যদি এই জাতীয়-সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করি এবং তার সঙ্গে স্যাঁ-সিমোঁ, প্রুঁধো ও আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের নৈতিক শিক্ষাগুলি যোগ দিই তাহলে অত্যন্ত খাঁটি ও নিতান্ত ফরাসী একটা কিছু লাভ করব আমরা।'

তেসার আর সে সব দিকে কান নেই, মতবাদ নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছা নেই তার। হঠাৎ চোখে পড়ল পড়বার ঘরে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা—চারদিকে ট্রাঙ্ক আর বাক্স ছড়িয়ে আছে এলোমেলোভাবে।

'তুমি চলে যাচ্ছ নাকি?' তেসা জিজ্ঞাসা করল।

বিব্রত হয়ে ভীইয়ার বলল, 'হ্যাঁ, মানে, আমি নিজে থাকছি। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে চাই আমি। কিন্তু ছবিগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি। সংগ্রহগুলোকে নষ্ট করার আমার কোন অধিকার নেই। ফরাসী আত্মার প্রতীক এই ছবিগুলো। রাজনৈতিক ব্যবস্থা উচ্ছন্নে যেতে পারে কিন্তু শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলোকে থামকা বোমা লেগে ধ্বংস হতে দিতে পারি না।'

হল পর্যন্ত তেসাকে পৌঁছে দিল ভীইয়ার। বিদায় জানাবার সময় হঠাৎ কেমন একটা উষ্মা পেয়ে বসল তেসাকে, 'যত বিপদই আসুক না কেন, আমি পারীতেই থাকতে চাই। আমার কোন সংগ্রহ নেই। আর ফ্রান্সের কথা ভাবতেই হবে আমাকে......'

২৩

মিয়েজার আতঙ্কিত না হয়ে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করে চলেছে। কেবল প্রতি রাত্রে বিমান-ধ্বংসী কামানের গর্জনের মধ্যে ঘুমোবার জন্যে ভেরোনল খেতে হয় তাকে। তার উদাসীন মুখে হাসিটুকু লেগে আছে—লিয় অধিবাসীর চাইতেও সে জার্মান বা সুইডদের মত দেখতে। লোকটা স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর, নিজের চেহারার ওপর রীতিমত যত্ন নেয়। মোটা না হবার জন্যে টেনিস খেলে। তার অভিজাত ফ্ল্যাটে কেমন একটা পবিত্র প্রশান্তি। তার পড়ার ঘরে

কোন ছবি বা কোন টুকিটাকি জিনিস পর্যন্ত নেই। লেখবার টেবিলের সামনে নেপোলিয়নের একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি। কয়েকটা রেফারেন্স-বই বাদে সমস্ত বইয়ের আলমারিটা একেবারে খালি। পড়ার প্রতি মিয়েজারের আকর্ষণ নেই, বরং সে সংগীতটা পছন্দ করে, বিশেষ করে বাক্। মিয়েজার বলতে ভালবাসে, 'এ আমার ধর্মের অনুকল্প।'

দুটি সন্তানের বাবা সে। তার ছেলে সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা শেষ করেছে। ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা এড়াবার জন্যে মিয়েজার তাকে সৈন্যবাহিনীতে লেরিদোর দপ্তরে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক বিরাট পয়সাওলা লোকের সঙ্গে, লোকটি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত নিকেলের শেয়ারগুলো হাতিয়ে নিয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডে থাকে ওরা।

মিয়েজার ছ-ছটা ভাষা জানে আর সে একজন নামজাদা পরিব্রাজক। যে কোন জায়গা হোক সে সমান স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে; বলে—সাংহাই-এর রেস্তোরাঁয় বাঁশের ডগা দিয়ে মুরগীর তরকারি, ক্যালিফোর্নিয়ার ফল বা আলজিরিয়ার সুরুয়া তার একই রকম ভাল লাগে। টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায় না, ও সব সে ইঞ্জিনীয়ারদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কাঁচামালের দর আর বাজারের হালচাল সম্পর্কে তার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। প্রত্যেক জায়গাতেই তার ব্যবসায়গত সম্পর্ক। জার্মানীর কেমিক্যাল শিল্প, নরওয়েজিয়ান নাইট্রেট্‌স্ আর চ্যাকো প্ল্যাটিনামের ওপর তার বিশেষ আগ্রহ। মিয়েজারের ধারণা—দেসেরটা বোকা আর আনাড়ী—'ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধোত্তর যুগেই ওর মত লোকের পক্ষে এতটা জনপ্রিয়তা পাওয়া সম্ভব।' সে কেবল দেসেরের নিশ্চিন্ত মুখাবয়ব ও রূঢ় আচরণ দেখে ঘৃণাভরে হাসে।

দেসেরের অবনতিতে মিয়েজার খুব খুশি হল। ঘটনাগুলোরও নিজস্ব একটা যুক্তিবাদ আছে! কিন্তু ভয়ানক দুঃসময় এটা, মনে মনে ভাবল মিয়েজার। ব্যবসা খুব ভাল চলছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরে কি ঘটবে? যুদ্ধমান দেশগুলির ক্লান্তি কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়। পরাজয় হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, হয়ত বিপ্লব হবে একটা। আর যদি জয় হয় তাহলে তো দেসেরের মত লোক জনসাধারণের সামনাসামনি আসবে, এক ঘণ্টার খলিফা হয়ে উঠবে। মিয়েজার তার পূর্ব-পুরুষদের নিয়ে গর্ব করে; তার ঠাকুরদা ছিল তিন-চতুর্থাংশ রেলওয়ে ব্যবস্থার মালিক আর তার ঠাকুরদার বাবা ছিল মস্ত বড় মহাজন, বালজাক উল্লেখ করেছিলেন তার কথা।

যুদ্ধটা তার কাছে প্রাচীন কালের একটা স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসের প্রতি তার মনোভাব ব্যঙ্গোক্তির সমতুল্য। অবশ্য হাসি গোপন করতে সে জানে যাতে অপরে না মর্মাহত হয়; যেমন সে বৌয়ের সঙ্গে কখনো হাসিতামাসা করে না; তার বৌ লুর্দের অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে। যা কিছু তার বিচারে মধ্যযুগীয়, সে সব কিছুতেই সে ঘাড় নাড়ে, কিন্তু বৌকে পয়সা দেবার বেলায় কার্পণ্য করে না, যে পয়সা বিভিন্ন গির্জার সাহায্যেই ব্যয়িত হয়। মিয়েজারের বিশ্বাস—জাতিগুলো যখন সংকীর্ণভাবে জীবন যাপন করে তখন যুদ্ধ অত্যন্ত ন্যায্য। কিন্তু এখন বিভিন্ন জাতির স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমেরিকানদের পক্ষে বৃটিশ রবার বিনা কাজ চালানো অসম্ভব। জার্মানদের প্রয়োজন তেল এবং তার জন্যে ডেটেরডিং বা বলশেভিকদের ওপর নির্ভরশীল ওরা। ফরাসীরা তো প্রত্যেকের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যুদ্ধ করে কী লাভ? ইউরোপটা বোকাদের শাসনে না থেকে মিয়েজারের মত ব্যবসায়ী লোকদের শাসনে থাকলে একটা আপোষ-রফা সম্ভব হত।

যখন যুদ্ধ বাধল তখন মিত্রশক্তির যুদ্ধজয়ে বিশ্বাস রাখতে পারল না মিয়েজার। এমন কি জার্মানরা জিতবে কিনা তাতেও সন্দেহ হল তার। মনে মনে বলল, এতে জিতটা হবে তৃতীয় পক্ষের। যন্ত্রটা থামাতে চাইল সে, মাদ্রিদে গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে কথা বলল। শীতকালে সে ভাবল যে, সহজ-বুদ্ধি প্রাধান্য লাভ করছে কিন্তু আসলে উল্টোটাই ঘটল। চেম্বারলেন বিদায় নিল আর এদিকে খেদিয়ে দেওয়া হল ব-নেকে। তারপর এল ১৯৪০-এর মে মাস।

এখনো যা রক্ষা করা সম্ভব তা রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় অনিবার্য। এক সময় হয়ত একথা শুনে লোকে বিচলিত হত, ফরাসীদের কাছে ফ্রান্সই ছিল গোটা পৃথিবী। কিন্তু এখন...হিটলারকে জার্মানদের মনোভাবের সঙ্গে একটা হিসেব-নিকেশ করতেই হবে, ওরা ভার্সাই সন্ধির প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু হিটলার লোকটা চালাক। তাছাড়া, ছিচ-কাঁদুনের কাছে এ সমস্তই একটা হৃদয়াবেগের প্রশ্ন। সৌভাগ্যবশত, পল দেরুলেদে ও তার স্বদেশী গানের অনুরাগীরা আজ আর নেই। যুদ্ধের বহু আগে থেকেই ফ্রান্স স্থানচ্যুত হয়েছে। ছিচকাঁদুনেরা অবশ্য কিছু সময়ের জন্যে চিৎকার জুড়ে দেবে তারপর থিতিয়ে যাবে ধীরে ধীরে আর তারপর দেশের ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে আসবে।

সুতরাং যখন জেনারেল পিকার্ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আপনি যা বলছেন

তার অর্থ তো 'আত্মসমর্পণ' মিয়েজার উত্তর দিল, 'কথাগুলো শুনে ভয় পাবেন না। বর্তমান অবস্থায় যা একমাত্র সম্ভাব্য তাই বলছি।'

এর পর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল জেনারেল পিকার্। পারীর চাকুরে মেয়েরাও কাঁদল, কিন্তু পিকার্ তো ছেলেমানুষ নয়। সে জানে কিসের আয়োজন চলেছে। সে নিজে ব্রতৈলের বন্ধু। সে বহুবারই বলেছে, 'জার্মানরা আমাদের হারিয়ে দেবে।' তাহলে 'আত্মসমর্পণ' শব্দটা শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল কেন সে?

মিয়েজার বলল, 'আমি আবার বলছি এই-ই একমাত্র উপায়। উত্তরগামী সৈন্যবাহিনীর ভবিষ্যৎ তো নির্ধারিত। বেলজিয়ানরা খেলার মাঠ থেকে সরেই গেছে। বৃটিশরা ছেনালি করছে ছুঁড়ীদের মত। কিন্তু জার্মানরা ইংলণ্ডের ওপর হাওয়াই হামলা করলেই ওদের সতীপনার বড়াই কেটে যাবে। বৃটিশদের থেকে এগিয়ে থাকা, অন্তত একটা আলাদা সন্ধি করে, তাতে তো আমাদেরই সুবিধে। আমরা যদি যুদ্ধ চালিয়ে যাই তাহলে হিটলার এসে পারী দখল করবে আর মার্সাই দখল করবে ইতালীয়ানরা। আর ওদিকে কমিউন গড়ে উঠবে লিয়ঁতে। কোন্‌টা বাঁচানো সব চেয়ে জরুরী—পুরনো সীমান্ত না সভ্যতা? সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই কমিউনিস্টরা একটা অভ্যুত্থান ঘটাবে ...'

গত কয়েক মাস ধরে পিকারের সমস্ত চিন্তা একটা ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দিনে দশবার করে সে মত বদলায়। কখনো বলে আমরা হেরে যাব, এবং হেরে যাওয়াই উচিত। এখনই এই কলঙ্কিত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানো দরকার। আবার কখনো কখনো ফরাসী সৈন্যবাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা মনে করে পিকার্ ভাবে, 'হয়ত আমরাই জিতব।' হিটলারকে সে শ্রদ্ধা করে, শত্রু মনে করে না এবং জার্মান আশ্রয়প্রার্থীদের সে ঘৃণাভরে বলে, 'দলত্যাগী।' জার্মান অগ্রগতির গোড়ার দিকে সে ভীত হয়ে উঠেছিল। নির্দেশ দিয়েই তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহার করেছিল সেগুলো। চিৎকার করে বলেছিল যে এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখাটাই প্রয়োজন; কিন্তু সে নিজে প্যারাট্রুপকে সাংঘাতিক ভয় পায়: যদি সেনা দপ্তরের ওপর আক্রমণ চালায় ওরা? রাজনৈতিক খেলায় জড়িয়ে পড়েছিল পিকার্। ব্রতৈলের কাছে গিয়ে সমস্ত প্রশ্নগুলো উত্থাপন করল সে। ব্রতৈল বলল, 'শত্রুকে অন্তত এক মাস ঠেকিয়ে রাখ। আমরা রেনোটাকে খেদিয়ে দিয়ে জার্মানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসব।' পিকার্ হৃদয়স্পর্শী নির্দেশ পাঠাল: 'সৈনিকগণ, বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও নয়!'

'এক পাও পিছু হোটো না!' জার্মানরা দিনে ত্রিশ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে আসছে। পিকার্ ব্রতৈলের কাছে ফেটে পড়ল, 'আমরা আর ঠেকাতে পারছি না!' ব্রতৈল স্থির হয়ে উত্তর দিল, 'তোমরা যে ঠেকাতে পারবে একথা মনেও ঠাঁই দিইনি আমি।'

যাই হোক, এখনো পর্যন্ত পিকারের সঙ্গে কেউ আত্মসমর্পণ সম্পর্কে আলোচনা করেনি। ম্যিয়েজার যখন সোজাসুজি বলল, 'আমাদের বৈলজিয়মের পথ অনুসরণ করা উচিত,' পিকার্ ঘাবড়ে গেল। কাঁদতে লাগল সে। কিছুটা শান্ত হবার পর সে অস্ফুট গলায় বলল, 'ওরা কিন্তু আমাদের হাতে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দেবে না......'

ম্যিয়েজোর বলল, 'আমি বুঝি, এটা আপনার পক্ষে একটা মস্ত বড় আঘাত। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি হারালে চলবে না। ১৯৩৬ সালে আমি ভেবেছিলাম সমস্ত বুঝি ডুবে গেল। ধর্মঘটীরা দখল করে বসেছিল আমার কারখানাগুলো। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমি কাজ করে যেতে লাগলাম। হয়ত ওরা অল্প কিছু সৈন্য আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে। তরুণ অফিসারদের সামরিক শিক্ষা দিতে পারবেন আপনি। আপনার জ্ঞান ব্যর্থ হবে না। বর্তমানে কিন্তু পারীকে আপনি রক্ষা করতে পারেন। আমি প্রতিরোধের কথা বলছি না। মন্ত্রীদের মধ্যে অবশ্য অনেক স্থির-বুদ্ধি লোক আছে। গতকাল শ্যঁমজি আলাপ আলোচনা শুরু করেছে। কিন্তু রেনো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আর মাদেলের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। ও লোকটা ফ্রান্সের দুষ্ট প্রতিভা। ও ফ্রান্সকে রক্ষা করতে চায়। তার মানে রাজধানীর ধ্বংস আর অসংখ্য নরহত্যা। আপনি তো ক্ষমতাশালী লোক। গভর্নমেণ্টকে আপনার জানানো উচিত যে সামরিক দিক বিচার করেই পারীর প্রতিরোধ একটা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। এই কাজ করলে আপনি ফ্রান্সের একটা মস্ত উপকার করবেন।'

জুলাইয়ের সেই ঝলমলে দিন, আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফের কাছে বজ্রমুষ্টি এবং লালঝাণ্ডার মেলা—দৃশ্যগুলো ভেসে উঠল পিকারের মনে।

'আচ্ছা, আমি আমার কর্তব্য করব।' পিকার্ উত্তর দিল, 'শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করব। কিন্তু যদি ওরা ওয়েগ্যাঁর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসে, পারী ছেড়ে পিছু হটার কথা প্রস্তাব করব আমি। আমাদের পৌত্র প্রপৌত্রদের জন্যে পারীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শহরকে যথাযথভাবে শত্রুর হাতে তুলে দেব, পুলিশবাহিনীকে পর্যন্ত সরাবো না।'

গ্রদেলের পরামর্শ মত যুদ্ধ-কারখানাগুলির নিরাপত্তা আলসাসবাসী বাইসের হাতে তুলে দেওয়া হল। পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যেতে লাগল বাইস। তার কথা মত কারখানায় কারখানায় ধ্বংসকার্যের অনুসন্ধানে গুপ্তচর পাঠাল প্রেফে। উৎপাদন সম্পর্কে গুপ্তচরদের কোন ধারণা না থাকায় তারা নির্বোধ উক্তি, অযথা হয়রানি ও হুমকির সাহায্যে শ্রমিকদের উষ্মার উদ্রেক করল মাত্র। বিশেষ করে ম্যিয়েজারের বিমান কারখানার গুপ্তচররা রুদ্র মূর্তি ধারণ করল। 'সাহসী বীরসব! তোমরা বরং যুদ্ধে গিয়ে লড়াই কর। জার্মানরা বোভাস-এ এসে পড়েছে। লোকের কাজে বাধা দিচ্ছ এটা বুঝতে পারছ না তোমরা?' এই ক্রুদ্ধ উক্তি করার জন্যে একটি মেয়ে শ্রমিককে গ্রেপ্তার করল ওরা। পুলিশ রিপোর্টে দেখা গেল, মেয়েটি নাকি কারখানায় ছুতোরদের বেঞ্চ নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছিল।

গুমোট দিন। ঝড় উঠবার পূর্বাভাস। শাদা আলো জ্বল জ্বল করছে, নিশ্বাস নেবার জন্যে হাঁপাচ্ছে লোকগুলো। ম্যিয়েজারের কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা। পারীর দিকে এগিয়ে আসছে জার্মানরা! সৈন্যরা বলছে তাদের হাতে একটিও বিমান নেই। বড়লোকরা উর্ধ্বশ্বাসে শহর ত্যাগ করছে কিন্তু বিশৃঙ্খলা দূর করবে কারা?

দুপুরে খাওয়ার সময়ে কারখানার পেছনে পতিত জমিতে শ্রমিকরা একটা সভা ডাকল। জমির উপর পোড়া কয়লার গায়ে জংলী আগাছা জন্মেছে। হিটলার, পুলিশের চর আর আসন্ন নাটকীয় ঘটনা সম্পর্কে কথা বলল শ্রমিকরা।

এই বেআইনী কমিউনিস্ট সংগঠনের মধ্যে তরুণ তালা-কারিগর ক্লদই প্রধান প্রাণশক্তি। সে মাত্র গত জানুয়ারী মাস থেকে কারখানায় কাজ করছে কিন্তু শ্রমিকরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে আপন করে নিয়েছে। যক্ষ্মা হবার ফলে সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে সে। তার চোখের দীপ্তিকে মানসিক উত্তেজনা বলে ভুল হয়। ছেলেটি সত্যিই আবেগে ফেটে পড়ছে কিন্তু তার সশব্দ ও চপল শ্বাসপ্রশ্বাসের ভঙ্গীতে তার অসুস্থতা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ক্লদ কল্পনাপ্রবণ, সারা রাত সে বই পড়ে কাটায়—টলস্টয় ও ফ্লবেয়ার, শলোকভ

আর মালরো। পাঁচ বছর আগে সে মেজোঁ দ্য কুলতুর-এ যেত, সেখানেই লুসিয়ঁর সঙ্গে আলাপ হয়। একদিন অনেকক্ষণ কথা বলেছিল ওরা দুজন। লুসিয়ঁ কেবল 'চিরন্তন ঝড়ের' কথাই বলে যাচ্ছিল। ক্লদ বিনীত হয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। প্রত্যেকটা জিনিস আপনার জানা। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। আমার মতে কবিদের সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। তাই নয় কি? লুসিয়ঁ মনে মনে বলেছিল, 'মধ্যবিত্ত মন!' ক্লদকে কেমন ভাল লেগেছিল ভাঁইলার, সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কবিতা লেখ নাকি? মনে হচ্ছে তুমি লেখ।' ক্লদ কোন জবাব দেয়নি। সে কবিতা লেখে ঠিকই কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা পায়। তার কবিতাগুলো কেমন অদ্ভুত। সে নিজেই জানে না কেন সে অমন কবিতা লেখে। তার কবিতা ধর্মঘটের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয় কিন্তু তারপরই হঠাৎ সে লিখতে আরম্ভ করে জলা-জঙ্গলের জ্বলন্ত ফার্ন গাছ বা জাহাজের দড়ি-দড়ার বর্ণনা। সে নিজের মনে মনে বলে, 'আমি তামাসা করছি নিজের সঙ্গে।'

দু বছর আগে সে স্পেনে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সীমান্তে আটক করে তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পারীতে। সে সময়ে সে 'সীন' কারখানায় কাজ করত। লেগ্রে বলেছিল, 'তুমিই আমাদের প্রধান বক্তা।' যদিও ক্লদ কেমন অস্থিরচিত্ত আর নিতান্ত গোবেচারা গোছের মানুষ কিন্তু লোককে তার বক্তব্য বোঝাতে পারে সে। লোকের সঙ্গে কথাবলার সময়ে সে নিজের পন্থা সামনে তুলে ধরে না, বরং কি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞাসা করে তাদের। তার কথোপকথনের ভঙ্গী, হঠাৎ-থামা, শব্দের জন্যে দুরূহ সন্ধান কেমন একটা গভীর নিষ্ঠা আর ছেলেমানুষির পরিচয় দেয় এবং সে যা বলে বিশ্বাস করে লোকে।

যুদ্ধের গোড়াতে ক্লদ গ্রেপ্তার হয়ে চার মাস কারাদণ্ড ভোগ করেছে। ছাড়া পেয়েছে চিকিৎসকের পরীক্ষার পর। কোন চাকরি সংগ্রহ করতে পারবে এ আশা ক্লদের ছিল না কিন্তু হঠাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। মিয়েজারের কারখানায় টার্নার নেওয়া হচ্ছে। আবেদনকারীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে আপিসে। 'ক্লদ ভিভাল'—নামটা নজরে পড়ল ওদের। পৃথিবীতে কত ভিভালই না আছে। তাকে কাজে নেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুপ্ত চক্র গড়ে তুলল ক্লদ।

শ্রমিকরা তাকে ঘিরে ধরল। তার বক্তব্য ওরা জানতে চায়। ক্লদ বলল,

'রেনো দালালিএর চেয়ে কী এমন ভাল? ওরা আমাদের পেছনে ছুরি বসাবে...' সে কাশতে আরম্ভ করল।

শ্রমিকদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'কাগজে তো লিখছে যে ওরা আমাদের রক্ষা করবে। ওরা বলছে সৈন্যবাহিনীর আর পিছু হটা উচিত নয়। আর অন্যদিকে পারীর বাইরে গড়খাই খুঁড়ছে ওরা। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

ক্লদ বলল, 'ওরা যদি সত্যিই প্রতিরোধ করতে চায়, তাহলে আমরা ওদের সঙ্গে আছি। প্রাণপণ খাটব। তাই না? ম্যিয়েজারের কিন্তু এতে কিছু যাবে আসবে না। রেনোই হোক আর হিটলারই হোক ও নির্বিবাদে পয়সা কামিয়ে যাবে। কিন্তু এই উড়োজাহাজগুলোকে আমি অন্য দৃষ্টিতে দেখি। আমরা পারীকে বোমার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারি। ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারি আমরা। সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওরা শুধু জিজ্ঞেস করে—আমাদের বিমান-বাহিনী কোথায়? জার্মানরা আমাদের আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর মেশিনগান চালাচ্ছে, কিন্তু একটাও লড়ায়ে-বিমান নেই আমাদের। আমরা সৈন্যদের যথাসম্ভব সাহায্য করব। ওরা শুধু পুলিশের চরগুলোকে হটিয়ে নিয়ে যাক এখান থেকে। এসব শয়তানদের মাঝখানে কাজ করা অসম্ভব। তাই না?'

শ্রমিকরা একটা প্রতিনিধি-দল নিযুক্ত করবে স্থির করল। তারা উৎপাদন বাড়াতে প্রস্তুত—একথা ঘোষণা করবে প্রতিনিধি-দল কিন্তু অন্যদিকে কারখানা থেকে ঐ গুপ্তচরদের সরিয়ে দেওয়ার জন্যে চাপ দেবে।

প্রতিনিধি-দল সাক্ষাৎ করতে গেলে বাইস ক্লদের দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে হাসল। বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। পারীর শ্রমিকদের দেশপ্রেমের কথা আমি ভাল করেই জানি। প্রত্যেকটা বাড়তি বিমান যুদ্ধজয়ের সময়কে আরও সংক্ষিপ্ত করে তুলবে। আপনারা যাদের ছদ্মবেশী পুলিশ বলছেন, তাদের কারখানায় পাঠানো হয়েছে ছদ্মবেশী কমিউনিস্টদের খুঁজে বের করার জন্যে। আমার বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছেন আশা করি।'

বাইসের নীল চোখের সঙ্গে ক্লদের চোখোচোখি হল। মুখ ফিরিয়ে নিল ক্লদ।

ম্যিয়েজারের কারখানার শ্রমিকরা চলে যাবার পর অন্যেরা এল। সমস্ত বড় বড় কারখানাই নিজেদের কাজের সময় বাড়াতে রাজী হল এবং পুলিশের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যে দাবী জানাল।

১১৪ জন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের হুম্‌কি জারী করা সম্পর্কে বাইস ম্যিয়েজারের সঙ্গে দেখা করতে এল। তালিকার দিকে নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে থেকে ম্যিয়েজার

বলল, 'এরা সবাই সুদক্ষ কারিগর! যাই হোক, তাতে কিছু যাবে আসবে না। ভাল কথা, শত্রুত্যাগের ব্যবস্থা কি হয়েছে বলুন দেখি।'

'সমস্ত মজুরকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। অরাজকতার সময় ওরা এখানে যত কম থাকে ততো ভাল।'

'ঠিক কথা। কিন্তু যন্ত্রপাতি সরাতে চাই না আমি। ভয়ানক হাঙ্গামার ব্যাপার, তাছাড়া কোন লাভ নেই ওতে।'

স্নাইস হেসে বলল, 'আতঙ্কগ্রস্ত হননি দেখে ভয়ানক খুশি হচ্ছি, মসিয় ম্যিয়েজার। এ পর্যন্ত যত লোক দেখলাম, কারুরই মাথার ঠিক নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে যন্ত্রপাতিতে আমরা হাতও দেব না।'

ক্লদের বন্ধুরা পর পর সতর্ক করে দিয়ে গেল। কারখানার ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গীরা তাকে উঁচু বেড়া ডিঙোতে সাহায্য করল। হঠাৎ হুইশিলের শব্দ এল কানে। ক্লদ পালাতে পালাতে এক পুরনো কাপড়ের ব্যবসায়ীর কুঁড়েঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। এক স্তূপ নোংরা কাপড়ের মধ্যে একজন বুড়ী বসে আছে। বুড়ী চিৎকার করে উঠল, 'প্যারাস্যুটিস্ট!' ক্লদ নম্র গলায় বলল, 'ভয় পেও না। আমি একজন ফরাসী, একজন মজুর।' বুড়ী তাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত হল। ঝড় উঠতে এখনো দেরী আছে। ছোট্ট কুঁড়েঘরের মধ্যে এক রাশ নোংরা কাপড়ের ভেতর ক্লদের শ্বাসরোধ হয়ে এল। তার সঙ্গীদের সতর্ক করে দেওয়া দরকার। বাইরে তাকিয়ে দেখল ক্লদ। কেউ কোথাও নেই। 'পের ওজেন' কাফে পর্যন্ত সে অগ্রসর হল, এইখানে তার সঙ্গীরা এসে জড়ো হয়।

দুটি ঘর নিয়ে এই কাফে। বাইরের ঘরে জিঙ্কের কাউণ্টার। এইখানে অনিয়মিত খরিদ্দারেরা এসে বিয়ার খায় আর মালিক 'পের ওজেন'-এর সঙ্গে আড্ডা জমায়। লোকটা মোটা আর ভদ্র প্রকৃতির, ঘন কালো গোঁফ, কোট পরে না। জীবনে দুটি মানুষের ওপর তার অনুরাগ। একজন তার স্ত্রী, মেদস্ফীত শরীর আর গোঁফ আছে মহিলাটির। অপর জন মোরিস তোরে। '১৯৩৭ সালে পুরস্কারদানের সেই সভার পর আমি মোরিসের কাছে গেলাম, তিনি করমর্দন করলেন।' কথাগুলো সে গর্বের সঙ্গে বলে। পের ওজেন জানে, পেছনকার ঘরে কমিউনিস্টরা মিলিত হয়। ও ঘরে কোন নতুন লোককে যেতে দেয় না সে। বলে, 'বিলিয়ার্ড ঘরটায় লোক আছে।' সেই সময়ে বিলিয়ার্ড টেবিলের ধারে বিভিন্ন

জেলার প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে পার্টির নির্দেশ আলোচনা করবার সময় বিলিয়ার্ডের কাঠি ধরে বসে থাকে পাছে কোন আগন্তুক এসে পড়ে।

ভেতরে ঢুকেই 'নোম' কারখানার জুল-এর দেখা পেল ক্লদ। পরে অন্যরাও এল। সবার মুখে গ্রেপ্তারের আলোচনা। সাত শো মজুরকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

একটু পরেই দেনিস এসে চারজনের বিচারের কথা বলল, 'ধ্বংসকার্যের অপরাধে ওদের চারজনকে গুলি করে মারা হবে। ওদের মধ্যে সব চেয়ে ছোটটার বয়স আঠারো বছর। ফেরনে ওদের পক্ষ সমর্থন করেছে। এইমাত্র কথা বলছিলাম ওর সঙ্গে। ওর ধারণা—ব্যাপারটা আগাগোড়া তৈরী করা। আদালতেই তা জাহির হয়ে গেছে। ফেরনে বাইসকে সন্দেহ করেছে।'

ক্লদ বলল, 'ভয়ানক সাংঘাতিক লোক ও! ওর সঙ্গে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম ও চোখ ঘোঁচ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আমি কে। আর ও যে কে তা বুঝতে আমারও বাকী থাকেনি। কী যে সব কাণ্ড করছে ওরা! দেশ শাসনের ভার আজ হিটলারের গুপ্তচরদের হাতে।'

ক্লদকে উৎসাহিত করতে চাইল দেনিস কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না।

ফিস ফিস করে বলল, 'কিন্তু জনসাধারণ......'

সে কি বলতে চাইছে ক্লদ বুঝল না কিন্তু কোন প্রশ্নও করল না।

হঠাৎ দেনিস বাইরে চলে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, 'ক্লদ, তোমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছি। ওখানে তোমার গায়ে হাত দেবে না কেউ।'

অন্ধকার, ছোট কাফেটা কেমন উষ্ণ আর নিরিবিলি। প্রত্যেকের কথা বলা থেমে এসেছে। মুহূর্তের জন্যে বিমান-বিধ্বংসী কামানের গর্জন তাদের কাছে বজ্রধ্বনি বলে মনে হল, কেমন একটা আনন্দ বোধ করল তারা। তারপর সাইরেনগুলো ককিয়ে উঠল। এতটুকু নড়ল চড়ল না কেউ। পরিশ্রান্ত হয়ে সবাই সরু সোফাটার ওপর বসে আছে আর ভাবছে আগামী নাটকীয় মুহূর্তের কথা।

জার্মানরা কি সত্যিই আসছে?

আধঘণ্টা পরে কান-ফাটানো সোঁ সোঁ শব্দ করে বৃষ্টি নামল একটানা। ক্লদ

নিশ্বাস নেবার জন্যে রাস্তার দিকে তাকাল। ম্যাঁ আর স্যা -র অরণ্য যেন পারীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্লেনগাছের পাতাগুলো দেখাচ্ছে ঠিক এক পাল ভেড়ার মত। সোঁদা মাটির গন্ধ উঠেছে।

দেনিস তার পেছনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ক্লদ, কবে যে ফ্রান্স.........' আবার দেনিসের কথাগুলো অসম্পূর্ণ থেকে গেল। ওজেন কিছু বিয়ার এনে হাজির করেছে।

'মিশোর কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র পেয়েছ ?' দেনিস জিজ্ঞাসা করল।

'বহুদিন কোন চিঠি পাইনি। উত্তরাঞ্চলের কোথাও সে আছে।'

ওজেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'চুলোয় যাক গে। ওরা তো ওখানে লড়ছে আর মরছে। কিন্তু এরা এখানে কী করছে ? কতগুলো নিরীহ লোককে গ্রেপ্তার করছে, এই তো! আর এই সব কাজ কারা করছে ? জার্মানীর গুপ্তচররা! মোরিস যদি মন্ত্রী হত তাহলে পারীর ত্রিসীমানায় পৌঁছতে পারত না জার্মানরা!'

পরে সন্ধ্যার দিকে বাইস গ্রঁদেলের সঙ্গে দেখা করে তার কাছে সারা দিনের ঘটনার বিবরণ পেশ করল।

বাইস বলল, 'মোটের ওপর প্রত্যেকটি জিনিস বেশ ভালই উৎরেছে। আমার মনে হয় এখন আমরা কারখানার সব চেয়ে হাঙ্গামাকারী লোকদের হটিয়ে দিতে পেরেছি। অবশ্য যত তাড়াতাড়ি লোকজন সরিয়ে ফেলা যায় ততই ভাল। সব চেয়ে ভাল কথা যে বিচারটা বেশ সহজে হয়ে গেছে। এবার বাছাধনরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'অবশ্য যদি দণ্ডটা ওরা রদ না করিয়ে দেয়। ফেরনে প্রেসিডেণ্ট লেব্রঁ্যর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। লেব্রঁ্য তার কথা শুনে কেঁদে ফেলল। ব্রতৈলের কথাই ঠিক, যত লোক তৃতীয় রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে ওই লেব্রঁ্যটাই সব চেয়ে ছিচকাঁদুনে। মোটের ওপর, ওর ব্যবহারটা অবশ্য খুব ভদ্র।'

'তার মানে ?'

'মানে, যা করা দরকার লেব্রঁ্য তাই করে। কাঁদা ছাড়া আর কিছুই করে না সে।'

তারা দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ল।

বাইস চলে গেলে গ্রঁদেল টাইটা ঢিলে করে সোফার ওপর শরীরটা এলিয়ে দিল। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছে, তার কাজকর্ম খুব চমৎকার এগোচ্ছে কিন্তু। তার ভাগ্যে কী আছে তা কি সে নিজেই ভাবতে পেরেছিল। সে যে কিলমানের সংস্পর্শে এসেছে এতো একটা দৈব ঘটনা। জুয়োখেলায় ক্রমাগত ক্ষতিস্বীকার ও আত্মহত্যার চিন্তার মধ্য দিয়ে এর শুরু। সে ভেবেছিল – এ একটা ভ্রম, মারাত্মক রকমের ভ্রান্তি, তার কুল-মর্যাদার কলঙ্ক। কিন্তু এই পথেই তার সাফল্যের সূত্রপাত হল। অবশ্য সে মাঝে মাঝে সঠিক পথের সন্ধান করেছে। অনেক বিপর্যয়, অপমান ও হীনতা মাথা পেতে নিতে হয়েছে তাকে সেজন্যে। তেসা—ঐ ছিঁচকে ঘুষখোর তেসাটা পর্যন্ত তার দিকে এমন ভাবে তাকাত যেন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা রাস্তার ছোঁড়াকে দেখছে। কুছ পরোয়া নেই, এই সমস্ত লোকদের মধ্য দিয়েই সে এগিয়ে যাবে। যখন জার্মানরা পারী দখল করবে, সর্বেসর্বা হয়ে বসবে সে। তখন সবাই খোসামোদ করবে তাকে। জুয়োখেলায় সব চেয়ে আসল কথা, সঠিক নম্বরটা আঁচ করতে পারা। আর ঠিক নম্বরটার ওপরই বাজী ধরেছে সে। এখন কেবল আরও কিছু সময় ধৈর্য ধরে থাকা। তারপরই শক্তি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। সবার মুখের ওপর নিঃসংকোচে তাকাতে পারবে সে। কিলমান? জার্মান মুদ্রা? চুলোয় যাক ওসব! ব্যক্তিগত স্বার্থে আগ্রহ নেই কারও। আসলে সে ফ্রান্সকেই রক্ষা করতে চলেছে। আত্মসমর্পণের শর্তে যথাসম্ভব অল্পে রাজী করাবে জার্মানদের এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন সম্ভব করে তুলবে। এই সত্যিকার দেশপ্রেম—দুকানের মত মূর্ছাগ্রস্তের প্রলাপ নয়!

কাউকে অপমান করে নিজেকে বড় করার ইচ্ছা পেয়ে বসল গ্রঁদেলকে। শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। চওড়া বিছানার ওপর শুয়ে আছে মুশ্। দীর্ঘ অসুস্থতা তাকে একেবারে ভেঙেচুরে ফেলেছে। গ্রঁদেল মনে মনে বলল, 'ভাবতেই পারি না, একে কোনদিন জড়িয়ে ধরেছিলাম!' গ্রঁদেলের চোখে মুশ্ আজ অর্ধ-মৃত। ওষুধের গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল তার। গ্রঁদেল বলল, 'তিন বছর আগে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে খেয়াল চেপেছিল তোমার। সে সময়ে আমি কিছু বলিনি। তুমি তাহলে হয়ত ভাবতে আমি তোমায় ঈর্ষা করছি। কিন্তু এখন আমরা নিঃসংকোচে কথা বলতে পারি। মনে হয় তোমার প্রেমিকদের সম্পর্কে এখন আর মাথা ঘামাও না তুমি। তোমার এখন পরলোকের কথা ভাবা উচিত। আমার চেয়ে একজন

অপদার্থ হতচ্ছাড়াকে পছন্দ হয়েছিল তোমার, কেমন? ওর বাবার চেয়েও ও হতভাগা। শ্রীমতী, ওর কোঁকড়া চুল আর সম্ভ্রান্ত ভাবভঙ্গী দেখে মজে গিয়েছিলে তুমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তোমার নাগর একজন ছিঁচকে চোর আর বেশ্যার দালাল। ভেবেছিলে—আমি অপদার্থ, সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক আর গুপ্তচর। ভয়ানক ভুল করেছিলে, শাহাজাদী! আমিই একমাত্র লোক যে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে।'

একটুও না নড়ে চড়ে মুশ্ যেমন ছিল তেমনি শুয়ে রইল। বালিশ থেকে মাথাটা ঝুলে পড়েছে তার।

'শাহাজাদী নির্বাক যে? কথা বলো না খুকী।'

মুশের বিবর্ণ ঠোঁটে ছোট ছোট বুদবুদ নজরে পড়ল—সদ্যজাত শিশুর ঠোঁটে যেমন দেখা যায়। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভ্রূভঙ্গী করে ঘর ছেড়ে চলে গেল গ্রঁদেল।

২৫

সন্ধ্যার দিকে সূর্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আর বিবর্ণ কমলালেবুর মত দেখাল সমুদ্রের শাদা শাদা কুয়াশা। বালিয়াড়িগুলো ঠিক চাঁদের মানচিত্রের মত দেখতে। চুলের হালকা ঢেউয়ের মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে বালির কণাগুলো। বালির স্তূপের সংলগ্ন শুকনো লতানে ঘাসগুলো প্রস্তরীভূত বলে মনে হয়। কাছেই সমুদ্র ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে—এইমাত্র ভাঁটা পড়েছে সমুদ্রে। বিস্ফোরণে জলের পশলা হাওয়ায় ছিটকিয়ে উঠছে; ফেটে যাওয়া গোলা পড়ে ফুলে ফুলে উঠছে সমুদ্রের জল। বোমাবর্ষণের নির্ঘোষ সত্ত্বেও, এই বালি-জলের পৃথিবীটা কেমন রহস্যময় আর নিষ্প্রাণ!

এই কুয়াশার দেওয়ালকে ছিন্নভিন্ন করে আর বালির স্তূপকে উড়িয়ে দিয়ে লুসিয়ঁ সমুদ্রকে কাছে ডেকে আনতে চাইছে যেন। নরম বালিতে বার বার হোঁচট খাচ্ছে সে। বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী কাছাকাছি কোথাও আছে, ঠিক কোথায় তা সে নিজেই জানে না। সমস্ত গুলিবারুদ শেষ হয়ে গিয়েছে। বর্তমান বিক্ষুব্ধ জীবনে একটিমাত্র হাতবোমাই তার অবলম্বন। হাত-বোমাটার দিকে সস্নেহে তাকাল লুসিয়ঁ—জলের শেষ বিন্দুর মত এই জিনিসটিও তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

গত এগারো দিন ধরে যুদ্ধ চলেছে। এমন কি মানচিত্রটার দিকে পর্যন্ত সে

তাকায়নি। এই তো সমুদ্র—এইখানেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি! তার সঙ্গীরা ডাকছে; কুয়াশার আস্তরণ ছাড়িয়েই বৃটিশ জাহাজের অবস্থিতি আর চ্যানেল পার হলেই প্রাণের প্রাচুর্য। এখান থেকে ফিরবার ইচ্ছা নেই তার। সারা দিন সে বৃটিশদের সঙ্গে কাটিয়েছে, আর চলে এসেছে তারপর। এখন এই অভিশপ্ত বালিয়াড়ির মধ্যে সে একা।

যুদ্ধের সেই প্রথম দিন থেকেই লুসিয়ঁ মৃত্যুর খোঁজ করছে। প্রাণপণ করে মৃত্যুর সন্ধানে ঘুরেছে সে। মেশিনগানের গোলাবর্ষণের মধ্যে দিয়ে সে যাতায়াত করেছে, হাত-বোমা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ট্যাঙ্কের পিছু পিছু গিয়েছে, এক বেলজিয়ান জোতদারের বাড়ীর ছাদের ঘর থেকে জার্মান প্রহরীকে গুলি করেছে। কিন্তু মৃত্যু যেন ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে গেছে। সে কথনো সংবাদপত্র পড়ে না। একদিন টমেটো-মোড়া এক টুকরো কাগজের ওপর চোখ বুলিয়েছিল। তাতে এই কথাগুলো পড়েছিল সে: যন্ত্র-সজ্জিত যোয়ান অফ আর্ক আমাদের সাহায্য করবে।' কাগজের টুকরোটা সে উড়িয়ে দিয়েছিল, এতটুকু অভিযোগ করেনি পর্যন্ত। তার সঙ্গীরা 'বিশ্বাসঘাতকতা' কথাটা নিয়ে গলাবাজি করে। কেউ কেউ জার্মানদের গাল দেয়, কেউ বা ইংরেজদের আবার কেউ বা ফরাসী জেনারেলদের। লুসিয়ঁ কোন কথা বলে না, মাঝে মাঝে সে অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে:

'এই যে রে তোর খাটিয়া আর এই যে তাতে বিছানা তোর পাতা,
সাঁই করে এক শব্দ হবে, ফাটবে বোমা, গুঁড়োবে তোর মাথা।'

বেলজিয়ানরা আত্মসমর্পণ করেছে তাহলে? জাহান্নমে যাক ওরা! যুদ্ধজয়ে লুসিয়ঁর আস্থা নেই; গোপন কাগজপত্র কি ভাবে ব্রতৈলের কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে কথা মনে পড়ল তার; তার বাবা আর জেনারেল পিকারের পক্ষে যে-কোন কাজ করা সম্ভব। গোটা দলটাই হিটলারের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়েছে। অর্থাৎ এইখানেই সব কিছুর সমাপ্তি। অতীতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মৃত্যু কামনা করেছে লুসিয়ঁ। তলদেশ স্পর্শ করে দেখেছে, এখন সে সাঁতরে পার হয়ে যেতে চায়। কিন্তু অনুরক্ত ও পরাজিত বাহিনীর সৈনিকের পক্ষে বেপরোয়া সাহসিকতাই একমাত্র পথ। বিপদ এসে ব্রতৈলের জাল থেকে মুক্তি দিয়েছে লুসিয়ঁকে, ডলার ও যৌবনের সমস্ত কলঙ্ক—যে কলঙ্কের উপর বিষণ্ণ ভাঁড়ামির ছাপ, তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে গেছে। গত দশদিন ধরে একটিমাত্র চমকপ্রদ ঘটনাই তাকে আলোড়িত করেছে। তা

হল অভিনেতা জঁতোইএর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। পারীতে জঁতোই-এর নাম কে না জানে? দেবতাদের প্রিয়পাত্র সে, সুদর্শন, খুব একটা প্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও সবাইকে হাসাতে পারে, ভালভাবে থাকতে পারে, ইচ্ছেমত পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে—যেন জীবনটা তাসের টেবিলের সবুজ মেঝের মত; ছোট্ট পাখীর শস্য-কণা আহরণের মত অত্যন্ত সহজে সে মেয়েদের যৌতুক ও বিধবাদের সঞ্চয় হাতের নাগালের মধ্যে খুঁজে পায়। আর এখন সে ট্যাঙ্কচালকে রূপান্তরিত হয়েছে। আটটি ফরাসী ট্যাঙ্ক শত্রুপক্ষের ঘাঁটি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল, কিন্তু পেট্রল ফুরিয়ে যাওয়ায় সেখানেই থামতে হল তাদের।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা শত্রুদের প্রতিরোধ করল। তারপর সকালের দিকে সাহায্য এল। পাঁচটি ট্যাঙ্ক পুড়ে গিয়েছে। কোনমতে বেঁচে গিয়েছে জঁতোই। সর্বাঙ্গ কালো হয়ে গিয়েছে তার। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে নিরুত্তর রইল। তাকে দেখে আঁরির কথা মনে পড়ল লুসিয়ঁর—কয়েকটা মুহূর্ত একটা মানুষের জীবনে কী রূপান্তরই না আনতে পারে!

জীবনটা অনেক সহনীয় হয়ে এল লুসিয়ঁর কাছে; সঙ্গীদের সঙ্গে নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠ করে আনল সে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কিছু না ভেবেই একাধিকবার সে তাদের রক্ষা করতে অগ্রসর হল। সমুদ্র দেখে ভয়ানক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লুসিয়ঁ। তার প্রথম প্রতিক্রিয়াই হল: 'এবার আলক্রে রক্ষা পাবে।' কিন্তু আলক্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? সে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক, বুড়ো ভূত আর নির্বোধ, আর ন্যায়নীতিতে আস্থা রাখে। লুসিয়ঁ মনে মনে বলল, 'না, এইভাবে দেখাটা ঠিক নয়। আলক্রে সত্যিই ভাল লোক।' এর আগে এই সহজ কথাগুলো মাথায় ঢুকত না কোনদিন; তখন সে মানুষকে বিচার করত তার মেধা, দীপ্তি আর প্রতিভা দিয়ে আর এখন 'ভাল লোক' সম্পর্কে কথা বলছে সে। হঠাৎ লজ্জিত বোধ করল লুসিয়ঁ; মনে পড়ল কেমিস্টের দোকানের বাইরে জিনেত্তের চোখ, মুশের যন্ত্রণাকাতর কান্না আর জেনীর শোবার ঘরের বিরাট বিছানা যা দেখে গিল্টি-করা শববাহী গাড়ীর কথা মনে হয়।

সৈন্যবাহিনীর বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলগুলো সমুদ্রতীরে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখছে। আজ শহরত্যাগের শেষ দিন। সমুদ্রতীরের বালির স্তূপের মধ্যে ছোট ছোট সংঘর্ষ চলছে; যোদ্ধারা বালিয়াড়ির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে পরস্পরের

কাছে আসছে, তারপর আক্রমণ করছে হাত-বোমা, বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে। ইতিমধ্যে কুয়াশার শাদা শাদা স্তম্ভগুলো সূর্যের আলোয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল।

লুসিয়ঁ একটা বালির স্তূপের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। দূরে সমুদ্রতীরের জল-সিক্ত বালিয়াড়ি। অর্ধনগ্ন লোকেরা হামাগুড়ি দিয়ে ডুব দিচ্ছে জলে। তাদের মধ্যে অনেকেই বুলেট-বিদ্ধ হয়েছে। অসংখ্য মাছের উল্লাসের মত ফুলে ফুলে উঠেছে সমুদ্র। আরও দূরে গোলা পড়ে জলের ফোয়ারা উঠেছে। একমাত্র বেপরোয়া সাহসিকতাই বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষকে। অন্যেরা আরও অসমসাহসী ও মরিয়া হয়ে বালির স্তূপের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করছে। এদিকে জার্মান বোমারুরা বোমা ফেলেছে সমুদ্রতীরে ও জলের ওপর। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে; কেমন ঘোলাটে আর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে সমস্ত সমুদ্র।

শুকনো ঘাসের মধ্যে লুসিয়ঁ একটা হেলমেট নড়ে উঠতে দেখল; জার্মান সৈন্যরা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। হাত-বোমাটা ছুঁড়ে লাফিয়ে চিৎকার করে উঠল লুসিয়ঁ। বালির স্তূপগুলো সশব্দে ফেটে পড়ল আর তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে যেতে কামানের গর্জনের মধ্যে মিশে গেল। একজন জার্মান এগিয়ে এল তার দিকে। লুসিয়ঁও বালিতে হোঁচট খেতে খেতে ছুটল। তারপর একই সঙ্গে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, যেন আলিঙ্গন করছে।

ঐ জার্মান লোকটিকে কি করে পরাস্ত করল মনে নেই লুসিয়ঁর। এইটুকু তার মনে আছে যে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল তার—হাত দিয়ে তার গলাটা টিপে ধরেছিল ঐ লোকটি। সরু হলেও তার হাতটা বেশ সবল, শিরাগুলো ফোলা ফোলা। লুসিয়ঁ হঠাৎ মনে মনে বলল, 'লোকটা নখ কাটেনি!' কিন্তু লোকটার মুখের দিকে সে তাকিয়ে দেখেনি পর্যন্ত। চুলোয় যাক ও!

কিন্তু এখন শেষ হাত-বোমা পর্যন্ত ফুরিয়ে গিয়েছে। ভিজে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল লুসিয়ঁ—অনেক দূরে সরে গিয়েছে সমুদ্র। ভাবল, অতদূর কক্ষনো যেতে পারবে না সে। তারপর জলে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। নিজেকে সে রক্ষা করতে চাইছে না: বুলেট আর গোলার কাছাকাছি

এগিয়ে যাচ্ছে সে। পরিশ্রমের ব্যথায় অর্ধেক খোলা আছে তার মুখটা। আর তার বাদামী চুলগুলো ঝলসে উঠছে আগুনের মত।

মৃত্যু আবার সরে গেল তার কাছ থেকে; সাঁতার কাটতে কাটতে লুসিয় একটা বৃটিশ মোটর-বোট পর্যন্ত পৌছল। তারা তাকে এক জোড়া ট্রাউজার আর এক বোতল হুইস্কি দিল। পান করতে করতে অভিশাপ দিল লুসিয়—স্বপ্ন কেটে গিয়েছে। একজন ইংরেজ ছেলেমানুষি হাসি হেসে ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে বলল, 'এই যুদ্ধ জিততে হবে আমাদের।'

লুসিয় মাথা নাড়াল। মনে মনে বলল, 'বাঁচতেই হবে। এই পথই সহজ। সহজ আর অনেক বেশী কষ্টকর।'

২৬

প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে পরস্পর কানাকানি করল। আনের প্রশান্তির কারণ খুঁজে পেল না তারা। কিছু লোক প্রশংসা করে বলল, 'একটা সবল চরিত্র বটে!' কেউ কেউ পরোক্ষে নিন্দা করাই পছন্দ করল, 'স্বামীর জন্যে ও এতটুকুও তোয়াক্কা করে না।' পড়ার খাতা পরীক্ষা করে, গাছের পাতা আর ফুলের কেশর এঁকে, ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে আর দুদুর জন্যে ছোট ছোট পায়জামা বুনে আনের সময় কাটতে লাগল। সরকারী হলদে খাম তার হস্তগত হওয়ার পর আনের জীবনে যেন কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। ওরা তাকে ছয়শো ফ্রাঁ (উপার্জনকারীর মৃত্যুতে তার প্রাপ্য স্বরূপ) দিয়ে বলল, 'রসিদে সই করো।' আনের কলম এতটুকু কাঁপল না, চোখ দিয়েও জল পড়ল না এক ফোঁটা। দুদু বারবার জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায়। আনে জবাব দিল, 'শিগ্‌গিরই আসবে।' সকালে দুদুকে মেলানির কাছে নিয়ে যায় সে, আনে স্কুলে গেলে সেই তাকে দেখাশোনা করে। দুদুকে দেখে প্রায়ই কান্না পায় মেলানির। দুদু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কাঁদছ কেন?' সে উত্তর দেয়, 'দাঁত ব্যথা করছে।' আনে কোনদিন কাঁদে না। অতীতে পিয়েরই একমাত্র তার চরিত্রের সবলতা বুঝত, বলত, 'বুলেটের মুখোমুখি হতে পারবে ও।' শোক আর নিঃসঙ্গতা তার চেহারাকে পর্যন্ত বদলে দিয়েছে; তার দয়ার্দ্র ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটো কেমন কঠিন হয়ে গেছে আর আগে যেখানে সে কুঁজো হয়ে চলত, এখন মাথা উঁচিয়ে চলে। বুড়ীরা কথা

বলাবলি করে, 'বসন্তের ডেজি ফুলের মত ফেটে পড়ছে ও। দেখে নিও, শিগগিরই ও আর একটা স্বামী পাকড়াবে।'

এমন কি রাত্রেও আনে কাঁদে না। চোখ খুলে ঘুমের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় শুয়ে থাকে; যা ঘটে গেছে তা বুঝবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। পিয়ের কিসের জন্যে প্রাণ দিল? এই চিন্তা তার মনে তোলপাড় করে। আনের মনে পড়ে—তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে উত্তেজিত তর্ক হত। রাজনীতিতে পিয়েরের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ও বিপ্লবে বিশ্বাস করত আর স্পেনের প্রতিটি শহরের পতনে যন্ত্রণায় ছটফট করত। আনে ওর সঙ্গে একমত না হলেও এটুকু বুঝত যে ওর প্রকৃতি অত্যন্ত উৎসাহপ্রবণ আর সে জন্যে সে ঈর্ষা বোধ করত। পিয়ের স্পেনে যাবার পর আনে কেমন বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে উঠেছিল, দরজা ঠোকার শব্দের জন্যে অপেক্ষা করত আর মনে মনে বলত, 'ও মারাও যেতে পারে।' তারপর যুদ্ধ এল আর ও চলে গেল কোন কোন কথা না বলে আশাহত হয়ে, হতভাগ্য মানুষের মত। স্টেশনে ও আনেকে বলেছিল, 'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়।' আর এখন অপরের যুদ্ধে কিনা তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ওর শেষ চিন্তার কথা মনে মনে আঁচ করতে চেষ্টা করে আনে। আনে এবং তুতু? কিংবা অন্য যুদ্ধ, 'সত্যিকার' যুদ্ধের কথা? নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া করার, বুঝবার আর ন্যায়কে সন্ধান করার ব্যর্থ চেষ্টা করে আনে। সে উঠে দাঁড়িয়ে তুতুর দোলনার কাছে যায় আর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুতুর নিশ্বাস-পতনের শব্দ শোনে। আচ্ছা, ওরা যদি তুতুকেও হত্যা করে? যে জীবন সে ফেলে এসেছে সেই বসন্ত-দিনের একমাত্র অবলম্বন তুতু।

কিন্তু প্রতিদিন সকালে সে অনেক সবল আর সতেজ হয়ে ক্লাশে যায়, তার রাত্রি-গুলি কিভাবে কাটে এতটুকু বুঝতে পারে না কেউ।

আনের এই সাহস সহজাত। কঠিন পরিশ্রম, জীবন-সংগ্রাম আর প্রিয়-জনের মৃত্যুতে অভ্যস্ত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এ জিনিস সে আহরণ করেছে; পারীর উপকণ্ঠের ঘরগুলোর মত আনের পূর্ব-পুরুষরাও রাস্তার যুদ্ধের ধোঁয়ার মধ্যে জারিত হয়েছে। তার বাবা আনেকে বলত, যুদ্ধের সময় সে সারা দিন কাজ করেছে, পায়জামা জোড়া লাগিয়েছে, লাইটার বানিয়েছে, জোতদারের বাড়ীর জানলার ফ্রেম মেরামত করেছে আর ঘাস বোঝাই করেছে গাড়ীতে। আর তারপর হেসে বলত, 'বুঝলে, এই করে টিঁকে ছিলাম আমি।' ঠিক এ ভাবে আনেও নিজের জীবিকা চালাচ্ছে।

পথে পথে আশ্রয়প্রার্থীদের আবির্ভাব আর বোমা-বিধ্বস্ত গাড়ীতে শিশুদের ভীড় দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল আনে। পিয়েরের মৃত্যু বা ছুহুর আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে চিন্তিত হয়নি, কিন্তু তবু ভীত না হয়েও পারেনি। বিধ্বস্ত যন্ত্রটা তার যন্ত্রণা-ভারাক্রান্ত রাত্রিগুলির নিরবিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছিল তার মনে। আবার বাড়ীর জানলাগুলো সরু সরু কাগজের ফালিতে ছেয়ে গেল। একটা জটিল নক্‌সা সৃষ্টি করল আনে। তার জানলা দেখে মনে হল যেন তার সর্বাঙ্গ শিশিরে ঢেকে গিয়েছে—গোলাপ ফুল, তারা আর পামগাছের সমারোহ। ছুহু জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি?' আনে বলল, 'উড়োজাহাজ' আর তারপরই যোগ করল, 'ফুলের বাগান।' পিয়েরের ছোট বেলায় লেখা একটা কবিতা মনে পড়ল আনের, কবিতাটা তাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল পিয়ের:

মৃত্যুর মুহূর্তে দেখা ভাগ্যের সে লতাজালখানি—
হেমন্তের জীর্ণ হাতে গেঁথে তোলা যৌবনের গ্লানি।

দিনগুলো গড়িয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে আরও আশ্রয়প্রার্থী এসে ভীড় করল পারীতে। তাদের মধ্যে আছে লিলের অধিবাসী, ভালেঁসিয়েনের তাঁতী, লেঁ-র খনিমজুর আর পিকার্ডির চাষী। যে স্কুলে আনে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে সেই স্কুলবাড়ী তাদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হল এবং আনে মনপ্রাণ ঢেলে দিল তার এই নতুন কাজে। ছুহুকে নিয়ে স্কুলবাড়ীতে এসে আশ্রয় নিল। পীড়িতদের সেবা, খাবার আর ওষুধ দেওয়া, রান্না করা সবই করতে লাগল সে। একটা বিরাট পরিবারকে দেখা শোনা করছে যেন, তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে আর মন দিয়ে শুনছে তাদের দীর্ঘ অসংলগ্ন গল্প। ফুরমি-র এক মহিলা তাকে এ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলেছে, 'ঠিক সাতটা তখন। কি জানি জার্মান উড়োজাহাজ কখন এসে পড়বে।' বাদামী রক্ত-রাঙা একটা কাঁথা আছে মহিলাটির কাছে, কাঁথাটা কখনো সে হাত-ছাড়া করেনি। মহিলাটি বলেছে, 'ও তখন পরিজ খেতে বসেছে। শয়তানের দল!' এক বেলজিয়ান মহিলা—খনি মজুরের বৌ—আনেকে বলেছে, কি করে পথে আসতে আসতে তার পাঁচ বছরের মেয়েকে হারিয়েছে সে। রুবের এক বুড়ো তার পুত্রবধূ আর নাতীদের তল্লাসে ফিরছে। আনে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তোমরা চলে এলে কেন?' কেউ কেউ বলেছে, 'সে ভয়ানক অবস্থা। জার্মান বোমারুরা খুব নীচু থেকে একেবারে আমাদের মাঝামাঝি বোমা ফেলতে লাগল।' অন্যেরা বলেছে, 'জার্মানদের রাজত্বে থাকব? না, পুরনো অভিজ্ঞতা আছে আমাদের। গত যুদ্ধে চার বছর তাদের শাসনে কাটিয়েছি। পারীর লোকরা

কিছু জানে না বটে কিন্তু আমরা জানি। গত যুদ্ধে রুরের জার্মানরা যুদ্ধ-বন্দীদের গুলি করে মারত। আমাদের এলাকায় ওরা দুটো লোককে গ্রেপ্তার করে তাদের নিজেদের কবর খুঁড়তে বলেছিল। আর এমনিভাবেই প্রাণ দিল তারা। শিশুদের ওপর ওরা এতটুকু দয়ামায়া দেখাত না। অপদার্থ শয়তান কোথাকার! কোন কোন আশ্রয়প্রার্থী খোলাখুলিই বলেছে, 'আমারা দেখলাম প্রত্যেকে পালিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমরাও চলে এলাম।' একজন মজুরনী বলেছে, 'শহরে বেরজের এসে হাজির হল। আমরা সবাই জানি, ও লোকটা ফ্যাশিস্ট। ও চিৎকার করে বলল, যত তাড়াতাড়ি পার পালিয়ে যাও! না গেলে একেবারে মারা পড়বে। কিন্তু জার্মানদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ও নিজে ওখানে থেকে গেল। বিশ্বাসঘাতক!'

আশ্রয়প্রার্থীরা ক্রমেই বদলে বদলে যাচ্ছে। এক-একটা দলকে দক্ষিণাঞ্চলে পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দল এসে উপস্থিত হচ্ছে। একমাত্র বুড়ো রিকে থেকে গেল। লোকটা অসুস্থ, কোন মতে পারী পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছে। সে আনেকে বলল, 'অনেকদিন হল বুড়ী মারা গেছে। আমার ছেলেটাকেও ফৌজে নিয়ে গেছে। জানি না ও বেঁচে আছে কিনা। আমি তো একাই থাকতাম। সব পড়শীরা বলল—ঐ হারামজাদারা আসছে। চল, চলে যাই। আমার এমন ভাল খরগোস ছিল, সে সব ফেলে আসতে হল। কিন্তু আমার কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে এল, খাসা কুকুর কিন্তু। ওর নাম ফোলেৎ। বারো বছর থেকে ও আমার সঙ্গে আছে, একেবারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কঁপিএঞ-এ ওরা আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দিল। পায়ে হেঁটে আসতে হল। ঠিক আমাদের মাঝখানে বোমা ফেলল হারামজাদারা। গত বছরেও ঠিক এমনি করেছিল। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমি যখন চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফোলেৎকে দেখতে পেলাম না।'

আনে বহুবার লক্ষ্য করেছে, বুড়ো লোকটা যখন ঝিমোয় তখন তার ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে আর সে ফোলেৎকে ডাকে।

চমৎকার এক গ্রীষ্মের দিনে বোমারুরা পারীর উপর উড়ে এল। সমস্ত আকাশটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল গর্জনে। ঝন ঝন করে উঠল জানলার কাঁচগুলো। দুদু চিৎকার করে উঠল, 'বুম-বুম!' আনে আলু ছাড়াচ্ছিল। সে মুহূর্তের জন্যে ছুরিটা রেখে দিল, তারপর আবার মন দিল কাজে। তৎক্ষণাৎ লোকে ছুটতে ছুটতে ভেতরে এসে ঢুকল। 'দু-হাজার লোক মারা গেছে।' তারা খবর দিল।

আনে ভীত হয়ে হুহুকে হাতের মধ্যে তুলে ধরল। ভয় হল, এই লোকগুলো মেরে ফেলবে না তো হুহুকে? সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা পেল আনে। মনে মনে বলল, 'এখন আর আমার ভয় পাবার কি আছে?'

সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে বেড়াতে বার হল আনে। একটা বিরাট বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের কাছে একদল লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে; উষ্মা প্রকাশ করছে আর ঠাট্টাতামাসা করছে। কে একজন বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'যাই বলো, কী নিখুঁত লক্ষ্য দেখেছ!' জীবনটা যেন তার বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত হয়ে গেছে—পাথর, লোহা, কাঠ আর থাম। কার একজনের সই করা চামড়া-বাঁধা একটা বই আনের নজরে পড়ল। একটা দাঁড়ানো দেওয়ালের গায়ে বিয়ের পোষাক পরা কোন এক মহিলার ছবি। হঠাৎ শিশুদের দোলনা দেখতে পেল আনে—বারান্দার রেলিং-এর ওপর ঝুলছে। সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীর পাশে এক কাফেতে বসে লোকেরা মনের আনন্দে হাসছে, আর শত শত মদের পিপের বেঁকা নলগুলো ঝলমল করছে নীল আকাশের মত।

সে রাত্রে আনে আবার পিয়েরের সাক্ষাৎ পেল। বুঝল, ও আর কিছু ভাবছে না; অসুস্থ, শীত-শীত আর কেমন ফাঁকা বোধ করছে ও। পিয়েরকে উষ্ণ করে তুলতে চাইল সে কিন্তু পারল না; বিছানায় এদিক-ওদিক নড়ে চড়ে নিজের মনে মনে প্রলাপ বকল। ভোর হওয়ার আগেই গর্জন করে উঠল বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলো। আর হুহু ঘুমে বিড় বিড় করে বলল কতকগুলি সরল ছেলেমানুষি কথা।

২৭

প্রচণ্ড উৎসাহে ঘুম থেকে উঠল তেসা।

জোলিওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাড়ম্বরে বলল, 'ওয়েগ্যাঁর সৈন্যবাহিনীর কাছে ওরা ছাতু হয়ে যাবে। তুমি কাগজে লিখতে পার যে সবেমাত্র একটা বিরাট যুদ্ধের সূচনা হয়েছে।'

জোলিও বলল, 'কথা বলা অনেক সহজ—কিন্তু আসলে ওটা প্রশ্নই নয়। আপনি উপহাস করতে পারেন কিন্তু আমি যে গোঁড়া একথাটা কোনদিন গোপন করিনি। ভগবানের নামে বলছি ওরাই তো জার্মানদের ডেকে এনেছে। 'ওরা আসবে!'

'ওরা আসবে!' কথাটা কতবার বলা হয়েছে ভাবুন তো। আর এখন সত্যিই ওরা এসেছে।'

'ওসব বুড়ীদের কথা। ওরা যে আসেনি—এই সত্যি কথাটা মেনে নিয়েই কাজ আরম্ভ করা যাক। এখন সম্-এর ধারে যুদ্ধ চলছে।'

'হতে পারে। জায়গাটায় যাইনি কোনদিন। কিন্তু একটা কথা খুব ভাল করেই জানি যে গতকাল ওরা মার্সাই-এর ওপর বোমা ফেলেছে। ব্যাপারটা বুঝলেন? মার্সাই ফ্রান্সের অপর এক প্রান্তে। কে ভাবতে পেরেছিল ওদের এতটা সাহস হবে? ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে কাল কিংবা পরশু ইতালিয়ানরা আক্রমণ শুরু করবে। আর ওয়েগ্যাঁ তার সৈন্যবাহিনীকেও ইতালিয়ান সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখন সম্ নিয়ে কি আঙুল চুষব আমরা?'

নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে হাত নাড়ল তেসা। তারপর ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইতালিয়ান রেডিওর ঘোষণা শুনেছ?'

'ঘণ্টাখানেক আগেই শুনেছি। ওরা কিন্তু একেবারে নীরব। মানে, ওরা পম্পেইর চিত্রের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছে। লক্ষণ সুবিধার নয়।'

'চিত্র?' তেসা হাসল, 'ঠিক ভীইয়ারের মনের মত জিনিস। হ্যাঁ ভাল কথা, 'শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাটি' তার মালপত্তর বাক্সবন্দী করে ফেলেছে। মনে হয় কেটে পড়বার তালে আছে ও। আচ্ছা, বিদায়! সন্ধ্যাবেলা এসে একবার দেখা কোরো আমার সঙ্গে। কিছু ভাল খবর দিতে পারব হয়ত।'

তেসা মনে মনে মন্ত্রীসভার আংশিক পুনর্গঠন সম্পর্কে চিন্তা করছিল।

সবেমাত্র সে 'রিগোলেত্তো' থেকে একটা সুর শিস দিতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় পিকার্ এসে হাজির—একরকম অনাহূত হয়েই। তেসা তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়েই বুঝল, ব্যাপারটা সুবিধার নয়। পিকার্ বলল, 'জার্মানরা সম-এর প্রতিরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। রুয়েঁর দিকে এগিয়ে আসছে ওদের ট্যাঙ্কবাহিনী। দু-তিন দিনের মধ্যে সমস্ত কিছু নির্ধারিত হয়ে যাবে।'

তারপর বলল, 'একমাত্র পাগলরাই প্যারী প্রতিরোধ করার কথা ভাবতে পারে।'

তেসা মাথা ঝাঁকুনি দিল। কেমন বিষণ্ণ আর গম্ভীর দেখাল তার মুখখানা।

ঠিক এমনি মুখভঙ্গী করেই সে মন্ত্রী বা সেনেটরদের শবযাত্রায় যোগদান করে। নীরবে পিকারের করমর্দন করল। জেনারেল চলে যাবার পর তেসা মনে মনে বলল, 'এই মুহূর্তগুলি মারাত্মক! আমরা আলোচনা করেছি, চিন্তিত হয়েছি আর আশা করেছি আর এখন শেষ অঙ্কের অভিনয় প্রত্যক্ষ করছি।' তার এই উপলব্ধিকে অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইল সে কিন্তু আতঙ্ক সৃষ্টি করাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

মন্ত্রীদের সভায় পৌঁছনোর পর তেসা ফ্রান্সের ভাগ্যর কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল। মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কতকগুলি নিয়োগ যে অত্যন্ত সার্থক হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৈদেশিক নীতি যে বোদুয়াঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এটা সত্যিই একটা কাজের মত কাজ। গুপ্তচর বিভাগের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হয়েছে তেসার বন্ধু প্রুভস্ত। অন্যদিকে দেল্‌বর নিয়োগে সে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এ নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত—সবাই জানে দেল্‌ব ফুজের বন্ধু। তার চেয়েও বেশী বিরক্ত হল সে দ্য গলকে জাতীয় প্রতিরোধ বিভাগের সহকারী সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত হতে দেখে। স্রেফ পাগলামি! দায়িত্বশীল পদে একজন দুঃসাহসীকে বসানোটা কী বিপজ্জনক!

তেসা নিজের চিন্তার মধ্যে এতটা ডুবে আছে যে অন্যদের কথায় কর্ণপাত করছে না। ওরা ফ্রন্টের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছে। পিকারের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তেসা রেনোকে বলল, 'আপনি কিসের ওপর ভরসা করছেন?'

রেনো বলল যে ম্যাজিনো লাইন আর ইতালিয়ান ফ্রন্ট থেকে নতুন সৈন্য আসছে। বৃটিশরা কিছু ডিভিশন পাঠাবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গত কাল রেনো নিজে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছে।

তেসা বিরক্ত হয়ে ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'আমার বক্তব্য হল, জার্মানরা যখন পারীতে এসে পৌঁছবে তখন কী করবেন আপনি?'

রেনা উত্তর দিল, গভর্নমেন্টকে তুর-এ স্থানান্তরিত করা হবে, দরকার হলে সেখান থেকে বোর্দোয় নিয়ে যাওয়াও যেতে পারে।

'আর তারপর?'

'সে রকম অবস্থায় পড়লে আলজিয়ার্স-এ চলে যাব। আমাদের হাতে নৌবাহিনী আর উপনিবেশ আছে।'

তেসা নিরুত্তর রইল : পাগলের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আসলে এ একটা গবর্নমেণ্টই নয়, আত্মহত্যা সমিতি মাত্র। ব্রতৈলই তেসাকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু সে তা করবে না। 'মন্ত্রশিষ্য'দের ইস্তাহারের কথা মনে পড়ল তেসার, সে চোখ বুজল—কেমন ভয় হচ্ছে তার।

তেসা তবু ব্রতৈলের সঙ্গে দেখা করতে গেল : দুশ্চিন্তার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। ব্রতৈলও যদি তাকে সাহায্য না করে তাহলে ফুজের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়ায় আসবে সে—কিংবা আমেরিকায় চলে যাবে।

স্থির হয়ে লেখবার টেবিলের ধারে বসে আছে ব্রতৈল। কেমন ঋজু আর উদ্ধত দেখাচ্ছে তাকে, যেন 'পোজ' করে আছে।

সেদিন সকালে একটা বিশ্রী ঘটনা হয়ে গেছে তার স্ত্রীর সঙ্গে। চোখের জলে ফেটে পড়ে তার স্ত্রী বলেছে, 'জার্মানরা পারী অধিকার করবে। এইই তো তুমি চেয়েছিলে ! পশু !' রাজনৈতিক শত্রুদের আঘাতে ব্রতৈল বিচলিত হয় না ; সে জানে দুকান আর ফুজে সমস্ত দোষ তার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। যেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা যে একটা অপরাধ এ সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক করে দেয়নি ব্রতৈল ! কিন্তু যে স্ত্রী তার ছেলের স্মৃতি মনে পড়ায় চিৎকার করে উঠেছে, 'তুমিই তাকে খুন করেছ ! সবাইকে খুন করেছ তুমি !' তাকে সে কী উত্তর দেবে !

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল ব্রতৈল। আত্মসমর্পণ, শান্তি...... কিন্তু তারপর ? গতকালকার শত্রুরা কি বুঝবে যে ফ্রান্স ঠিক আলবানিয়া বা এমন কি চেকোশ্লোভাকিয়ার মতও নয় ? হয়ত বুঝবে না ওরা : কারণ ওরা আলাদা জাতের মানুষ, সম্পূর্ণ আলাদা মানসিক গঠন ওদের। তার পরেই পরিসমাপ্তি। লোরেন, তার আপনার দেশ লোরেন জার্মানীর হাতে তুলে দেওয়া হবে ! আগামী যুগের মানুষ ব্রতৈলের নামকে অভিশাপ দেবে। ওদের চোখে ঐ ভাঁড় দুকানটাই হবে প্রধান নায়ক।

সামনের দিকে না তাকিয়েই ব্রতৈল বহু বছর কাটিয়ে এসেছে। একটিমাত্র উপলব্ধি যা তার মনকে প্রভাবান্বিত করেছিল তা হল পপুলার ফ্রণ্টের প্রতি ঘৃণা। হিটলার, মুসোলিনী ও ফ্রাঙ্কোর সাফল্য তার কাছে নিজের সাফল্য বলে মনে হয়েছিল। বেনেস যে এখন আর প্রাগে নেই এতে রীতিমত খুশি হয়েছিল সে। এবং ওলন্দাজ সরকারের সাম্প্রতিক

ঘোষণা শুনে সে এই ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল যে গোল্লায় ডেমোক্রাটরা আবার পিছু হটছে।

তাহলে হঠাৎ সে এত অস্থির হয়ে উঠল কেন? ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্নায়বিক। তাকে নিজেকেই সমস্ত কিছু শাসন করতে হবে। এবার সমস্ত সরকারী কর্তৃত্ব তারই হাতে আসবে। এই পার্লামেন্টকে ভেঙে দেবে সে; শান্তি ফিরিয়ে আনবে। অনেক অসম্মান, দুঃখ ও চোখের জল দিয়ে মূল্য দিতে হবে এর। তবুও এই নতুন ফ্রান্স—হোক সে শোকসন্তপ্তা বিধবা বা কৃচ্ছ্রসাধিকার মত—'বিদূষক মারিয়ান'-এর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর মনে হবে তাকে।

তেসা যখন এসে পৌঁছল তখন স্ত্রীর ভর্ৎসনা আর নিজের ভীরুতার কথা সমস্তই ভুলে গিয়েছে ব্রতৈল। কেমন নিরুৎসাহ ও উদাসীন দেখাচ্ছে তাকে।

'ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' তেসা চিৎকার করে উঠল। 'ঐ আহাম্মুকটা ম্যাডাগাস্কারে যাবার প্রস্তাব করছে—সেখানকার অগম্য জঙ্গলগুলোয় ঘুরবার লোভ আছে ওর। কিন্তু এদিকে জার্মানরা রুয়েঁতে এসে পৌঁচচ্ছে। আমাদের একটা কিছু করতেই হবে। অত্যন্ত অল্প সময়ই হাতে আছে।'

'আমি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিইনি?'

'আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলে? কি ভাবে? আমায় মন্ত্রীসভায় থাকবার পরামর্শ কে দিয়েছিল? তুমি। আর এখন সমস্ত কিছু থেকে সরে পড়তে চাও, কি বল?' তেসা অঙ্গভঙ্গী করে চারদিকে নাচতে লাগল। 'আমি জানি, তোমার 'মন্ত্রশিষ্যরা' আমার খুব বিরোধী। কিন্তু ও সমস্তই ভুল বোঝাবুঝির ফল। ব্যাপারটা তুমি তাদের বুঝিয়ে বোলো। তোমার সাহায্য পেয়েই আমি চেম্বারে নির্বাচিত হয়েছিলাম। এই সংকটের সময়ে তুমি তোমার বন্ধুদের ছেঁটে ফেলতে পার না!'

'অকারণে উত্তেজিত হচ্ছ।' ব্রতৈল বলল। 'আমি বলছিলাম যে, প্রতিরোধের ব্যর্থতা সম্বন্ধে তোমায় সতর্ক করেছিলাম আমি। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা তোমায় খুব শ্রদ্ধা করে। এখানে সবাই তোমার আপন জন। কোন ভয় নেই। সমস্ত পরিস্থিতিটা আমাদের আলোচনা করে দেখা দরকার। নতুন গভর্নমেণ্টে কাকে কাকে নেওয়া হবে তাও ভাবতে হবে।'

'মন্ত্রীসভা আজ পুনর্গঠিত হয়েছে।'

'এটা স্রেফ একটা তালির ওপর আরেকটা তালি লাগানো। আমি নতুন গভর্নমেণ্ট সম্পর্কেই বলছি। কয়েক দিনের মধ্যেই আপোষের কথা উঠবে।

সুতরাং একটা শক্তিশালী গভর্নমেন্ট অপরিহার্য। কমিউনিস্টরা কোন দুর্বলতা পেলেই তার সুবিধা নেবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব নেবে মার্শাল। তাছাড়া নামটাও চমৎকার—ভের্দ্যুর বীর। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করে ফেলা যেতে পারে।'

'রেনোর কী হবে?'

'ও সরে পড়বে। নইলে আমরাই ওকে রাজদূত করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব। তাহলে ওই বুড়োকেই সর্দার হিসেবে পাব আমরা। তারপর লাভাল তো আছেই। আমিও আছি। পুরনো মন্ত্রীদের মধ্যেও দু-একজনকে ডাকব আমরা।'

'আমার মনে হয় বোদুয়াঁকে বাদ দেওয়াই উচিত।'

'ঠিক। ইতালিয়ানরা ওকে বড় বেশী পছন্দ করে। তারপর প্রুভস্ত রয়েছে। ও তো শিল্পপতিদের প্রতিনিধি। ন্যিয়েজারের ধারণা ও খুব করিৎকর্মা। তালিকায় তোমাকেও আমি অন্তর্ভুক্ত করেছি।'

তেসা তার আনন্দ গোপন করতে পারল না, কিন্তু বিনয় দেখাবার জন্যে মুখে বলল, 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি। যোয়ান দেখে কাউকে নেওয়াটাই উচিত।'

'না, তুমি খুব কাজে লাগবে। মন্ত্রীসভার পুনর্গঠনকে কিন্তু শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন বলে ধরে নেওয়াটা ঠিক নয়। এখন অবস্থাকে আয়ত্তে আনাটাই একটা মস্ত বড় কাজ। কিন্তু তোমার সঙ্গে সবাই পরিচিত। অনেকে বলতে পারে যে ফ্রান্সের সাধারণ লোকের কাছে তুমিই একমাত্র ভরসা যে কোন কিছুর পরিবর্তন ঘটবে না। এই সময়ে সব চেয়ে জরুরী কাজ হল দেশকে শান্ত করা।'

তেসা ঝলসে উঠল। ঐ বদমাশ ক্রুজেটারই কাণ্ড। ঐ ইস্তাহারটা একেবারে ভাঁওতা। ব্রতৈল বুঝল, তেসা সত্যিই একজন খাঁটি ফরাসী। আর তেসাও তার সাম্প্রতিক দুশ্চিন্তার কথা ভুলে গিয়ে নতুন মন্ত্রীসভার কর্মপদ্ধতি আলোচনা করতে বসল।

'আমরা যদি মন্ত্রীসভার বিবৃতিতেই ঘোষণা করি যে আপোষ আলোচনা করতে আমরা প্রস্তুত আছি তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত।' তেসা বলল, 'আমার শুধু ভয় হচ্ছে যে জার্মানরা অতিরিক্ত দাবীদাওয়া পেশ করবে। এই অপূর্ব জয়লাভে মাথা ঘুরে যাবে ওদের। কিন্তু ওদের বুঝিয়ে রাজী করাতে পারলে একটা কাজের কাজ হবে। তোমার তালিকা থেকে একটা নাম বাদ গেছে কিন্তু, বুঝলে। অবশ্য আমি যা বলছি তা রীতিমত

দুঃসাহসিক কাজ। অনেকের কাছে বিপজ্জনক কাজও বটে। কিন্তু এই সংকটের সময়ে অনেক বেশী সহনশীল হতে হবে।'

'ভীইয়ারের কথা বলছ?'

'ভীইয়ার?' তেসা বিস্মিত চোখে ব্রতৈলের দিকে তাকাল। 'ঐ বেতো ঘোড়াটা! ভাল কথা, ও বোধ হয় কেটে পড়েছে। না আমি গ্রঁদেলের কথা ভাবছিলাম। তুমি আমি পুরনো বন্ধু, আমরা মন খুলেই কথা বলতে পারি। অবশ্য ঐ দলিলের কথাটা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার......'

ব্রতৈল ক্রুদ্ধ হয়ে রুল দিয়ে টেবিলে বাড়ি মারল।

বলল, 'আমি আগেই বলেছি ওটা একেবারে জাল। এই সময়ে এমনি ইতরামির কথা কেন মনে হল তোমার?'

'আমায় ভুল বুঝেছ। কথাটা আমি ওকে ছোট করার জন্যে বলিনি। বরং তার উল্‌টোটাই। বার্লিনে গ্রঁদেলের অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। বর্তমান সময়ে ওর মত লোক অপরিহার্য......'

ব্রতৈল নীরস কেতাদুরস্ত গলায় উত্তর দিল, 'আমার মতে অনুমান করে লাভ নেই। অবশ্য বাইরে গ্রঁদেলের নাম আছে। লোকটা সুবক্তা আর পণ্ডিত। আমাদের গভর্নমেণ্টে ও খুব কাজে আসবে। কিন্তু পারীতে কারও থাকা উচিত। একজন বড় রকমের রাজনীতিজ্ঞকে থাকতে হবে পারীতে। লাভাল আর আমাকে তো ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্যে রেনোর পিছু পিছু যেতে হবে। তোমাকেও আমি পারীতে থাকতে বলতে পারি না। পার্লামেণ্টারী দলগুলো সম্বন্ধে তুমি জানো শোনো সুতরাং তুমি আরো বেশী প্রয়োজনীয়। তাছাড়া এই দুরূহ অবস্থার মধ্যে তোমায় ফেলে যেতে চাই না—একজন ফরাসীর পক্ষে পারীতে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিটা একটা সহজ কথা নয়। আর তাছাড়া তোমাকে না পেলে জার্মানরা মোটেই দুঃখিত হবে না। ওদের পক্ষে আমাদের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি বুঝে ওঠা রীতিমত শক্ত ব্যাপার। ওরা তোমাকে পপুলার ফ্রণ্টের পুতুল বলে মনে করে, বজ্রমুষ্টিওলা এক মানুষ.........'

ছোট হয়ে গেল তেসার মুখখানা। দীর্ঘ সময় তারা দুজনেই চুপ করে বসে রইল। পাশের ঘরে ব্রতৈলের বৌ কাঁদছে আর ব্রতৈল তার ফোঁপানি শুনে ভুরু কোঁচকাচ্ছে থেকে থেকে। অবশেষে তেসা কথা বলল, 'কী মনে হয় তোমার? ওরা কি খুব শিগগির এসে পড়বে?'

'কয়েকটা দিনের ব্যবধান মাত্র, হয়ত কয়েক ঘণ্টা.........'

ব্রতৈলের কাছ থেকে ফিরে এসে বিমূঢ় বোধ করল তেসা। নতুন মন্ত্রীসভায় সে যে একটা পদ পাবে—এ চিন্তা তাকে আর এতটুকুও খুশি করে তুলল না। জগৎটা কেমন দুর্বোধ্য আর প্রতিকূল বলে মনে হল। আচ্ছা, রেনো যদি জানতে পারে যে, সে ব্রতৈলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসেছে? মাদেল সব কিছু করতে পারে: তাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিতে পারে, গুলিও করতে পারে। তারা বিশ্বাসঘাতক বলে তাকে অবজ্ঞা করবে। আর জার্মানরা তো তাকে প্রায় কমিউনিস্ট বলেই মনে করে। রাজনীতিটাই জঘন্য ব্যাপার। সৈন্যরাই বেশ সুখে আছে—ওরা অন্তত জানে যে শত্রু কোথায়। কিন্তু তেসার শত্রু তো সর্বত্র.........

তেসা কুঁজো হয়ে বসল। তার সেক্রেটারী দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল, 'বৃহস্পতিবারের অভ্যর্থনার আয়োজনটা আমি সেরে রেখেছি।'
তেসা মনে মনে বলল, 'আহা বেচারীরা! ওরা জানেই না যে বৃহস্পতিবার জার্মানরা এসে পড়বে এখানে। কেউ কিছু জানে না......' বেড়াতে যাবে বলে স্থির করল তেসা। হয়ত টাটকা হাওয়ায় তার বমি বমি ভাবটা কেটে যাবে। অন্ধকার শহরটা কেমন অসহ্য লাগছে। চারদিকে আর্তনাদ, চিৎকার আর দুর্বোধ্য শব্দ। দেউড়িগুলোতে ভীড় করছে লোকে। নানা রকম টিপ্পনি কানে এল তেসার:

'ওরা বলছে গামল্যাঁ নাকি গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।'
'রেনো তো সরে পড়েছে আমেরিকায়।'
'ওরা সবাই পালাবে আর আমাদেরই এখানে থেকে সমস্ত জঞ্জাল সাফ করতে হবে।'

'জার্মানদের আমি ভয় পাই না। আমার আর কী? আমি কেউ নই। জার্মানরা আমাকে ছোঁবেও না। আমার ভয় কেবল বোমাকে।'
'সাংঘাতিক জীব ঐ জার্মানরা! বাবার কাছে শুনেছি ওরা কি ভাবে ১৯১৫ সালে আমার কাকা জাক্‌কে জ্যান্ত কবর দিয়েছিল।'
'তেসা তো হিটলারের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করে ফেলেছে।'

কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তেসা। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার। কল্পনায় রাস্তার ওপর সৈন্যবাহিনীর পদধ্বনি শুনল সে। চোখ বন্ধ করে নিজের আর্তনাদকে বাধা

দিতে চাইল তেসা। কার পদধ্বনি? কোথাও কিছু নেই, চাঁদোয়ার ওপর ভারী বৃষ্টির ফোঁটা ফেটে ফেটে পড়ছে।

তার সারা জীবনে কখনো সে এত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেনি। কোন মতে দপ্তরখানার দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গেল। নিজের পড়ার ঘরে ঝলমলে আলো দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল শিশুর মত।

তারপর বিমান-বিধ্বংসী কামানের গর্জন শুরু হল। জানলার কাছে ছুটে গিয়ে আবার পিছু হটে এল। পারীর দিকে এগিয়ে আসছে জার্মানরা। ওদের বিশ্বাস—সে একজন কমিউনিস্ট। এদিকে শ্রমিকরা বলছে, সে হিটলারের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করেছে। প্রত্যেকে তার বিরুদ্ধে। ওরা তাকে গুলি করে মারবে। কিংবা পীড়ন করবে। ও কিসের বিস্ফোরণ! নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও বোমা ফেটেছে। একেবারে দপ্তরখানার ওপর লক্ষ্য করেছে ওরা। পাঁচশো পাউণ্ডের এক বোমা। সে মরে গেলে তার দেহকে পর্যন্ত সনাক্ত করতে পারবে না লোকে। একটা কিছু করা দরকার! নিরাপদ আশ্রয়ের চেষ্টা করা উচিত।

কি করবে ভেবে না পেয়ে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল তেসা। বসে পড়ে লাফিয়ে উঠল আবার। মনে হল সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসছে। শেষে সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে আদেশ দিল, 'গাড়ীটা তৈরী রাখ। পেট্রল যেন প্রচুর থাকে। মফস্বলে গিয়ে বিশ্রাম নেব আমি।'

তেসার প্রতিশ্রুত ভাল খবরের জন্যে জোলিও যখন সাড়ে আটটার সময় উপস্থিত হল, তাকে বলা হল, 'মন্ত্রীমশাই মফস্বলে চলে গিয়েছেন।' জোলিও আর কোন প্রশ্ন না করে বাড়ীর দিকে দৌড়ল। বৌকে গিয়ে বলল, 'মারি! এক্ষুনি চলে যেতে হবে আমাদের। জোচ্চোরটা ইতিমধ্যে কেটে পড়েছে। হারামজাদা! সকালবেলা ও বলছিল, কী সুন্দর বাগান! এক সময়ে ওরা বলত—ইঁদুররা জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ক্যাপ্টেনরাই সরে পড়ছে। ইঁদুরদের ভাগ্য তাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে। কিন্তু ইঁদুররাও বোকা নয়। চল চল, চটপট সেরে নাও!'

২৮

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জিনেৎকে কেমন বিমর্ষ আর উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। বাস্তবিকই কোন কিছুতে আগ্রহ বা কৌতূহল নেই তার। কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগীর অর্ধ-বিকারের মত তার জীবন। দেসেরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর যে শূন্যতা সে বোধ করেছিল তা এখন প্রবল ও শ্বাসরোধী হয়ে উঠেছে।

স্টুডিওতে তার কাজ করে যাচ্ছে জিনেৎ। চারপাশের লোকের মুখে যুদ্ধের কথাবার্তা; খবরের কাগজের শেষ সংস্করণগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় তাদের মধ্যে। এইসব কথাবার্তায় কান দেয় না সে। আগের মতই সে তার কৃত্রিম অর্থপূর্ণ কণ্ঠস্বরে ওষুধের বড়ি আর মদের প্রশস্তি গায় এবং তারপর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে গাছপালা, নিস্তব্ধতা আর বাতাস সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে যে-সব সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বহুদিন হল জিনেৎ বিজ্ঞাপন থেকে কবিতাকে আলাদা করে চিনতে পারে না। এমন কি নিজের পালা আসার আগে ঘোষকরা যে সব কথা বলে তাও যেন তার কাছে কতকগুলো বিচিত্র কোম্পানীর বিজ্ঞাপন বলে মনে হয়: এত টন রেজিস্ট্রীকৃত জাহাজ ডুবে গিয়েছে......তেলের দাগ দেখা গিয়েছে জলের ওপর।

শহরের ব্যস্ততা আর কোলাহলের মধ্যে নিজেকে ভুলে থাকার উদ্দেশ্যে রবিবার দিন সে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াল। কী চমৎকার দিন! পারী-বাসীরাও হতাশা-ম্লান গুজবের কথা ভুলে গিয়ে বোয়া দ্য বুলোঞ-এ ভীড় করেছে—টেনিস্ খেলছে, জলের ওপর নৌকা বাইছে বা ছায়াঘন কাফেতে বসে বসে সবুজ পুদিনার আরক বা কমলালেবুর সোনালী সরবত পান করছে। ছোট ছোট ছেলেরা বালি দিয়ে চমৎকার কচুরি তৈরী করছে। একটা ছটফটে কালো পাখী দেখতে পেল জিনেৎ। পাখীটা ঠোঁট দিয়ে ডানা ঠোকরাচ্ছে। জিনেৎ ক্লান্তভাবে ডাকল, 'কালো পাখী', সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল পাখীটা। এক অন্ধকার এভেন্যুএ সে এক দম্পতিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল—একটি সৈনিক আর একটি বিশ্রম্ভালাপরত মেয়ে—মুখে তিলের দাগ আর পরনে গোলাপী রঙের ফ্রক। সৈনিকটির অত্যন্ত ছেলেমানুষি গম্ভীর মুখ আর কালো গোঁফ। লোকটি টিনের টুপিটা হাতে ধরে আছে আর মেয়েটি কাঁদছে। সৈনিকটি বলল, 'দেখে নিও, এর ফল ভালই হবে।' জিনেৎ কেমন একটা ঈর্ষার জ্বালা বোধ করল। এমনিভাবে বিদায় গ্রহণ

করতে পারাটা কী সুখের! আর তাকে ছেড়ে চলে যাবার সময় কোন আশ্বাস, চোখের জল, এমন কি দুঃখ কোন কিছুই ছিল না।

সোমবার সকালে জানলার সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ করে বাড়ীতে বসে রইল জিনেৎ। আলোর মুখোমুখি হতে চায় না সে। কিন্তু বিকেলে বাইরে বেরিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। পারীকে যেন একেবারেই চেনা যায় না। দোকান পাট আর কাফেগুলো সমস্তই বন্ধ। কাঁপা হাতে লেখা 'দোকানবন্ধ'-এর ছোট ছোট শাদা বিজ্ঞপ্তি দরজাগুলোয় আঁটা। কতকগুলি বাড়ীতে লোকেরা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে জানলায় কাঠ লাগাচ্ছে বা তোরঙ্গ, বাণ্ডিল আর অত্যন্ত ক্ষিপ্র হাতে-বাঁধা পার্সেল বের করে আনছে। রাস্তা পার হওয়া অসম্ভব; সীমাহীন মোটরের সারি এগিয়ে চলেছে। গাড়ীর মাথাগুলো তোষকে বোঝাই, জানলার বাইরে সন্ত্রস্ত ও অশ্রু-লাঞ্ছিত মুখ।

মাত্র গতকাল পারীবাসীরা আশ্রয়প্রার্থীদের জিজ্ঞাসা করছিল, 'কেন তোমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে না? ওয়েগাঁ্য লাইনের কী খবর?' আর এখন তারাই চলে যাচ্ছে। রেল স্টেশনে গিয়ে ভীড় করছে, লরির ছাদে উঠছে আর তাদের বাঁচাবার জন্যে ড্রাইভারদের কাকুতি মিনতি করছে। প্রতি ঘণ্টায় শহর ক্রমশ জনশূন্য হয়ে উঠছে—ঠিক একটা শতচ্ছিন্ন বস্তা থেকে ময়দা ঝরে পড়ার মত।

দপ্তরখানার অবসরভাতা বিভাগের সামনে লরিগুলো দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন কারণেই হোক টেবিল, কাপ প্লেট রাখবার আলমারি আর ডেস্ক্‌গুলো ফুটপাথে এনে রাখা হয়েছে। এক বুড়ী একঘেয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডের মত বলে চলেছে, 'আমাকে নিয়ে চল! আমাকেও নিয়ে চল!'

ভীত হয়ে জিনেৎ জিজ্ঞাসা করল, 'ইস! এসব কী ব্যাপার '

উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে থেকে বুড়ী উত্তর দিল, 'জানো না বুঝি? জার্মানরা রুয়েঁতে এসে পড়েছে।' বুড়ীর হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গিয়ে সমস্ত জিনিস রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল—এক দলা উল, একটা তোয়ালে, মোমবাতি আর কমলালেবু। কাঁদতে লাগল বুড়ীটা। সঙ্গে সঙ্গে জিনেৎও কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিছু একটা করা দরকার। খুব শিগগিরই জার্মানরা এখানে এসে পড়বে। বোমা ফেলবে আর গুলি করবে ওরা। জিনেৎ ছুটতে লাগল। জিনেৎ আর জিনেৎ নেই, সে যেন হতাশা-ম্লান পথে উড়ে-চলা খড়ের একটা কুটো মাত্র।

জিনেৎ হঠাৎ থেমে দাঁড়াল—কোথায় যাবে সে? বিষণ্ণ লিয়ঁ আর বাবার ক্রুদ্ধ জীর্ণ মুখখানার কথা মনে পড়ল তার। তারপর মনে পড়ল ফ্ল্যারির কথা—আঙুরক্ষেতের নীল পত্রগুচ্ছ, উষ্ণ দিন আর মাছির গুঞ্জন-ক্লান্ত নিস্তব্ধতা। বাঁচতে চাইল সে। এমন করে এর আগে আর সে বাঁচতে চায়নি। যে জীবন নির্মম ছিল, তা-ই মধুর বলে মনে হল জিনেতের কাছে। হ্যাঁ, এখান থেকে চলে যাবে সে।

গার দ্য লিয়ঁতে গিয়ে উপস্থিত হল। স্টেশনে পৌঁছবার বহু আগে থেকেই দীর্ঘ রাস্তাটা মানুষের ভীড়ে ঠাসা। স্টেশনের প্রাঙ্গনে ঢোকাই একটা অসম্ভব ব্যাপার। পুলিশের বিরাট বাহিনী পর্যন্ত ভীড়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। জনতা চিৎকার করছে আর অঙ্গভঙ্গী করছে, 'শালা অপদার্থ! নিজেরা পালিয়ে গিয়ে আমাদের পেছনে ফেলে গেছে! বিশ্বাসঘাতক! ইঁদুরের মত ফাঁদে ধরা পড়ে গেছি আমরা।'

পুলিশরা ভাসা-ভাসা উত্তর দিচ্ছে যে সন্ধ্যা নাগাদ আরো ট্রেন আসবে। ক্ষুধার্ত আর দুর্বল হয়ে লোকে রাত্রের আহারের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করল। যে সমস্ত দোকান এখনো খোলা আছে সেগুলোর তল্লাশে বের হল কিংবা ফুটপাথে বসে বসে সামান্য জলখাবার খেয়ে উদরপূর্তি করতে লাগল। এক বুড়ো মজুর এক টুকরো ছোট রুটির সঙ্গে কয়েক টুকরো সসেজ জিনেতের হাতে দিল। জিনেৎ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইল কিন্তু কথা বলতে পারল না। নিজের ঠোঁট দুটো নাড়াল মাত্র। কিছু খেতেও পারল না; মনে হল আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগে রাত্রি এল; সারা শহরের ওপর কালো শবাস্তরণের মত ঝুলে রইল রাত্রি। লোকে বলল রুয়েঁতে আগুন জ্বলছে। কে যেন তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বলল—ওটা শত্রুপক্ষকে আড়াল করে রাখার জন্যে ধোঁয়ার জাল মাত্র। অন্ধকারে মেয়েরা বন্য আর্তনাদ করে উঠল থেকে থেকে। জিনেতের মনে হল শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাবে সে। সকালে, ভোরবেলার প্রথম অস্পষ্ট আলোয় আরো লোক এসে ভীড় করল স্টেশনে। কিন্তু স্টেশনে একটা গাড়ীরও দেখা নেই।

জিনেৎ রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে এসে পৌঁছল। তার ভয়-চকিত বীভৎস চোখের দিকে আর কেউ তাকিয়েও দেখছে না: এখন সবার চোখই তার মত হয়ে উঠেছে। লোকেরা পথচারীদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করছে কোথায়

স্যুটকেশ আর হাতগাড়ী পাওয়া যায়। টুকরো টুকরো খবর একসঙ্গে জট বেঁধে ভেসে বেড়াচ্ছে: 'জার্মানরা ম াঁং-এ এসে পড়েছে'—'ওরা শাঁতিলিতে এসে পড়েছে'—'প্যারাস্যুটবাহিনী নেমেছে সাঁজ-এলিজেতে'—'ট্রেনগুলো গার দোস্তেরলিৎস থেকে ছাড়ছে'—'না, তা নয়'—'ওরা আমাদের সঙ্গে বেইমানী করেছে, ওরা আমাদের...!'

একটি মেয়ে হ্যাংলার মত আইসক্রীমের একটা দিক চাটতে চাটতে কাঁদছে। রাস্তা দিয়ে জেনারেল গেল একজন। একটা বুড়ো লোক তার দিকে তাকিয়ে থেকে কাঁপা গলায় বলল, 'বারোটা বেজে গেছে তোমাদের!' পাশের রাস্তায় একটি ছোট্ট মেয়ে একটা মস্ত মুণ্ডহীন পুতুলকে আলিঙ্গন করে আর্তনাদ করে উঠল।

রু স্যাঁ জাক্‌এর মোড়েই এক রুটিওলার দোকান খোলা আছে। টাটকা রুটির গন্ধে জেগে উঠল জিনেৎ—বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা আবার নতুন করে উপলব্ধি করল সে। মনের ভেতর কতকগুলো অস্থির চিন্তা খেলে গেল: কী করবে সে? স্টুডিওর দিকে এগিয়ে চলল। দরজাগুলো বন্ধ। এমন কি কুলিরা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তারপর মারেশালের কথা মনে পড়ল তার। তার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখল, সে স্যুটকেশে বই, একটা ফ্লাস্‌ক্‌ আর নিগ্রো-পুতুল ভর্তি করছে। পুতুলটা কিছুতেই ভেতরে যাবে না। বারবার কেবল লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আর কুটিল চোখে হাসছে।

'নতুন খবর—ইটালিয়ানরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।' মারেশাল বিড়বিড় করে উঠল। 'ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, ওরা আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। হতচ্ছাড়া শয়তান! আর এদিকে গভর্নমেণ্টও কেটে পড়েছে। এই তোমার 'সফল না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম করার সংকল্প!' প্রচুর মোটর গাড়ী কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা একসঙ্গে দল বেঁধে একটা কিনেছি। গ্রঁদেৎ পেট্রলের খোঁজে বেরিয়েছে। যদি পেট্রল পায়, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

জিনেৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, 'ক্ল্যারিতে পৌঁছে দেবে আমায়?'

পেট্রল পাওয়া গেল না। ভোর নাগাদ বিষণ্ণ মুখে ফিরে এল গ্রঁদেৎ।

বলল, 'শার্লে গতকাল মোটরে করে বেরিয়েছিল কিন্তু হেঁটে ফিরে আসতে হয়েছে। কোথাও এতটুকু পেট্রল নেই, উচ্ছন্নে যাক! যদি আমরা একটা ঘোড়াও পেতাম! তাহলে নির্ঘাৎ বেরিয়ে পড়তে পারতাম। পের লাশেস কারখানায় ওরা কামান বসিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখলাম। সৈন্যরা

কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। কিছুই বুঝলাম না। ওরা বলছে আমেরিকাও যুদ্ধ-ঘোষণা করেছে। আমার তো বিশ্বাস হয় না।'

মারেশাল চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরের কাগজ নেই। রেডিও নেই। একটা কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসেছে ওরা! এর অর্থটা বুঝতে পেরেছ? ওরা পারী ছেড়ে চলে গিয়েছে!'

নিশ্বাস নেবার পর জিনেৎকে বলল, 'আমাদের হেঁটে রওনা হতে হবে।'

জিনেৎ মুহূর্তের জন্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার একটা ছেলেমানুষি ধারণা আছে যে ক্ল্যারিতে হেঁটে যাওয়াটা বেশ মজার। ঘরে গিয়ে সে নিজের মনে মনে বলল: 'অন্য কোন একটা জুতো পরা দরকার। এই জুতো পরে গেলে ওখানে আর পৌঁছতে হবে না।'

তার উত্তেজনা শিগগিরই মিলিয়ে এল। রাস্তায় ভয়াবহ কোলাহল—মোটর গাড়ীর হর্ন আর মানুষের ঠেলাঠেলি, চিৎকার ও কান্না—সমস্ত কিছু তাকে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ করে তুলল। কোথায় পালাবে সে? আর পালিয়েই বা কী লাভ? যেখানেই যাক, তার ভাগ্যে সবই এক।

হোটেলের কর্ত্রী জিনেৎকে অভিবাদন জানাল, যেন সে তার কত নিকট আত্মীয়া। বলল, 'আপনি না গিয়ে ভালই করেছেন। এই জায়গায় একটা জনপ্রাণীও নেই, স্রেফ আতঙ্ক ছাড়া কিছু নয়। দেখে শুনে নিজেরই কেমন লজ্জা করে। কী জন্যে ওরা পালাচ্ছে? দয়া করে বলবেন একটু! ১৯১৪ সালে জার্মানরা মেও-এ ছিল। সে সময়েও লোকে পালিয়েছিল। কিন্তু জার্মানরা পারী পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। দুধউলীটা বলছিল চল্লিশ ডিভিশন সৈন্য আমদানী করা হচ্ছে। তার মানে, জার্মানদের নির্ঘাৎ ভাগিয়ে দেওয়া হবে।'

জিনেৎ নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকুনি দিল। এক ঘণ্টা বা তারও বেশী নিশ্চল হয়ে বসে রইল সে। হোটেল কর্ত্রীর ছোট ঘরখানা, যা হোটেলের আপিসের কাজে লাগে, রোদ পড়ে উষ্ণ হয়ে উঠছে। এক ফালি রোদকে ধরবার জন্যে ফুটপাথের ওপর খেলা করছে একটা বেড়ালছানা। বেড়ালটাকে দেখে লাফিয়ে উঠল জিনেৎ। যদি সেও বাঁচতে পারত!

তাড়াতাড়ি মারেশালের ফ্ল্যাটে ফিরে চলল সে। দরজার ওপর একটা খবর লেখা: 'জিনেৎ, আমি তোমার জন্যে দঁফের রশেরকো মেট্রো স্টেশনের বাইরে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করব।' ব্যাকুলভাবে ঘড়ির দিকে তাকাল জিনেৎ। এরি মধ্যে তিনটে বেজে গেছে। তবু সময় আছে এখনো। একটা খোলা দোকানে গিয়ে

এক বোতল ও-ডি-কোলন কিনল। দোকানী অনেক সময় নিচ্ছে দেখে জিনেৎ আরো ক্ষিপ্র হতে অনুনয় করল তাকে।

স্টেশনগুলো কী করে ঘুলিয়ে ফেলল সে? পাঁচটা পর্যন্ত আলেসিয়া স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করে রইল। তারপর হাতব্যাগ থেকে কাগজটা বের করল আর সমস্ত কিছু অস্পষ্ট হয়ে এল তার চোখের সামনে। কিন্তু যখন সে দঁফের-রশেরকো স্টেশনে পৌঁছল সেখানে একটিও লোক নেই। ডাকঘরে ধাওয়া করল জিনেৎ। কিন্তু ডাকঘরও বন্ধ হয়ে গেছে। হোটেলে না পৌঁছনো পর্যন্ত টেলিফোন করার কথাও তার মনে হল না। দেসেরকে ফোনে ডাকল। মান-অভিমানের প্রশ্ন নয়। দেসের তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ফোনে কোন উত্তর নেই। জিনেৎ তার নোট বই বের করে সমস্ত নম্বরগুলোই একবার করে ডাকল, ভেবে দেখল না কাকে সে ডাকছে। কিন্তু একটানা গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই কানে এল না। আতঙ্কিত হয়ে জিনেৎ মনে মনে বলল, 'কেউ নেই!'

ইতিমধ্যে হোটেল-কর্ত্রী তার দেওরের সঙ্গে দেখা করল। সে বলল, 'এখানে কোন ডিভিশনই নেই। কেবল পুলিশ আর অগ্নিনির্বাপক দল শহরে রয়ে গেছে। জেনারেল গিয়েছে শাঁতিলিতে জার্মানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।' উত্তর দিক থেকে কামানের গর্জন ভেসে এল। জিনেৎকে 'কেউ নেই' কথা দুটো উচ্চারণ করতে দেখে হোটেল-কর্ত্রী হাতের একটা ভঙ্গী করে উন্মাদের মত মালপত্র গোছাতে শুরু করল।

জিনেৎ ওপরে উঠে এল তার ঘরে। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জানলায়। দীর্ঘ পথ দিয়ে বিরাট জনস্রোত এগিয়ে চলেছে। কেউ কেউ হাতগাড়ীতে আসবাব বোঝাই করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে হাতগাড়ীর ওপর একটা বুড়ী বসে আছে বা ছোট্ট কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। সমস্ত খড়খড়িগুলো খুব শক্ত করে বন্ধ করা। জিনেৎ আবার আর্তনাদ করে উঠল, 'কেউ নেই!'

একটা লোক কাঁধে আর্ম-চেয়ার নিয়ে চলেছে, তার ওপর কাঠের ঘোড়া নিয়ে বসে আছে একটা ছোট্ট ছেলে—ঘোড়াটাকে ছাড়তে কিছুতেই রাজী নয় ছেলেটা। এক বুড়ী পাখীর খাঁচা দোলাতে দোলাতে চলেছে।

প্যাশনে-পরা একটা লোক থলির মধ্যে বেড়াল নিয়ে যাচ্ছে। বেড়ালটা ছটফট করছে আর চিৎকার করছে। এক বুড়ী ঠাকুমাকে হাতগাড়ীতে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর অন্য একটি স্ত্রীলোকের দুই কাঁকে দুই শিশু। শেষ সাইকেল-চালকরা ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলেছে। জনশূন্য শহরে পড়ে থাকা কী ভয়াবহ!

জিনেৎ নীচে নেমে গেল। হোটেল-কর্ত্রী ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে। সব কিছু ফেলে গিয়েছে এখানে। যাবার আগে জিনেৎকে খবর পর্যন্ত দেয়নি এবং তালাও দিয়ে যায়নি নিজের ঘরে। জিনেৎ রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলল। কেমন একটা পোড়া গন্ধ, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তেলের ট্যাঙ্কগুলোয় আগুন লেগেছে। তারপর বৃষ্টি নামল এক সময়ে, বৃষ্টির ফোঁটা ধোঁয়ায় কালো হয়ে গিয়েছে। কালো অশ্রু নেমে এল জিনেতের গাল বেয়ে। ফাঁকা মন ও বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে জিনেৎ ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল, পালিয়ে চলল ধূমায়িত শহরের গ্রাস থেকে।

২৯

আনে সমস্ত সকালটা খবরের কাগজের অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল। যে সমস্ত কিয়স্ক্ এতক্ষণ খোলা ছিল সেখানে কেবল পুরনো সাপ্তাহিক পত্রিকার ভীড়; তারপর সে কিয়স্কগুলিও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। লোকে বলাবলি করল যে খবরের কাগজ আর বার হবে না। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে কাগজওলার চিৎকার শুনে তার হাত থেকে একটা কাগজ ছিনিয়ে নিল আনে। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটা ছবি—সীন নদীর ধারে একজন মহিলা কুকুরকে স্নান করাচ্ছেন, ছবিটির শিরোনামা দেওয়া হয়েছে: 'পারী আজো সেই পারীই আছে।' আনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল; লোকটা তাকে পুরনো কাগজ গছিয়ে দিয়ে গেল নাকি! না তারিখটা ১০ই জুনই আছে......তাড়াতাড়ি স্কুলে এসে উপস্থিত হল আনে, তারপর রেডিওটা খুলে দিল। উপাসনা-উৎসব ঘোষণা করছে ওরা। তারপর মার্কিন রাজদূত বুলিট যোয়ান অফ আর্কের মূর্তির পাদদেশে একগুচ্ছ রক্তগোলাপ উপহার দিয়ে ইঙ্গ-স্যাক্সন কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে উঠল: 'ওদের রক্ষা করো, যোয়ান!' এর পর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল ট্যাঙ্গো নাচের সুর:

কিরে ছোঁড়া, কিলো ছুঁড়ি
কিসের তরে চাস আনারস ঝুড়ি ঝুড়ি?

অবশেষে ঘোষকের জোরালো কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'নারভিক-এর পূর্ব দিকে আমাদের বীর শাস্তর আলপিনরা অগ্রসর হয়ে চলেছে......'
রিকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলল ওরা রেডিওতে?'

'কিছু না। হয়ত রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। আগামী কাল আমাদের জানাবে।' আনে উত্তর দিল।

কিন্তু পরদিন সকালে রেডিও সম্পূর্ণ নির্বাক রইল। হতাশায় ডুবে গেল আনে। প্রথমে ভাবল ডাক্স্-এ তার বাবার কাছে চলে যাবে সে। সেখানে কক্ষনো পৌছতে পারবে না জার্মানরা।

শূন্য ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল আনে। চারদিকে ছেঁড়া নেকড়া আর টিনের ডিবে। আশ্রয়প্রার্থীরা গতকাল পর্যন্ত এইখানে ছিল। ওদের মধ্যে একমাত্র রিকেই রয়ে গেছে। খেঁড়িয়ে খেঁড়িয়ে বলেছে, 'আমি যেতে পারব না।' আনে কি করবে তাও সে জিজ্ঞাসা করেনি। সে বুঝেছে যে, আনে চলে যাবে। তবুও তার উৎকণ্ঠিত চোখ দুটো দিয়ে সে আনের গতিবিধি লক্ষ্য করছে—যেন সে আশা করছে, আনে হয়ত শেষ পর্যন্ত যাবে না। একা থাকাটাকে সে সব চেয়ে বেশী ভয় করে।

'সবাই তো চলে গেছে। শহরে কী হচ্ছে এখন?' রিকে জিজ্ঞাসা করল।

'ওরাও চলে যাচ্ছে।'

একটু থেমে আনে বলল, 'আমি যাচ্ছি না।'

রিকে হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু তার মুখখানা টান টান হয়ে উঠল স্নায়বিক আক্ষেপে। দুদুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আনে অবাক হয়ে ভাবল—কেন সে এখানে পড়ে থাকবার সিদ্ধান্ত নিল। সে রিকের জন্যে দুঃখিত বলে? কিন্তু তাকে তো দুদুর কথাও ভাবতে হবে। নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত দুদুকে। সে তো পথে হারিয়ে যেতে পারে? যেমন বেলজিয়ান মহিলাটি তার মেয়েকে হারিয়েছিল। কিন্তু এখানে তো বোমাবর্ষণ হবে। আরো হাজার দুয়েক লোক মারা যাবে। এর চেয়েও আরো ভয়াবহ হবে অবস্থা। সে চলে যায়নি কেন? শুধু তার আত্মমর্যাদার জন্যে? ঘণ্টাখানেক আগে রেডিওতে ফাঁপা শব্দ ছাড়া আর কিছু না শুনতে পেয়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল আনে। পালিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত লজ্জাকর। তার ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে, পরিত্যক্ত শহরে থেকে গিয়ে সে একটা কাজের কাজ করবে।

ত্রস্ত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল মেলানি আর আনেকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে পরামর্শ দিল।

বলল, 'মজুরদের সঙ্গে আমরা চলে যেতে পারব। ওদের সঙ্গে চারটে লরি আছে। হাজার হোক, আপনার লোকের মধ্যেই থাকব।'

আনে বলল, সে এখানে থাকবে বলে স্থির করেছে। মেলানি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল—তাহলে লোকে যা বলত তাই ঠিক: আনের হৃদয় বলে কোন জিনিস নেই, যে-ই তার স্বামীকে নিহত করে থাকুক না কেন তার কাছে সবাই এক। জার্মানদের সঙ্গে থাকবে সে!

মেলানি বলল, 'তোমার ব্যাপার, তুমিই বোঝো।'

রিকেকে খেতে দিয়ে আনে রাস্তায় বের হল। লোকে এখনো শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে যেতে পারলে কী ভালই না হত! আনে বার বার নিজের মনকে শাসালো: 'কক্ষনো না।' মেরির দেওয়ালে একটা ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল। বিজ্ঞপ্তির গোড়াতে লেখা আছে: 'ফরাসী রিপাবলিক। স্বাধীনতা। সাম্য। মৈত্রী। তার নীচে লেখা: 'পারীকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছে—জেনারেল দেনৎস, সামরিক গভর্নর।' খড়ের টুপি পরা এক বেঁটে মত বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞপ্তিটা পড়ছে।

'উন্মুক্ত শহর মানে?' আনে প্রশ্ন করল।

বেঁটে বুড়ো লোকটা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'জানি না। শহরটা যে দুর্গ নয়—এই কথাই বোঝাতে চাইছে হয়ত। কিংবা এটা পোপের অনুরোধ। যাই হোক, এতে খুশি হবার কিছু নেই, মাদাম।'

একজন মজুর বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান কোথাকার! তলে তলে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে ওদের!'

লোকটার একটা চোখ কাঁদছে। অন্য চোখটা নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে আছে আনের দিকে—কাঁচের চোখ ওটা।

বিরাট দাড়িওলা একটা মোটা মত পুলিশ দাঁত বের করে হেসে বলল, 'শান্তি রক্ষার জন্যে ওরা আমাদের এখানে রেখে গেছে। 'উন্মুক্ত শহরের' অর্থ হল জার্মানরা আমাদের মারবে না। এবার চট পট সন্ধি করে ফেলবে ওরা।'

লোকেরা এখনো শহরত্যাগ করছে। ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের দিকে তাকাল আনে—হাঁটবার সময় চিন্তার অবকাশ কোথায়।

সন্ধ্যার সময় রিকেকে সান্ত্বনা দিল, 'পারীকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তার মানে ওরা গুলিও করবে না, বোমাও ফেলবে না।'

'আমি বোমায় ভয় পাই না। পথে আসার সময় ওরা সমস্তক্ষণ বোমা ফেলেছে। আমার ভয় হয় ওরা পারী পর্যন্ত ধাওয়া করবে।'

আনে মুখ ফিরিয়ে নিল। এই প্রথম কান্নায় ফেটে পড়ল সে। বুঝল, রিকের

মত তারও একমাত্র ভয় যে জার্মানরা আসবে। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে নিজেকে সমস্ত ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল; ভেবেছিল: 'এতে কীই বা যায় আসে?' জার্মানরা অন্য সবার মতই মানুষ, শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন রকম। আর এখন বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা বোধ করল সে—ওরা কি সত্যিই আসবে? পারীতে আসবে জার্মানরা! কথাগুলো বার বার আবৃত্তি করল সে, আর চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল তার গাল বেয়ে।

স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না সে, ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। অপরিচ্ছন্ন, পরিশ্রান্ত সৈনিকরা মাথা হেঁট করে ঢালু পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। শহর থেকে চলে যাবার পথে তারা বন্ধ জানলাগুলোর দিকে ক্লান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে। তাদের একজনকে কিছু রুটি আর চকোলেট দিল আনে। তার দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটি স্থির হয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। বিদায়!'

তার চোখ দুটো ভুলতে পারবে না আনে। আর অমন অদ্ভুত কথা বলল কেন লোকটা—'বিদায়?'

বাড়ীতে গিয়ে রেডিও খুলে বসল আনে। তুলুজ বেতারকেন্দ্র থেকে রেনোর বক্তৃতা প্রচার করা হচ্ছে। রেনো বলছে, রুজভেল্ট্‌কে সে শেষ আবেদন জানিয়েছে। ক্রমে মিলিয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। তারপরই বিশপ জনসাধারণকে অনুশোচনার জন্যে আহ্বান করলেন—'এ হল ভগবানের শাস্তি।' নানা শব্দের সংমিশ্রণে একটা বিকট গর্জন ধ্বনিত হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—যেন আওয়াজটা পাশের ঘর থেকে আসছে: 'জাতীয় জাগৃতি বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করছি। আত্মসমর্পন করুণ! আমরা গোপন সৈন্যবাহিনী গঠন করছি। আমাদের ১৬নং বাহিনী আর্লসের সমস্ত তান্ত্রিকদের ও মার্কস্‌বাদীদের গুলি করে মেরেছে। গ্রেনোব্‌ল্‌-এ ৪৭নং বাহিনী......'

রিকে অনুরোধ করল, 'বন্ধ করে দিন! ও সব শোনবার মত ধৈর্য নেই আর!'

আনে ঘুমোতে পারল না। সারা রাত্রি সে অন্ধকার জানলার ধারে বসে ইঞ্জিনের গুঞ্জন আর কামানের গর্জন শুনল। মানুষ মরে গেলে যে শোক জাগে পারীর জন্যে সেই শোকে অভিভূত হল সে। সকালবেলা দুদুকে নিয়ে বের হল, তার আর রিকের জন্যে কিছু দুধ সংগ্রহের আশায়। না, সমস্ত দোকানগুলোই বন্ধ। একটি স্ত্রীলোক ছাড়া আর কোন জন প্রাণীও নেই। স্ত্রীলোকটি একটা

ছোট্ট গাড়ীতে এক পাল ছেলে মেয়ে বোঝাই করে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এখনো তাহলে লোক যাচ্ছে।

একটা কোণ থেকে একজন সৈনিক ছুটে এল। তাকে দেখে পিয়েরের কথা মনে পড়ল আনের—তামাটে রং আর দুই চোখের ধারে বড় বড় শাদা দাগ।

'পোৎ স্যরলেঁআয় যাবার রাস্তা কোন্‌টা? শিগগির!' চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল সৈনিকটি।

রাস্তাটা বলে দিয়ে আনে প্রশ্ন করল, 'জার্মানরা কোথায়?'

সৈনিকটা হাত দোলাতে দোলাতে ছুটে বেরিয়ে গেল। হাঁটতে লাগল আনে। সমস্ত খড়খড়িগুলো বন্ধ। একটা জনপ্রাণীও চোখে পড়ে না। স্কোয়ারের ঘড়িটা পর্যন্ত থেমে গিয়েছে। তিনের ঘরে এসে আটকে গেছে কাঁটাটা। চারদিকে কেমন একটা মড়ার মত স্তব্ধতা।

তারপর গোঁ গোঁ শব্দে আলোড়িত হয়ে উঠল আকাশ। বিমানগুলো খুব নীচুতে উড়তে উড়তে এগিয়ে আসছে; পাখার ওপর কালো স্বস্তিকা চিহ্নগুলো সুস্পষ্ট।

'এইবার ওরা বোমা ফেলবে,' আনে ভাবল। নিজের স্থৈর্যে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে—দুদুকে মেরে ফেলতে পারে ওরা, কিন্তু তাতেই বা তার কি এল গেল? আনে ভাবল, নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে তার; কিছু বুঝতে পারছে না সে।

দুদুকে নিয়ে বুলভার পর্যন্ত অগ্রসর হল। তারপর থেমে গেল হঠাৎ— জার্মানরা তার দিকে এগিয়ে আসছে। রাইফেল নিয়ে খোলা গাড়ীতে বসে আছে সৈনিকরা। কোন কিছু না ভেবে আনে তার হাত দিয়ে দুদুর চোখ দুটো ঢেকে দিল যাতে সে ওদের দেখতে না পায়। কোন স্পষ্ট ধারণা নেই তার, কি করবে তাও সে জানে না। তবু সে বিদেশীর মুখগুলোর দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল। এবং সারাক্ষণ সে মনে মনে বলতে থাকল: 'ওরা এসেছে!'

একটা ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে থাকল আনে। মাথায় কালো রুমাল-বাঁধা এক বুড়ী বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, জার্মানদের দেখে কাঁদতে কাঁদতে আবার ফিরে গেল। ভুরু পর্যন্ত রং মেখে দুজন গণিকা রাস্তায় টহল দিচ্ছে। হেসে হেসে এক অফিসারের উদ্দেশ্যে রুমাল নাড়াচ্ছে তারা।

ছুছু হঠাৎ খুশি মাখা গলায় বলল, 'মা, মা কত সৈন্য দেখেছ? বাবা আসছে, না?'

চিৎকার করে উঠল আনে: 'চুপ! ওরা জার্মান!'

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। ছুছু কাঁদছে। শক্ত করে ছুছুর হাত ধরে সরু পথ দিয়ে আনে উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

কী অসহ্য দুপুরের রোদ! রাস্তার নোংরাগুলো রোদের মধ্যে পচছে। প্রত্যেক বাড়ীর বাইরেই একটা করে ডাস্টবিন। তিন দিন আগে, যে সময়ে পথে লোকজন ছিল, এই ডাস্টবিনগুলো বের করে দেওয়া হয়েছিল বাইরে। স্কুলের ফটকের কাছেই একটা মরা জানোয়ার পড়ে আছে। পচা মাংসের বিশ্রী গন্ধে রাস্তার হাওয়া ভারাক্রান্ত। লেড়ি কুত্তারা পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে হন্যে হয়ে ফুটপাথ শুঁকে বেড়াচ্ছে, আর আকাশের দিকে নাক তুলে কেঁউ কেঁউ করছে।

বারান্দায় রিকেকে দেখতে পেল আনে। চিৎ হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে আছে। আধ-খোলা একটা দরজার একাংশ আঁকড়ে ধরে আছে দু হাতে। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে জিভটা।

'কী হয়েছে কাকার?' প্রশ্ন করল ছুছু।

আনে কোন উত্তর দিল না।

যুদ্ধ-সংগীতের জোরালো সুর ভেসে আসছে রাস্তা থেকে।

৩০

আঁদ্রে পেছনে পড়ে রইল। যখন সে জানতে পারল জার্মানরা পারীতে এগিয়ে আসছে তখন ট্রেন বা গাড়ী পাওয়া আর সম্ভব নয়। চোট-লাগা পা নিয়ে হেঁটে যেতেও পারবে না সে। যে বাড়ীতে সে থাকে সেখানে একটা মানুষও আর অবশিষ্ট নেই। দু দিন ধরে জার্মানদের যুদ্ধ-সংগীত ও সৈন্যদের বুটের শব্দ শুনল সে। ঘরে কোন রকম খাদ্য নেই, তবু ক্ষুধার্ত বোধ করল না। কি ঘটেছে তাও বুঝে দেখবার চেষ্টা করল না; ওপড়ানো গাছের মত সোফায় শুয়ে রইল আর মাঝে মাঝে ঝিমোতে লাগল! এত স্বপ্ন সে জীবনে কোনদিন দেখেনি। নানা রকম স্বপ্নের একটা সংমিশ্রণ। আঁদ্রে স্বপ্নে দেখল, আপেল বাগানে এক মেশিনগানের ধারে সে শুয়ে

আছে আর তার বাবা তার হাতে কার্তুজের পেটি তুলে দিচ্ছেন। হঠাৎ বিয়ের বাসরের দৃশ্য ভেসে উঠল। তার হাতে সাইডার মদ দিচ্ছে নিভেল; আর জিনেৎ বলছে, 'এইমাত্র বিয়ে হল আমার।' কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে হল? আঁদ্রে ঘুম থেকে উঠে স্বল্পালোকিত স্টুডিওর চারদিকে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল। সে তো পারীতে বসে আছে। আর পারীর চারদিকে আছে জার্মানরা।

রাস্তা থেকে জার্মান সৈনিকদের হেঁড়ে গলা তার কানে আসে। জানলা থেকে দূরে থাকার দরুণ ওদের মুখোমুখি হয়নি সে। আঁদ্রে মনে মনে বলল, 'কী দুর্ভাগ্য যে আমি মারা যাইনি!'

তৃতীয় দিন দরজায় শব্দ শোনা গেল। আঁদ্রে উঠে পড়ে নিজেকে পরিপাটি করল একটু! কে হতে পারে? নিশ্চয়ই জার্মানরা ছাড়া আর কেউ নয়। সজাগ হয়ে উঠল আঁদ্রে। কিন্তু দরজা খুলে দেখল যে একটা চোখে কালো ব্যাণ্ডেজ বেঁধে লরিএ দাঁড়িয়ে আছে।

'ও তুমিও তাহলে রয়ে গেছ?' আঁদ্রে বলল।

'যেতে পারলাম না। আমার যা কিছু সবই দিতে চেয়েছিলাম—টাকা আর ঘড়ি। একটা লোক তার গাড়ীতে আমায় নিতে চেয়েছিল কিন্তু হঠাৎ সে মত বদলাল। আমার মা বুড়ী হয়েছেন। তাঁকে একা ছেড়ে যেতে পারলাম না। আঁদ্রে, কী ঘটে গেল বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝিনি। বুঝতে চাইও না।'

'আমরা তো একটা ছোট্ট পাহাড়কে রক্ষা করেছি। কিন্তু অন্যেরা কী করেছে? ওরা এমনিই ছেড়ে দিয়েছে পারীকে।'

আঁদ্রে নিরুত্তর রইল।

'তুমি কি একা আছ এখানে?' জিজ্ঞাসা করল লরিএ।

'হাঁ একাই। জার্মানরা আসার পর আমি আর বাইরেও বের হইনি। কিন্তু বাইরে বেরতে হবে, তামাক শেষ হয়ে গেছে।'

রু শের্স্ মিদি একেবারে জনমানবহীন। তামাকের দোকান বন্ধ। আঁদ্রে হঠাৎ থেমে মনে মনে ভাবল, 'কী অদ্ভুত সুন্দর!' শহর যেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। ভোরবেলার ম্লান আলোয় ছাড়া আর কখনো আঁদ্রে রাস্তাগুলোকে এমনটি দেখেনি। কিন্তু এখন তো দুপুর—ঝলমলে রোদ আর ছোট ছোট ছায়া। আর চারদিকে কী গভীর প্রশান্তি...পম্পেইর রাস্তা দিয়ে টহলদারদের হাঁটবার

সময়ে নিশ্চয়ই এমনি মনে হয়। টহলদারদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু সে আর লরিএ তো এখানকার বাসিন্দা।

'আমরা যেন খানিকটা পম্পেইর অবস্থাতেই বাস করছি।' আঁদ্রে লরিএকে বলল আর হেসে উঠল ক্লান্তভাবে।

পার হয়ে এল তারা দুধের দোকান আর পাইপের দোকান,—এই দোকানের পাইপগুলো আঁদ্রে ভারী তারিফ করত এক সময়। প্রাচীন সংগ্রহের দোকান, যেখানে বুড়ো বোয়ালো চিনেমাটির মেষপালিকা-মূর্তির ওপর থেকে ধুলো ঝাড়ত, আর একটু এগিয়েই যোসেফিনের রেস্তোরাঁ—যোসেফিন মাংসের কোর্মা পরিবেশন করত ওখানে। কিন্তু ওখানে ওটা কি জিনিস? বাড়ীর এক কোণে সামনের দিকে পেলিকেন পাখী তার বাচ্চাদের রক্তপান করাচ্ছে। পাখিটার বয়স পাঁচশো বছরেরও বেশী, নিশ্চয়ই সে অনেক কিছুই দেখেছে। কিংবা হয়ত কিছুই দেখেনি—কেবল বাচ্চাদের খাইয়েছে, অন্যদিকে তাকাবার ফুরসতই পায়নি।

লরিএ তার মা-র কথা বলল, 'মা কেবলই জিজ্ঞাসা করে বেহালা দিয়ে কি করবি? কিছুই করবার নেই যদি না জার্মানদের বিয়ের উৎসবে বেহালাটা বাজাই।'

আঁদ্রেকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্যে হাসতে চেষ্টা করল সে। বোমাবিধ্বস্ত বাড়ীর মত দেখাচ্ছে চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখখানা। আঁদ্রে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রুটির দোকানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। হঠাৎ নিজেকে ক্ষুধার্ত মনে করল আঁদ্রে। দুজনে ভেতরে ঢুকল। চমৎকার ফিটফাট দোকানটা; সাঁ্যা জেরম্যাঁ অঞ্চলের বাড়ীগুলোয় খাবার যায় এখান থেকে। পঞ্চাশ বছর বয়স্কা, গালে রং-মাখা দোকান-কর্ত্রী একজন মহিলা খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলছে।

দোকান-কর্ত্রী বলছে, 'সবাই বলত—বর্বররা আসছে। কিন্তু ভয়ানক ভদ্র ওরা, প্রত্যেকটি জিনিস দাম দিয়ে কেনে।'

'আমাদের গিন্নী বলে—ওরা ঠিক শৃঙ্খলা রক্ষা করবে আর মজুরদের দিয়ে কাজ করাবে। কথাটা ঠিক বটে!'

আঁদ্রে একমুখ মিষ্টি রুটি খেতে খেতে বলল, 'বেশ খাসা গিন্নীটি তোমার!

কেশিয়ার ফিসফিস করে বলল, 'ও হল মাদাম মিয়েজারের বাড়ীর চাকরানী। দামটা কিসে দেবেন আপনি—ফ্রাঁ না মার্ক-এ?'

আঁদ্রে হেসে বলল, 'আমার কাছে একটাও ফ্রাঁ নেই। একটা ফ্রাঁও রোজগার করতে পারিনি। আমি তো আর মঁসিয় মিয়েজার নই!'
ব্যঙ্গটা ধরতে না পেরে কেশিয়ার ব্যবসায়ী ভঙ্গীতে বলল, 'ওরা বলে মার্কগুলো নাকি খাঁটি নয়। জার্মানীতে নাকি এ টাকা অচল। আমার মনে হয়, কথা-গুলো একেবারে ভুঁয়ো। রীতিমত ভদ্রলোক ওরা, অচল টাকা ওরা কক্ষনো দেবে না।'

লরিএর পিঠ চাপড়াল আঁদ্রে।
'কথাগুলো শুনলে? মাদাম মিয়েজার। আমাদের লেফটেনেণ্ট ফ্রেসিনে এদের উদ্দেশ্য আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। লোকটা গুলি করে আত্মহত্যা করেছে এতে অবাক হবার কিছু নেই। ও বেঁচে গেছে কিন্তু তুমি আমি কী করব?'

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল আঁদ্রে—এই রাস্তার প্রতিটি বাড়ী আর ল্যাম্পপোস্ট তার পরিচিত, কিন্তু এখন তার নিজের শহরে নিজেকে কেমন বিদেশী মনে হল।
মিষ্টি রুটি খেয়ে খিদে পেয়ে গেছে আঁদ্রের। তারা দুজনে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। সমস্ত টেবিলগুলিই জার্মানরা অধিকার করে বসে আছে। পেটুকের মত খাচ্ছে সবাই, বড় বড় ডিশগুলো গোগ্রাসে গিলছে আর বিয়ার ও শ্যাম্পেন পান করছে। ভোজে মত্ত হয়ে আছে বিজয়ীরা। উৎসবের আবহাওয়া। তার প্রকাশ পতাকা-সজ্জা বা বিউগল-ধ্বনির মধ্যে নয়—ক্ষমতায় মদমত্ত মানুষের লোলুপ আহার আর উদ্গীরণের মধ্যে। দশটি ডিমের তৈরী এক-একটি অমলেট। প্রত্যেকটি লোকের জন্যে একটা পুরো মুরগী। পাঁচ বোতল শ্যাম্পেন। নতুন মার্কের নোটগুলো খস খস করছে চতুর-চক্ষু খোসামুদে রেস্তোরাঁ মালিকের হাতের মধ্যে।

আঁদ্রে আর লরিএ তাদের প্রতিবেশীদের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করল। নীরবে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তারা খেয়ে যেতে লাগল যেন কোন একটা কঠিন কাজ করছে তারা। হঠাৎ লরিএ প্লেটটি সরিয়ে রাখল, কেমন বিবর্ণ দেখাল তাকে।
আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার?'
'ওটা দেখেছ?'

একটা বড় আয়নার দিকে আঙুল দেখাল লরিএ যার ওপর লেখা আছে:
'ইহুদীদের আহার পরিবেশন নিষিদ্ধ।'

'ওতে কি হয়েছে ?' আঁদ্রে বিড় বিড় করে বলল। 'নতুন প্রভুদের সম্মানে জায়গাটাকে সাজিয়েছে ওরা।'

'হাঁ, কিন্তু আমি......' মুহূর্তের জন্যে এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠল লরিএ যে তার কথা আটকে গেল, 'আমি একজন ইহুদী—! আগে এ কথা কোনদিন মনে হয়নি আমার।'

আঁদ্রে তার খাওয়া শেষ না করেই উঠে দাঁড়িয়ে দামটা দিয়ে দিল। দোকান মালিক তাড়াতাড়ি ছুটে এসে অনুনয় করে বলল, 'ভাল করে খেয়েছেন তো, মঁসিয় ?'

আঁদ্রে তার দিকে বিরক্তভাবে তাকিয়ে বলল, 'ঐ বিজ্ঞপ্তিটা কি আপনি টাঙিয়েছেন ?'

লোকটা ফিসফিস করে বলল, 'এতে আমার কোন হাত নেই। খদ্দেরদের কথা বিচার করতে হবে আমাদের। ভাববেন না যে আমি...........ওটা শুধু ওদের জন্যেই।'

লরিএ তার একটা তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে তার দিকে তাকাল, তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চোখের ওপর আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আর এটা কিসের জন্যে ? ওদের জন্যে না আমাদের জন্যে ?'

নীরবে তারা বেরিয়ে এল! কী কথা বলবে এখন ?—পাহাড়ে মেশিনগানের পাশে শুয়ে দিন কাটছিল যখন তাদের, তখন তারা ছিল স্বাধীন মানুষ আর এখন তারা আত্মসমর্পণ করেছে জার্মানদের কাছে। তাদের হাত ঘড়ি আর দেওয়াল ঘড়িগুলোকে এখন বার্লিনের সময় মেনে চলতে হবে—দেওয়ালে তারই নির্দেশ-নামা। জার্মানদের চিন্তাধারা ও হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে এখন তাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কিন্তু তারপর তারা কী করবে ? জার্মানদের বিবাহ উৎসবে বেহালা বাজাবে ? তুলি দিয়ে বার্লিনের হিসাবরক্ষকদের রুবেন্সের মত মহাভোজের চিত্র আঁকবে ? আঁদ্রে মনে মনে ভাবল, 'না' আজ আর এখানে তুলি, নীহারিকা, জিনেৎ কিছুই নেই।'

চতুরচক্ষু এক মাতাল ভবঘুরে বেঞ্চীর ওপর বসে আছে! তার পাশেই খাড়া হয়ে আছে একটা বোতল।

'শান্তি ?' নেশায় বুঁদ হয়ে লোকটা বকে চলেছে, এক টুকরো কাগজ দাও আমায়, আমি সই করে দিচ্ছি। কেনই বা সই করব না ? গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একেবারে, একটু মাল দাও দিকি বাবা।'

তরুণ জার্মান সৈনিকরা রু শের্‌স্ মিদি দিয়ে মার্চ করে চলেছে। ওদের চোখ-গুলো চকচকে আর ফাঁকা। চিৎকার করে গান করছে ওরা আর পুরনো ধূসর বাড়ীগুলো সে গান শুনছে—যে গান তাদের কাছে দুর্বোধ্য। একজন সৈন্য দাঁড়িয়ে পড়ে ফাটলের মত একটা সংকীর্ণ গলির দিকে তাকিয়ে দেখল। হেসে উঠল ও, 'কী নোংরা শহর! আর একেই পারী বলে ওরা! জায়গাটা নিগ্রোদের উপযুক্ত!'

তারপর এগিয়ে গেল লোকটা।

আঁদ্রে বলল, 'আমরা এখনো ভাবছি আমাদের কী করা উচিত। সোজা কথা—পারীকে সাফ করতে হবে আমাদের; এখন এ জায়গাটা নিগ্রোদেরও নয়, ফরাসীদেরও নয়।' আঁদ্রের বাড়ীর কাছে এক গয়লানী তার দুই বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জার্মানদের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জলের মধ্য দিয়ে আঁদ্রেকে অভিবাদন জানাল স্ত্রীলোকটি। বলল 'ভেবে দেখ একবার, এ আমি কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারব না।'

সৈন্যদের মধ্যে থেকে একজন মাঝ বয়সী ক্লান্ত চেহারার লোক গয়লানীর কাছে এগিয়ে এসে কী যেন বলল, তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল যেন। ওর ভাষা বোধগম্য হল না গয়লানীর কাছে। লোকটা একটা ছবি টেনে বের করল নিজের পকেট থেকে। ছবিতে সৈনিকটি রবিবারের পোষাক পরা অবস্থায় চারজন ছেলেমেয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছে। তাকে বোঝানোর জন্য চারটে আঙুল তুলে ধরল ও। গয়লানীর ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত দিতে চাইল, কিন্তু ভয়ে মার পেছনে আত্মগোপন করল তারা। সে ওকে ধন্যবাদ জানাল, এমন কি হাসি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করল কিন্তু সৈনিকটি চলে গেলে আঁদ্রেকে বলল, 'সব চেয়ে সাংঘাতিক কথা—ওকে দেখে মুহূর্তের জন্যে দুঃখ হয়েছিল আমার। এখন আর আমাদের দুঃখ বোধ করা উচিত নয়। এখন আমাদের..............'

আবার চোখের জলে ফেটে পড়ল সে। কী সে বলছে কিছুই বুঝল না আঁদ্রে। শ্লথ গতিতে, ভারী পদক্ষেপে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আঁদ্রে উঠে গেল।

'এখন কুঠুরীতে ফিরে আসা গেছে। ধূমপান করা যাক। জানি না আমরা কি করতে পারব। ১৯৩৬ সালে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম, অন্তত ভেবেছিলাম যে বুঝতে পেরেছি। পিয়ের বলে আমার এক বন্ধু ছিল। স্ট্রাসবুর্গের কাছে ও মারা গেছে। না, পিয়েরকে পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ওর উদ্দীপনা ছিল, আর ছিল বিশ্বাসের জোর। তখনকার সময়ে জনসাধারণও ছিল

আশাবাদী। ওরা কথা বলত, তর্ক করত আর হাসত। কিন্তু এখন তুমি আর আমি একা। তুমি যদি জানতে কি রকম হতবুদ্ধি হয়ে গেছি আমি! প্রত্যেকটি লোকই ধাঁধিয়ে গেছে। বেঁচে থাকা সম্ভব কি না এ কথা নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। এদিকে পারীতে এসে গেছে জার্মানরা।'

লরিএ নিরুত্তর। দীর্ঘ সময় তারা মুখোমুখি বসে রইল আর নীরবে ধূমপান করল। বাইরে থেকে ভেসে এল উচ্চ সংগীতের শব্দ আর তারপর সেই সংগীত উচ্চশ্রাবী হয়ে উঠল।

৩১

ভোর না হওয়া পর্যন্ত জিনেৎ হেঁটে চলল। পদশব্দ, ছেলেমেয়েদের কান্না আর দুরাগত গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল অন্ধকারে। সকালবেলা মুসড়ানো ঘাসের ওপর অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল জিনেৎ আর তার সঙ্গীরা। কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর পর আবার সে বিস্ফোরণের শব্দে উঠে বসল। লাফিয়ে উঠে দেখল দূরে ধোঁয়া দেখা দিয়েছে। লোকেরা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে, যেন মিশিয়ে যেতে চাইছে মাটির সঙ্গে। পরে একটা ছোট্ট মেয়ে পেটে গুলি লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল। পরিশ্রান্ত হয়ে ক্ষত পা নিয়ে আরো বিশ মাইল পথ হাঁটল জিনেৎ। তার পা দুটো যন্ত্রণায় ভারী হয়ে উঠেছে, খিদেয় কাতর বোধ করছে সে। সঙ্গীদের সঙ্গে যখন সে একটা গ্রামে এসে পৌছল, গ্রামটা তখন একেবারে পরিত্যক্ত। গ্রামের সমস্ত লোক পালিয়ে গেছে। একটা বন্ধ দোকানের বাইরে সবাই জড়ো হল—কে একজন চিৎকার করে উঠল: 'এতে কোন দোষ নেই। দু-দিন আমার ছেলেমেয়েরা কিছু খেতে পায়নি।'

দোকানটা লুট করল তারা। বোতল আর টিন নিয়ে টানাটানি করল। এক বুড়ি জ্যাম লেপে দিল তার সর্বাঙ্গে। একজন মজুর জিনেতের হাতে এক টিন ফলের মোরব্বা আর কিছু বিস্কুট দিল। জিনেতের ভয়, এ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে সে হেঁটে এসেছে তাদের থেকে পিছিয়ে পড়বে সে। সঙ্গীদের থেকে পিছিয়ে পড়বে শুধু সেই ভয় নয়, এমন কি অনেক কিছু সে হারাবে—বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির ধবধবে শাদা চুল, ছোট ছেলেটির নাবিকের মত কোট আর সশব্দ কেটলিশুদ্ধ হাতগাড়ী। জিনেৎ তার সঙ্গীদের ধরবার জন্য দৌড়ল আর খেতে থাকল সঙ্গে সঙ্গে।

পাশের গ্রামে এখনো কিছু চাষী রয়ে গেছে। একটা বাড়ীর দরজার সামনে একজন লোক আর তার বৌ দাঁড়িয়ে। জিনেৎ এক গ্লাশ জল চাইল তাদের কাছে।

ক্রুদ্ধ হয়ে বৌটা বলল, 'এটা পারী নয়। কুয়ো থেকে জল তুলে আনতে হয় আমাদের। এক ফ্রাঁ দক্ষিণা দাও।'

স্বামী বৌয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল যেন তাকে আগে কোনদিন দেখেনি। তারপর চিৎকার করে উঠল : 'হতভাগী!'

ইঞ্জিনের শব্দে ভারী হয়ে উঠল আকাশ। লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। গরম ধুলো এসে ঢেকে দিয়ে গেল জিনেৎকে। আবার যখন সে চলতে আরম্ভ করেছে, তখনো তার কানে আসছে বৌটার প্রাণান্তিক আর্তনাদ। মারা গিয়েছে তার স্বামী।

পথের ধারে কতকগুলো সৈন্যের সঙ্গে দেখা হল। আশ্রয়প্রার্থীরা জিজ্ঞাসা করল, 'জার্মানরা কত দূর? আমরা কি লয়ার নদীর বাঁ দিকে প্রতিরোধ করব?'

'প্রতিরোধ না আর কিছু!' সৈন্যরা বলল, 'কে জানে ওরা কি করবে। কর্নেল তো সরে পড়েছে। ওরা বলছে বাঁ দিকে নাকি এসে গেছে জার্মানরা। ঐখানেই আমাদের শেষ। এ তো খুব সহজ কথা। দালাদিএ এর জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ পেয়েছে। সেই অনুসারে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যাচ্ছে ওরা। হারামজাদারা! গর্দান নিলেও ওদের উচিত শাস্তি দেওয়া হবে না।'

সৈন্যদের মধ্যে একজন তরুণ সৈনিকের মাথায় বিরাট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জিনেতের কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'প্রথমে স্পেন। তারপর চেকরা। এ সবের জন্যে কে দণ্ড দিচ্ছে? আমি। আমি এর শাস্তি ভোগ করছি। ওরা তো বোর্দোতে সরে পড়েছে। বলতে পার একটা লোক আর কতটা সহ্য করতে পারে?'

জিনেৎ তার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে উত্তর দিল : 'অনেকটা।'

রাত্রে আশ্রয়প্রার্থীরা গির্জায় আশ্রয় নিল। গির্জার মধ্যে ধূপ আর শুকনো ফুলের গন্ধ।

একজন মহিলা জিনেতের পাশে সংকুচিত হয়ে বসে তার শিশুকে সযত্নে মাই খাওয়াচ্ছে। এক বুড়ী তার কপাল কুটছে বেদীর কাছে বসে। সকাল হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল বাড়ীটা। রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত

হয়ে এল সূর্যের বেগুনী রঙা আলো। বুড়ী তার তীক্ষ্ণ নাক গুম্বজের দিকে লক্ষ্য করে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। কেউ জানল না সে ঘুমুচ্ছে না মরে গেছে।

জিনেৎ বসে বসে ঝিমোচ্ছে। টুকরো টুকরো স্মৃতি যাওয়া আসা করছে তার মনের মধ্যে, বিশেষ করে সেই জুলাই-এর রাত্রি যখন সে আঁদ্রের সঙ্গে সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল......নাগরদোলার সেই ঝলমলে নীল হাতী, লণ্ঠন আর ঝাঁকড়ামাথা বাদাম গাছের নীচে চুম্বন।

উঠে বসল সবাই আর বিড় বিড় করতে করতে পথ ধরে এগোল। বুড়ীরাই কেবল পড়ে রইল রোদ-ঝলমলে চুনকাম-করা গির্জার মধ্যে।

দুপুর বেলা পাহাড়ের ওপর থেকে জিনেৎ দেখতে পেল স্ল্যারির দৃশ্য। সেখানকার নদীর বুকে চিকন ঢেউগুলো পর্যন্ত তার দৃষ্টি এড়াল না। জিনেৎ মনে মনে বলল, 'আমি বেঁচে গেছি।' অন্যান্য পথযাত্রীদের মত সেও মনে করল, লয়ার পার হলেই ওপারে জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

চারদিকে পোড়া আর ফেলে আসা মোটর গাড়ী ইতস্তত ছড়ানো। সমস্ত গাছ-পালা ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। টেলিগ্রাফের তারগুলো টুকরো টুকরো হয়ে হয়ে পড়ে আছে। একটা ঘোড়ার মৃতদেহের ওপর হোঁচট খেল জিনেৎ। তার বড় বড় হলদে দাঁতগুলো বাইরে বেরিয়ে আছে, দেখে মনে হয়—ঘোড়াটা হাসছে।

রাস্তার ধারে বসে আছে একজন আহত স্ত্রীলোক। আরেকজন স্ত্রীলোক প্রথম স্ত্রীলোকটির পাশে বসে হাত দিয়ে তার চোখ দুটো ঢেকে আছে। গিয়ঁ শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। চাটু, বই আর সৈনিকদের রসদের ঝুলি স্তূপের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। অক্ষত দেওয়ালে একটা ঘোষণাপত্র লটকান, 'লয়ারের দুর্গগুলি ফ্রান্সের মুক্তার সমতুল্য।'

জিনেৎ কোন মতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলেছে। আগুন ঝলসানো সূর্য। পাথরের স্তূপের ভেতর থেকে অস্বাস্থ্যকর গন্ধ আসছে: তার নীচে চাপা পড়েছে অসহায় মানুষ। এখানে ওখানে মানুষের মাথা, মেয়েদের জুতো-পরা দুটো পা বা বৃদ্ধ লোকেদের হাত বাইরে বেরিয়ে আছে। জিনেৎ পাগলের মত অগ্রসর হয়ে চলল। কোনও দিকে তাকিয়ে দেখল না—নদীর উদ্দেশ্যে চলেছে সে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠল জিনেৎ। সাঁকোটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা পাথরের ওপর বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। কয়েক

দিন আগে সে ট্রেনের প্রতীক্ষা করেছিল ; কেমন একটা স্থূল একাগ্রতা পেয়ে বসেছিল তাকে, চারদিকে দেখবার বা চিন্তা করবার কিছু পায়নি। আর যখন জার্মান বোমারুরা আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর মেশিনগান চালিয়েছে, সেই জায়গা থেকে জিনেৎ এতটুকুও নড়েনি। সকাল পর্যন্ত সেইখানেই বসে থাকত সে যদি না তার সঙ্গীরা এসে তাড়া দিত তাকে। একই দুর্ভাগ্য তাদের সবাইকে সম-ব্যথী করে তুলেছে। তারা সবাই খাবার ভাগ করে খায়, আহতদের বহন করতে সাহায্য করে, এমন কি একটা বুড়ীর কুকুরকে পর্যন্ত পেছন থেকে খুঁজে এনে দিয়েছে তারা।

কে যেন জিনেৎকে বলল, 'কতকগুলো ডিঙ্গি আছে ওখানে।' জিনেৎ উঠে বসে ভীড়ের পিছু নিল।

নদীর ওপারে গিয়ে হাসিতে উপচে উঠল জিনেৎ। গাছপালাদের বলতে চাইল, 'এই যে, বেঁচে ফিরে এসেছি আমি!'

একটা পাহাড়ে উঠতে চেষ্টা করল যদিও একটা পদক্ষেপের পর আরেকটা পদক্ষেপ ফেলার শক্তি নেই তার।

'জিনেৎ!' কে যেন তাকে ডাকল।

নোংরা, না-কামানো চেহারার সৈনিকটি যে লুসিয়ঁ—এটা বুঝতে কিছুটা সময় নিল জিনেৎ। জিনেতের করমর্দন করল লুসিয়ঁ। হেসে উঠল, চার বছর ওরা পরস্পরে মিলিত হয়নি। কেবল একবার থিয়েটারের হলঘরে তাকে দেখেছিল লুসিয়ঁ আর তারপর তার অলক্ষ্যে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। আর এখন আনন্দে উচ্চহাস্য করছে সে, এই সময়ে জিনেতের দেখা পাওয়াটা কী আনন্দের! হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তার সাক্ষাৎ পাওয়াটা ভাগ্যের কথা। লুসিয়ঁ ভাবল, জিনেতের প্রতি তার ভালবাসা থেকে কোনদিন নিরস্ত হয়নি সে। সেই ষড়যন্ত্রের খেলা, জেনী আর বালির স্তূপের ঘটনার পর যা ঘটেছে তা সমস্তই একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন মাত্র। আর এখন কথা বলছে জিনেৎ, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে সে!

'লুসিয়ঁ! কী হয়েছে বলত? রীতিমত ভয়াবহ ব্যাপার সব! নদীর ঐ পারে ওরা নারী শিশু সবাইকে মেরেছে,—এইমাত্র মারা গেল একটা ছোট্ট ছেলে। কিছুই বুঝছি না।' জিনেৎ বলল।

বিদ্রূপের হাসি হাসল লুসিয়ঁ। বলল, 'শুধু এই রাস্তাতেই বিশ হাজার আশ্রয়-প্রার্থী মারা গিয়েছে। আর এর মত কত রাস্তাই না আছে! উত্তরদিকে সমস্ত

ব্যাপার আমি নিজের চোখে দেখেছি। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে আমরা সৈন্য চলাচল করতে পারিনি। আর জার্মানরা ঠিক ঐ আশ্রয়প্রার্থীদের মুখোমুখি ছিল। বুঝতে পারছ? চক্রান্তকারীরা এইই চেয়ে এসেছে প্রথম থেকে। সৈন্য বাহিনীকে ফাঁদে ফেলে চম্পট দিয়েছে ওরা। আমাদের একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে। ঐ চক্রান্তকারীদের মধ্যে আমার বাবাও একজন। কতবার উনি বলেছেন—জার্মানরা এলে খুব ভাল হয়। এবার সেই 'ভাল'কে পেয়েছে ওরা!'

বিষণ্ন হয়ে জিনেতের হাত স্পর্শ করল লুসিয়ঁ। বলল, 'তোমাকে এগোতে হবে। জার্মানরা বোমা ফেলবে এবার। এক পাল সৈন্য দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ওদের সঙ্গে ক-জন অফিসার আছে জানো? তিনজন। বাকী সবাই পালিয়ে গেছে। ওরা বলছে পাহাড়টাকে ওরা রক্ষা করবে। আমার তো বিশ্বাসই হয় না। এইই তো দেখছি সব সময়ে। আমরা ট্রেঞ্চ কাটি আর অপেক্ষা করি তারপর পিছু হটার নির্দেশ আসে। জার্মানরা আসে আর বোমা ফেলে। হাঁটা শুরু কর, জিনেৎ।'

'লুসিয়ঁ তুমি কি এখানে থাকবে?'

'আমি? আমি তো ডানকার্কেও ছিলাম। মৃত্যুই আমার পক্ষে ভাল।'

'কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি। আমি বাঁচতে চাই, লুসিয়ঁ।'

লুসিয়ঁকে একটা উষ্ণ চুমু দিয়ে নিজের পথ ধরল জিনেৎ। পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে থেমে দাঁড়াল। অস্তগামী সূর্যটা কেমন প্রকাণ্ড আর রক্তাভ। পাহাড়ের ওপর থেকে ধ্বংসাবশেষগুলো চোখে পড়ে না, সারা পৃথিবীটা মনে হয় কেমন শান্ত, চারদিক কেমন সবুজ আর সতেজ। দূরে চওড়া অগভীর লয়ার নদীটা ঝলমল করছে অলসভাবে। ছোট ছোট বালিয়াড়ি দ্বীপগুলো ঝোপঝাড়ে ঢাকা। জিনেতের কাছাকাছি দুটো গাছ সান্ত্রীর মত স্থিরভাবে পাহারা দিচ্ছে, ঘন কালো পাতাগুলোর নক্সা আকাশের বুকে খোদাই করা। দূরের গাছগুলো ঘন নীল। বাবুই পাখী ঘাস খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। অনেক দূরে একটা কুকুর ডাকছে নীচু গলায়। একটা পরিত্যক্ত ছোট্ট শাদা বাড়ী নিরুপদ্রব আশ্রয়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে হাতছানি দিচ্ছে তাকে। ব্যাগ থেকে একটা বিস্কুট বের করতে করতে জিনেৎ ভাবল: 'কী অদ্ভুত সুন্দর এই জায়গাটা!' জীবনের অনাবিল আনন্দের কুহক পেয়ে বসল তাকে।

আবার সেই পরিচিত গুঞ্জন ধ্বনি শুরু হয়েছে। নিঃসংকোচে ঘাসের ওপর শুয়ে

পড়ল জিনেৎ। তার সঙ্গীরা আগে যে ভাবে শুয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে সেও সবার অলক্ষ্যে শুয়ে শুয়ে ঘাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইল নিজেকে। আর কী অদ্ভুত ঘাসের গন্ধ—তার শৈশব আর বসন্তের প্রথম উল্লাসের গন্ধ এই ঘাসের মধ্যে। ঢিপ ঢিপ করছে জিনেতের বুক। গুঞ্জনধ্বনি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেও জিনেৎ ভাবছে: 'নিশ্চয়ই কোন সুগন্ধী ঝাড় আছে কাছাকাছি। সুগন্ধী ঝাড়ের গন্ধ আসছে......'

জিনেতের মৃত্যু-যন্ত্রণা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তার জামাকাপড় আর চারদিকের ঘাস লাল হয়ে উঠল রক্তে। কেমন প্রশান্তি তার মুখে। বাতাসের ঝলকে তার দীর্ঘ ঢেউয়ের মত চুলগুলো নেচে উঠল। আর তার বড় বড় স্বপ্নীল চোখ দুটো তাকিয়ে রইল প্রথম পাণ্ডুর তারাগুলির দিকে।

৩২

'কক দ্য'অর রেস্তোরাঁয় স্পেনের রাজদূতের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে তেসা। ক্রমেই রীতিমত ক্লান্তিকর হয়ে উঠছিল তাদের আলোচনাটা। কিন্তু বোর্দোর রান্না ও রেস্তোরাঁর বিখ্যাত মদের ভাঁড়ার অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করল তাদের।

একটা ভয়ংকর সপ্তাহ অতিক্রম করতে হয়েছে তেসাকে। মন্ত্রীসভার সহকর্মীদের আসার দিন দুই আগে তুর-এ এসে পৌঁচেছে সে। আর সেই জন্তেই এমনি চমৎকার একটা থাকবার জায়গা সংগ্রহ করতে পেরেছে। অন্যান্য মন্ত্রীদের গৃহহীন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে শহরটা। রেনো রুজভেল্ট্‌কে কতকগুলো তার পাঠানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। তেসা রসিকতা করে বলল, 'আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইউনাইটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত হয়েছেন।' বিশৃঙ্খলা এতই বেশী যে রুজভেল্টের কাছে পাঠানো একখানা তার সারা রাত টেলিগ্রাফ আপিসেই পড়ে রইল। আর এ দিকে প্রতিদিন পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে এগিয়ে আসতে থাকল জার্মানরা।

তেসা ব্রতৈলের সঙ্গে দেখা করার বহু চেষ্টা করল। কিন্তু কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে সে, কিছুতেই তার সাড়া মিলছে না। ব্রতৈল জানিয়েছে যে তার স্ত্রী নাকি স্নায়বিক অসুস্থতায় ভেঙে পড়েছে। বাজে অজুহাত! তেসা বুঝে উঠতে পারল না ব্রতৈল নিজে কেন ভেঙে পড়েনি। একমাত্র লাভালই ফূর্তিতে

আছে; তার শাদা ধবধপে টাইটা দেখাচ্ছে ঠিক নতুন বরের প্রসাধনের মত। কিন্তু তেসাকে এতটুকু ভ্রুক্ষেপও করল না লাভাল। মন্ত্রীসভার অন্যান্য সভ্যেরা নির্বোধের মত রেনোর বাড়ী থেকে শহর পর্যন্ত ছুটোছুটি করে তাদের হারানো মাল পত্রের সন্ধান করল। সেক্রেটারীরা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা ?' মন্ত্রীরা তাদের প্রশ্ন আমলেই আনল না।

মন্ত্রীদের সভায় আপোষ আলোচনা শুরু করার সমর্থনে তেসা একটা প্রস্তাব আনল। রেনো বাধা দিয়ে বলল, 'মিত্রশক্তির সঙ্গে আমাদের যে সব বাধ্যবাধকতা আছে তার কী হবে? আমাদের অপেক্ষা করে দেখা উচিত রুজভেল্ট্ কি উত্তর দেয়। মাদেল তেসার দিকে একদৃষ্টে তাকাতেই তেসা চোখ ফিরিয়ে নিল। ও লোকটা সব কিছু করতে পারে। ওর ধারণা, তেসা বিশ্বাসঘাতক। এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জানে যে, মাদেল যাকে ধ্বংস করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তার মৃত্যু সংবাদ আগে থেকে লিখে রাখা যায়। মুখখানা কী বীভৎস—এক ফোঁটা রক্ত নেই মুখে! গুপ্তচর!

অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য জুটে গেল। জেনারেল পিকার্ সভায় যোগদানের দাবী জানাল, ভয়ানক জরুরী খবর দেবার আছে। সাধারণত সংযত পিকার্‌কে কেমন উত্তেজিত মনে হচ্ছে। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলল পিকার্ আর তেসা হঠাৎ লক্ষ্য করল তার একটাও দাঁত নেই। দাঁতগুলি কী করে হারাল? তেসা প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে জেনারেল কথা বলছে। পিকার্ বলেই চলেছে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমিউনিস্ট বিপ্লব। এক দল ছোট লোক গিয়ে দখল করছে এলিজে প্রাসাদ। ভীষণ আগুন লেগেছে......'

আতঙ্কে তেসার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। বোমা বা গোলাগুলিকে সে ভয় পায় না। এমন কি বন্দী জীবনকে কল্পনা করে তার সঙ্গেও সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ব্যাপারটা সত্যি ভয়াবহ কিন্তু জার্মানরা সংস্কৃতিবান মানুষ, মন্ত্রীর সঙ্গে কয়েদীর মত ব্যবহার করবে না ওরা। কেবল কমিউনিস্টদেরই সে ভয় করে। দেনিসের সঙ্গে কথা বলে এটুকু বুঝেছে তেসা যে, কমিউনিস্টরা তাকে ঘৃণা করে। ওরা ক্ষমতা পেলে হাড়িকাঠে তুলবে তাকে! আর তা ছাড়া ফ্রান্সের কী দুর্ভাগ্য! জার্মানরা যেদিন পারীতে ঢুকবে সেদিন কিনা উদযাপিত হবে জাতীয় শোক প্রকাশ দিবস। যাই হোক জার্মানরা কিন্তু কমিউনিস্টদের তুলনায় অনেক ভাল। এলিজে প্রাসাদে নিজেদের ঝাণ্ডা ওড়াবে জার্মানরা কিন্তু প্রাসাদকে এতটুকু স্পর্শ করবে না। আর কমিউনিস্টরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে

সাফ করে দেবে সমস্ত কিছু যেমন করেছিল ১৮৭১ সালে। এখনি আগুন জ্বালাতে শুরু করেছে। গোঁয়ার আর বন্য পশুর সমতুল্য ওরা!

ম্যাদেল পারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে আধ ঘন্টা পরে ঘোষণা করল, 'পারীতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।' পিকার্ প্রথমে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলেও শেষে আত্ম-সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল, 'অবশ্য! জেনারেল দেন্‌ৎস আমার বন্ধু। সামরিক নেতাদের মধ্যে ও একজন ক্ষমতাবান লোক। শত্রুকে যে-সব সন্ত্রাসবাদীরা সশস্ত্র বাধা দিতে চেষ্টা করবে তাদের গুলি করে মারবার জন্যে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে ও।'

তেসা বার বার বলল, 'তুর ছেড়ে যাবার সময় হয়ে এসেছে!' আরেকটা দিন গেল। আরো পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ অগ্রসর হয়ে এল জার্মানরা। ১৪ই জুলাই—কী ভয়ানক দিন আজ! তেসার বদ্ধমূল ধারণা—চোদ্দ নম্বরটা তার জীবনে অত্যন্ত মারাত্মক। চোদ্দ তারিখেই আমালি মারা গিয়েছে। নাপিতের দোকানে বসে বসে তেসা খবর পেল যে জার্মানরা পারী অধিকার করেছে। যদিও ঘটনার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েই ছিল তবু সমস্তটা গ্রহণ করতে কেমন যেন একটু বাধল। চিৎকার করে উঠল তেসা: 'কী দুর্ভাগ্য!' নাপিতও সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিল, 'চলে যান! চুল কাটতে মন লাগছে না আর!' নিশ্চয়ই লোকটা কমিউনিস্ট না হয়ে যায় না।

সন্ধ্যাবেলা তেসা বোর্দোয় রওনা হল।

মাত্র গতকালকার ঘটনা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একশো বছরের পুরনো। কত দীর্ঘ সময়ই না সে অতিক্রম করে এসেছে! একটা দিন থেকে আর একটা দিনকে আলাদা করে চিনবার ক্ষমতা নেই তার। জার্মানরা ক্রমাগতই এগিয়ে আসছে; লয়ারের ধারে এসে পৌচেছে ওরা। পারীতে যারা থেকে গিয়েছিল কী সৌভাগ্যবান তারা—তাদের পক্ষে সমস্ত কিছু চুকে গেছে! কিন্তু এখানে কিছু করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। চার্চিল ভয় দেখিয়ে সুবিধে আদায় করছে। গুজব রটেছে—দ্য গল নাকি বোর্দোয় এসে পৌচেছে। কে জানে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতেও পারে হয়ত! শহরে অনেক ডক-মজুর আছে। প্রেফেক্ট-এর ধারণা, ওরা নাকি ভয়ানক জীব। রেনোকে সরানো দরকার, কিন্তু লেব্রঁ্য এখনো মনস্থির করতে পারেনি। কেবল কাঁদছে বসে বসে। এখানে চোখের জলের কোন স্থান নেই। এখন সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় তা হল কড়া হাতের শাসন।

তেসাকে স্পেনের রাজদূতের সঙ্গে কথা বলতে বলল ব্রতৈল; বার্লিন থেকে আপোষের শর্তগুলো জানা দরকার। ব্রতৈল বলল, এই আলোচনার ওপরই অনেক কিছুই নির্ভর করছে। তেসা এই দৌত্যকর্মে একই সঙ্গে কেমন গর্বিত ও নিরুৎসাহ বোধ করল। স্পেন দেশের লোকটির সঙ্গে রসিকতা করতে চেষ্টা করল। রাজদূতটি বোর্দোর মদের প্রশংসা করায় তেসা কূটনৈতিক চালের সঙ্গে উত্তর দিল, 'আপনাদের 'রিওজাও' আমি খেয়ে দেখেছি। আমাদের শ্রেষ্ঠ মদের তুলনায় কোন অংশে খারাপ নয় ও মদ।'

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনাদের দেশের সেই যুগান্তকারী ঘটনার সময়ে আমার ছেলে সালামাঙ্কায় ছিল। অনেক ফ্যালাঞ্জিস্টদের সঙ্গেই গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল ওর, আর জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে ও নিজে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল।'

'উনি এখন কোথায়?'

'মারা গেছে। কমিউনিস্টরা খুন করেছে ওকে।'

মুরগীর রোস্ট 'আ লা ব্রোশ' খাওয়ার পর তেসা আসল কথা শুরু করল। বার্লিনের শর্তগুলি কী! প্রথমে অস্পষ্টভাবে উত্তর দিল স্পেন দেশীয় লোকটি—খুঁটিনাটি বিবরণ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হবেই, ফ্রান্সকে হেয় করার ইচ্ছা বিজেতাদের নেই। 'খুঁটিনাটি বিবরণ' যখন বলতে আরম্ভ করল লোকটি তেসার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল।

চিৎকার করে উঠল সে, 'এ সব কথা উঠতেই পারে না।'

'অবশ্য কতকগুলো বিষয় বদলানো যেতে পারে। আমি এক্ষুনি যা বললাম—আসল কথা হল সংযোগ স্থাপন করা। আপনাদের নৌবাহিনীর ভাগ্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। মার্শাল ক্ষমতা পাবার পর সে সমস্ত কিছু আয়ত্তে আনতে পারবে বলে বার্লিনের তেমন ভরসা হচ্ছে না। তা ছাড়া বিশেষ করে মরোক্কো আর সিরিয়ার অপ্রীতিকর মনোভাবে বার্লিন রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছে।'

'ও শুধু ভুল বোঝাবুঝির ফল। ভের্দ্যর বীরের মত প্রভাব ফ্রান্সে আর কারো নেই।'

'তাহলে তো ভাল কথা......ঠিকই বলেছেন আপনি। এখানকার আর্মাঞাকটা দেখছি সত্যিই খাসা।'

স্পেন দেশীয় লোকটির সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার পর ব্রতৈলের কাছে গেল তেসা।

বলল: 'জার্মানরা একেবারে পাগল। এমন শর্তের কথা জীবনে কেউ কোন দিন শোনেনি। আমি তো সোজা কথা বলছি—শর্তগুলো অসম্মানকর! আমার মনে হয় রেনোই ঠিক—শেষ পর্যন্ত আমাদের ম্যাডাগাস্কারে কেটে পড়তে হবে।'

তেসা যখন দেখল ব্রতৈল জার্মান শর্ত শুনে এতটুকু বিস্মিত হল না, সে থিতিয়ে গেল। বলল, 'অবশ্য জিনিসটাকে অত্যন্ত সাবধানে বিচার করতে হবে আমাদের। আর তাছাড়া প্রথমে যতটা ভয়াবহ মনে হয়েছিল আসলে ততটা ভয়াবহ নয় কিন্তু। আমার শুধু মনে হয় শর্তগুলি এখনই প্রকাশ করা উচিত হবে না। আগে আমরা দস্তখৎ করে দিই তারপর ছেপে বের করব। নইলে কমিউনিস্টরা এই নিয়ে একটা গোল বাধাবে। কিংবা দ্য গল একটা কিছু করবে। ভাল কথা, ও এখন বোর্দোয় বসে আছে। জানা দরকার বসে বসে কী করছে লোকটা। হ্যাঁ, আগামী কয়েকটা দিন আমাদের পক্ষে সংকটজনক। কিন্তু পরে সমস্ত কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে।'

সন্ধ্যাবেলা রেনো পদত্যাগ করল। তেসা পেতঁ্যাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 'বিজয়ীর গৌরব লাভ করেছেন আপনি।'

কাঁপা ও জীর্ণ গলায় মার্শাল উত্তর দিল, 'ধন্যবাদ।'

গভীর রাত্রে তেসা জোলিওকে নতুন মন্ত্রীসভার নাম খুলে বলল। ছোট্ট বেঁটে খাটো সম্পাদকটি ইতিমধ্যে বোর্দোয় এসে 'লা ভোয়া নুভেল'-এর একটা ক্ষুদে সংস্করণ বের করতে সমর্থ হয়েছে।

'অবশ্য মন্ত্রীত্ব সংকটটা নিয়ম মাফিক কেটে যায়নি। মার্শাল নিজের একটা তালিকা তৈরী করে রেখেছিলেন। চেম্বারে অবশ্য তা ঘোষণা করা সম্ভব হবে না। উপায় নেই—বর্তমানে আমাদের অবস্থা আশ্রয়প্রার্থীদের মত।'

'জার্মান শর্তগুলি কী?' জোলিও জিজ্ঞাসা করল।

'ও সম্পর্কে আমি কিছু বলব না—ব্যাপারটা গোপন আছে এখন। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে শর্তগুলো আমাদের মর্যাদাহানিকর নয়। অন্য কিছু হলে মার্শাল তা গ্রহণই করত না।'

সন্দেহে চোখ ছুটো কোঁচকাল জোলিও। বলল, 'মর্যাদাটা অবশ্য একটা স্থিতি-স্থাপক জিনিস। আমি যেটুকু জানতে চাই তা হল—জার্মানদের এখানে আসতে দেওয়া হচ্ছে কি না? আমি একটা চলনসই ছাপাখানা যোগাড় করেছি। আর তাছাড়া, আমার আর মোটর গাড়ীতে বাস করা চলছে না!'

'তুমি এখানেই বসবাস করতে পার। বোর্দোই হবে দ্বিতীয় রাজধানী।'
ঘণ্টাগুলি মাসের মত শ্লথগতিতে গড়িয়ে চলল। জার্মানরা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে আসছে ওরা। দিনে দু বার করে মানচিত্রের ওপর শত্রু-অধিকৃত এলাকাগুলিতে দাগ দিল তেসা: অরলেআঁ, শেরবুর্গ, রঁন্, দিজঁ, বেলফোর। চতুর্থ দিন তেসা মানচিত্রটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দিল। অত্যন্ত ক্লান্তভাবে পমারেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তার চেয়ে কোন্ কোন্ জায়গাগুলি এখনো আমাদের হাতে আছে তাই বল।'
হঠাৎ শর্তাঁ তেসার কথায় প্রতিবাদ করল, 'ওরা আমাদের একেবারে খতম করে দিতে চায়। শর্তগুলোও এমন যে কোন ফরাসী তাতে সই দিতে রাজী হবে না।' তারপর খানিকটা হেসে শর্তাঁ আবার বলল, 'অবশ্য, তোমার ঐ গ্রঁদেল ছাড়া, কিন্তু সে তো পারীতে রয়ে গেছে।'
'গ্রঁদেল আবার আমার হল কবে থেকে?' তেসা রুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করল, 'আর তাছাড়া, আত্মসমর্পণ করতেই হবে এমন কথাও জোর করে কোনদিন বলিনি আমি। সম্মান বজায় রেখে সন্ধি করতে চাই। এতো খুবই স্বাভাবিক। দরকার পড়লে আমরা আলজিয়ার্সে চলে যাব। অবশ্য গোড়াতে পেরপিঞাঁতে গেলেও চলবে—ওখানে ভঁদর-বন্দর থেকে জাহাজ পেতে অসুবিধা হবে না।'
এমন কি প্রতিরোধ করার কথাও ভাবতে শুরু করল তেসা। অনেকক্ষণ ধরে সে মানচিত্র অধ্যয়ন করল, জেনারেল লেরিদোর সঙ্গে কথা বলল তাই নিয়ে আর তারপর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বেতারে ঘোষণা করল: 'সৈনিকগণ ও নাবিকগণ! এখনো পর্যন্ত সন্ধি হয়নি। সংগ্রাম চলছে। মিত্রশক্তির হাতে হাত দিয়ে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আমাদের সম্মান রক্ষা করো।'
সন্ধ্যাবেলা তেসা বেড়াতে বেরুলো—মাথা ধরেছে, টাটকা হাওয়া লাগানো দরকার। ঘাটের ধারে কয়েকজন ডক-মজুর চিৎকার করে উঠল তেসাকে চিনতে পেরে: 'বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেওয়ার কী হল? তাদের নাকি ল্যাম্প-পোস্টে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে বলা হয়েছিল?'
তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে তার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল তেসা নিরাপদ হওয়ার জন্যে। গুমোট আর গরম হওয়া সত্ত্বেও জানলাগুলো তুলে দিল। মনে মনে ভাবল, ওরা বোধহয় তার পিছু নিয়েছে। তৎক্ষণাৎ ব্রতেলের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল।

'শর্তা আবার ঘোঁট পাকাচ্ছে,' তেসা বলল। 'ও চায়, আমরা প্রথমে পেরপিঞাঁ ও তারপর আফ্রিকায় গিয়ে হাজির হই। চার্চিল আবার তার ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে। শর্তা কক্ষনো পয়সাকে প্রত্যাখ্যান করে না। স্টাতিস্কির ব্যাপারটা মনে করে দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি মনে করি জার্মানদের শর্ত মেনে নেওয়াই উচিত। বিপ্লব আর বিশৃঙ্খলায় ডুবে যেতে বসেছি আমরা।'

জার্মানরা উত্তর দেওয়াটা এখনো দরকার মনে করেনি। বোর্দোর দিকে এগিয়ে আসছে ওরা।

ভোরবেলা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ঘুম থেকে তেসা উঠে বসল। জার্মান বোমারু শহরের ওপর অত্যন্ত নীচুতে উড়ছে। এক ঘণ্টা পরে খবর এল সাতশো লোক হতাহত হয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতেই হল একবার। আহত শিশুদের দৃশ্যে আর ঈথারের গন্ধে আচ্ছন্ন বোধ করল সে। 'আমরা ওদের তার করি, আর বোমা দিয়ে উত্তর দেয় ওরা।' তেসা আর্তনাদ করে উঠল। বোর্দোর নগরকর্তা মার্কে দু-দুবার এসে দাবী করল, শহরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্টকে এখন থেকে স্থানান্তরে পাঠান হোক। তারপর আতঙ্ক পেয়ে বসল। তেসা সারাদিন কাটাল স্পেনের রাজদূতের সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা সগর্বে জোলিওকে বলল, 'জনসাধারণকে তুমি আশ্বাস দিতে পারো। জার্মানরা মার্শালকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ওরা শহরকে স্পর্শ করবে না।'

কথাটা জোলিওকে বলেছে বলে পরের দিন রীতিমত অনুতাপ বোধ করল তেসা। নানা জায়গার উন্মত্ত আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড় এসে শহরটাকে ঘিরে ধরেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটা পর্যন্ত একটা অসম্ভব ব্যাপার। রুটিওলার দোকানে এক টুকরো রুটি পর্যন্ত পড়ে নেই। স্কোয়ারে লোকেরা রাত কাটাচ্ছে। তবু শহরে এসে জমায়েত হচ্ছে তারা।

প্রেফেক্ট্-এর ডাক পড়ল তেসার কাছে। তেসা আদেশ করল: 'কাউকে শহরে ঢুকতে দিও না। তাহলে মারা পড়ব আমরা। অটোম্যাটিক পিস্তল দিয়ে পুলিশদের দাঁড় করিয়ে দাও। সৈন্যদের উপর নির্ভর করে কোন লাভ নেই—ওদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। আশ্রয়প্রার্থী, জার্মান আর কমিউনিস্ট—সবাইকেই ঢুকিয়ে বসে থাকবে ওরা।'

তুর শহর প্রতিরোধ করছে জানতে পেরে তেসা ভয়ানক ক্ষেপে উঠল। কী

পাগলামি! কী লাভ হবে হিটলারকে চটিয়ে? তার নির্দেশ মাফিক ফ্রান্সের সমস্ত শহরগুলিতে 'উন্মুক্ত' বলে ঘোষণা করা হল।

তেসা বেতারে আরেকটা বক্তৃতা দিল। আবেগে কেঁপে উঠল তার কণ্ঠস্বর: 'আমরা আশা করি আমাদের শত্রুপক্ষ উদারতার পরিচয় দেবেন। ফরাসীরা চিরদিনই বাস্তববাদী মানুষ। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি আমরা। আমাদের যদি তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে হয়, আমরা বলব—আত্মা অপরাজেয়! কিন্তু, হায় এই মুহূর্তে আত্মার চেয়ে ট্যাঙ্কই বেশী শক্তিশালী!'

ক্লান্ত হয়ে তেসা বসে পড়ল, তার মুখ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। বাইস এসে ঘরে ঢুকল হঠাৎ। আগে থেকে খবর না দিয়ে বাইসকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়াতে রীতিমত আশ্চর্য হল তেসা। তেসা যে একজন মন্ত্রী আর বোর্দো যে বর্তমান রাজধানী—এ কথা যেন মনেই নেই ওদের।

বাইস এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সই করে দিন!'

'কী ওটা?'

বাইস বুঝিয়ে বলল: 'একদল বৈমানিক ইংলণ্ডে উড়ে যাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ওদের আটকানো দরকার। পেট্রল পাওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

'কিন্তু ও আমার কাজ নয়। আপনি গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে দেখা করুন।' তেসা বলল।

ধূর্ত হাসি খেলে গেল বাইসের মুখে। বোঝাতে চাইল, 'দরকার পড়লে কোনদিন জেনারেলের দেখা মেলে না। আর এ ব্যাপারটা জরুরী। আমার উপদেশ, নিয়মানুবর্তিতার কথা বাদ দিন আপনি। এখন আর মন্ত্রিত্বের মার্কা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। আর প্রতিটি ঘাটতি বিমানের জন্যে জার্মানদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে আপনাকে। বুঝতে পারলেন?'

তেসা চিৎকার করে উঠতে চাইল: 'শয়তান! গুপ্তচর!' কিন্তু চেপে গেল। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল বাইসের দিকে। তারপর কলমটা বার করে চোখ দুটো লাল করে কাগজটায় সই করল। অত্যন্ত বিনীত হয়ে ধন্যবাদ জানাল বাইস।

তুর শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখেছে। শহরের প্রতিরোধকারীরা দু-দুবার উড়িয়ে দিয়েছে ভাসমান সাঁকোগুলোকে। ধূসর-রঙা ঘরগুলো আর তারই সামনে ঝলমলে লয়ার নদীর দিকে জার্মানরা তাকিয়ে আছে অবাক চোখে। পোয়াতিএর ছাড়িয়ে সুদূর দক্ষিণগামী রাস্তাটা তুরের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে। এই অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধে ক্ষেপে গিয়েছে অগ্রগামী সৈনিকেরা। একজন জার্মান জেনারেল, পাণ্ডিত্য প্রকাশে যার অশেষ আগ্রহ, তার অফিসারদের বলল, 'তোমরা এদের কাছে কী প্রত্যাশা করতে পারো? ক্ষুদে ব্যাঙাচিরা বালজাকের জন্মস্থান রক্ষা করছে।'

তুরকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়নি কেন? শোনা গেছে নগরকর্তা নাকি নাগরিকদের প্রতিরোধ করতে আবেদন করেছিলেন এবং নাগরিকদের সাহসিকতায় সৈন্যেরা এতদূর লজ্জিত হয়েছিল যে তারা পিছু হটবে না বলেই স্থির করল। প্রথম আক্রমণগুলো স্থানীয় হাসপাতালের আহতরাই ঠেকিয়ে দিল। মাটির নীচের কুঠরীগুলোয় মদের পিপেগুলোর মাঝখানে লুকিয়ে থাকা নাগরিকদের মধ্যে নানারকম গাল-গল্প তৈরী হল। ব্যাটালিয়ানগুলো পরিণত হল ডিভিশনে। এক আশ্চর্য রকম গোলা নিয়ে লোকে আলোচনা করল, যে গোলা লেগে জার্মান ট্যাঙ্ক নাকি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। তুর যে কেন প্রতিরোধ করছে এ কথা কেউ বুঝে উঠতে পারল না। আপাতদৃষ্টিতে ঘোর আতঙ্কের সময়েও কতকগুলো সাহসী লোক আর দুর্জয় শহরের অভাব ঘটেনি। দু ব্যাটালিয়ন সৈন্য, কয়েক শো আহত সৈনিক ও নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক—বয়স্ক লোক যারা গত যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল আর তরুণরা যারা সামরিক কাজে যোগ দেবার মত সাবালক নয়—সবাই মিলে তুরকে ঠেকিয়ে রাখল।

প্রতিরোধকারীদের মধ্যে পার্লামেন্টের ডেপুটি লেফটেনেন্ট দুকান অন্যতম। সৈনিকরা তাকে বলে—'দাদা', গত এক বছরে ভয়ানক বুড়িয়ে গেছে সে। জীবনে যে সব আশাকে অবলম্বন করে সে বেঁচে থেকেছে সবই মিথ্যা বলে মনে হয়েছে তার কাছে। সে অন্ধ নয়; নিজের ভুল সে বুঝতে পেরেছে কিন্তু গোপনে গোপনে সে এই আশাই পোষণ করেছে যে আত্মত্যাগী মানুষের রক্ত আবার পুরনো ফ্রান্সকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে—যে পুরনো ফ্রান্সের সঙ্গে

তার পরিচয় হয়েছে বইয়ের মারফৎ। তুরের প্রতিরোধ তার চোখে ভাগ্যের শেষ উপহার ছাড়া কিছু নয়।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে দুকান তার কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর এক পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সে সময়ে অত্যন্ত কুৎসিত ছিল দুকানের চেহারাটা...... দু পাশে দুটো বড় বড় কান ফুঁড়ে বেরিয়েছে...তখন সে স্বপ্ন দেখত বৈমানিক হবার। কবি শার্ল পেগি কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল সে সময়ে:

'স্বদেশের চতুঃসীমা তরে
ন্যায়যুদ্ধে প্রাণ দেন যাঁরা
যুগে যুগে বরণীয় তাঁরা।'

যুদ্ধের প্রথম দিনেই পেগি মারা গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর সে যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছিল মার্নের যুদ্ধ। যুদ্ধে যে জয় হবে একথা জানত না সে; চারদিকে পরাজয়, আতঙ্ক ও পলায়ন—এরই মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছিল, প্যারী প্রতিরোধ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল তার। আর অবশেষে জয়ী হয়েছিল ফ্রান্স। এই দুঃসময়ে তার কবিতার প্রিয় লাইনগুলি মনে মনে আবৃত্তি করে দুকান। হতাশা-ভারাক্রান্ত মুহূর্তে পেগির কবিতা পড়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে সে। বোর্দোয় কি ঘটছে না ঘটছে সে চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামায় না দুকান। অশেষ ক্লান্তি, গোলাবর্ষণের নির্ঘোষ আর আহতদের আর্তনাদের মধ্যে বহু বিনিদ্র রাত্রিযাপনের পরও সে যুদ্ধজয়ে বিশ্বাস করে: এই ছোট শহরের প্রতিরোধ করাটাই তার কাছে গোটা ফ্রান্সের জন্যে যুদ্ধ করা।

লয়ারের ডানদিকে জার্মান কামানগুলি তুরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে। আর ধ্বংসকার্যে সাহায্য করছে বোমারুরা। ভারী ভারী বোমায় মধ্যযুগীয় গঠন, স্তম্ভ আর চূড়ায় সজ্জিত পুরনো বাড়ীগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। প্রতিরোধকারীদের খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র ও গোলাগুলি ফুরিয়ে গিয়েছে সমস্ত। ফরাসী কামানের গর্জন থেমে এল; কেবল মেশিনগানগুলো দূরে সরিয়ে রাখল শত্রুদের।

দ্বিতীয় দিনের শেষ দিকে একটা সংক্ষিপ্ত বিরাম পাওয়া গিয়েছে। দুকান আর সার্জেণ্ট মাইয়ো রাত্রের খাবার খাচ্ছে জেটির সামনের এক বাড়ীতে বসে। সৈনিকরা কিছু রুটি আর এক টুকরো মাংস সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে তাদের। মনের আনন্দে তারা চিবিয়ে খাচ্ছে আর অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় সেই চিবিয়ে

খাওয়ার শব্দ শোনাচ্ছে ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিধ্বনির মত। বালির বস্তায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে জানলাগুলো। ঘরখানা কেমন অন্ধকার। আসবাবপত্র পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়: তাকের ওপর গোলাপী মোরগ আঁকা চীনেমাটির পাত্রগুলি সাজানো। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ, খালি টিন আর ছেঁড়া চিঠিপত্রে মেঝেটা ছেয়ে গেছে। পাশের ঘরে সৈনিকেরা বিশ্রাম নিচ্ছে।

কে যেন রেডিওর সুইচটা ঘুরিয়ে দিল। বোর্দো থেকে বক্তৃতা দিচ্ছে ভেসা। নতুন গভর্নমেন্টের মন্ত্রী ট্যাঙ্ক আর 'অমর আত্মা' সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছে।

'মুখ বন্ধ করে দাও শয়তানটার!' আর্তনাদ করে উঠল দুকান।

সৈন্যেরা হাসিতে ফেটে পড়ল: 'ও বেটা দাদাকে শান্তিতে খেতে পর্যন্ত দেবে না!'

রেডিওটা বন্ধ করে দিল ওরা। সার্জেন্ট মাইয়ো এক মুখ ঘন ধূসর দাড়ি আর ফুলে ওঠা লাল চোখ নিয়ে হঠাৎ দুকানকে প্রশ্ন করল 'তুমি ওদের সাহায্য করেছিলে কেন ১৯৩৬ সালে? তুমি তো অত্যন্ত সরল মানুষ। মনে হচ্ছে, আমরা আর এখান থেকে বার হতে পারব না। আমি বুঝতে চাই......'

'বুঝতে চাও?' দুকান হাসল। 'আমি নিজে অবশ্য কিছুই বুঝতে পারি না। শাদা কালো হয়ে গেছে আর কালো সবই শাদা। আর সেইজন্যে আমরাও অন্ধ হয়ে গেছি। কিংবা একটা কিছু দেখতে পেয়েছি আমরা। জানি না ঠিক। কিছু খাঁটি লোক নিশ্চয়ই আছে—যেমন দ্য গল। বৃটিশরা মাথা নোয়াবে না। কিন্তু আমাদের ভাগ্য......' হাত দোলাতে লাগল দুকান।

'গত যুদ্ধে আমি উত্তরে—আরাসে ছিলাম।' মাইয়ো বলল। 'বলতে গেলে সমস্ত শহরটাই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মাটি থেকে। এবারও যুদ্ধের প্রথম দিকে আবার আমি আরাসে ছিলাম। ভারী মজার, না? দেখলাম বিশ বছরে লোকে আবার গড়ে তুলেছে শহরটাকে। কেমন নিরিবিলি চারদিক! একেবারে বেলজিয়ানদের পেছন দিকে। কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে যুদ্ধটা ওখান পর্যন্ত গড়াবে। কিন্তু যুদ্ধ এল। আমরা যখন আরাস ছেড়ে এলাম, তখন সেখানে আর কিছু নেই—শুধু ধুলো আর কাঁকর। ওরা আবার গড়ে তুলবে। অসম্ভব! এইভাবে জীবন ধারণ করা কি সম্ভব? একটা কিছু বদলাতে হবেই এবং ঠিকভাবে......'

'তুমি কি কমিউনিস্ট ?'

'না, আমি শিক্ষক ছিলাম। পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে এবং তোমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম আমি। রাজনীতি নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। গতকাল ক্যাপ্টেন গ্রেমি বলেছিল—আমি সাচ্চা ফরাসী নই। সব কি একই রকম থাকবে চিরদিন ?'

হুকান চিৎকার করে বলল, 'আমরা যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমিই সর্বপ্রথমে বলব—না! কিন্তু ও কথা বলার সময় আসেনি। বল, তুমি কি বলতে চাও তুমি যাবে না......' তোতলাতে লাগল হুকান, কোনক্রমে কথা খুঁজে পেয়ে বলল—'শহর প্রতিরোধ করতে ?'

উত্তরে গোলার গর্জন কানে এল—বিরাম ফুরিয়ে গেছে।

তৃতীয় দিন সব কিছু নির্ধারিত হয়ে গেল। তুরের মধ্যে অবরোধ ভেঙে ঢুকে গেল জার্মানরা। লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। বুলভার আর জাহাজ-ঘাটার মাঝামাঝি সরু রাস্তাগুলোতে সংঘর্ষ চলল। ধোঁয়ার মধ্যে সূর্যটাকে কেমন ঘোর লাল দেখাচ্ছে। চারদিকে পোড়া গন্ধ।

ছাদের ঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল হুকান। তার চোখের সামনে টালি-দেওয়া ছাদ আর দীর্ঘ ঘোরানো রাস্তার বিস্তৃতি। গুলি ছুঁড়তে সে ওস্তাদ। যে ছোট্ট শহরে সে মানুষ হয়েছে, সেখানে ইহুদীদের পরবে মেলা বসে। মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতে পারে না হুকান, কারণ সে তোতলায়, নিজের কুৎসিত চেহারায় নিজেই সে লজ্জিত, কিন্তু গুলি ছোঁড়ায় তার খুব নাম। মেলায় দর্শকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলাবলি করত, 'কী গুলিই ছোঁড়ে ছেলেটা!' তখন সেটা ছিল তরুণ বয়সের আত্মপ্রত্যয় আর এখন সেটাই তার শেষ আশা। নিরর্থক জীবনটাকে নষ্ট করবে না সে।

দূরে কতকগুলি জার্মানকে দেখতে পেল হুকান। ধূসর-রঙা দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে ওরা। রাস্তার মাঝখানে পিপে, আসবাব পত্র আর তোষকের অবরোধ।

হঠাৎ একজন ফরাসী সৈনিককে দেখা গেল। লোকটি সার্জেন্ট মাইয়ো। ও কী করছে ? পাগল হয়ে গেছে নাকি ? জার্মানদের দিকে ছুটে গেল মাইয়ো তারপর থেমে দাঁড়িয়ে হাত বোমা ছুঁড়ল। শানের ওপর পড়ে গেল তিনজন জার্মান। বাকী সবাই চম্পট দিল।

উল্লসিত হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডুকান। চিৎকার করে বলল, 'সাবাস সার্জেন্ট!' প্রস্তরীভূতের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মাইয়ো। . গুলির শব্দ হল একটা; তার হাতিয়ার ফেলে দিয়ে নীচে পড়ে গেল মাইয়ো।

আবার জার্মানদের দেখা মিলল। তাক করে করে গুলি করতে লাগল ডুকান। ঠেকাতে না পেরে জাহাজ-ঘাটার দিকে পালিয়ে গেল জার্মানরা।

ডুকান রুমাল নিয়ে তার ঘর্মাক্ত কপালটা মুছল; ফ্লাস্কটা টেনে বের করল তারপর—কিছুক্ষণ থেকে ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে তার। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে রাইফেলটা আঁকড়ে ধরল। বাড়ীর ছাদের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে আসছে জার্মানরা। লম্বা লাল চুলওলা এক সৈনিক তার চোখের সামনে। ওরা দুজন বহুক্ষণ সংগ্রাম করল, তারপর জার্মানটাকে নীচে ফেলে দিল ডুকান।

মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা নামল। একটা ভ্রমর ঘরের মধ্যে ঢুকে একঘেয়ে শব্দে গুন গুন করে চলল। ডুকান রাইফেলটা তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল—জার্মানরা ছাদের ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। আরো দুটো গুলি ছুঁড়ল সে। খানিকটা ভেবে বলল, 'এই নিয়ে নটা... .' টলতে টলতে কাটা গাছের মত নীচে লুটিয়ে পড়ল ডুকান।

৩৪

পরিশ্রান্ত হয়ে তেসা শরীরটা সোফার ওপর এলিয়ে দিয়েছে। মাছিদের জ্বালায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসারও উপায় নেই—কখনো নাকে, কখনো বা কপালে এসে বসছে তারা বা কানে শুড়শুড়ি দিচ্ছে। নড়া চড়ার শক্তি তেসার নেই; ঘুমের আশায় বসে আছে তবু ঘুম আসতে রাজী নয়। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে সময়ের ক্লান্তিকর মরুভূমির মত। কিন্তু এক সময়ে তার জীবনে দিন আর মাসগুলো যেন হু হু করে কেটে গেছে। উদ্বেগের সঙ্গে দেনিসের কথা মনে পড়ল তেসার। এখন সে কোথায়? জার্মানদের হাতে পড়েছে হয়ত। আর পলেৎ নিশ্চয়ই মারা গেছে। নইলে ও নিশ্চয়ই তেসাকে খুঁজে বের করত—মন্ত্রীকে খুঁজে বের করা কী আর এমন শক্ত ব্যাপার। প্রত্যেকে বলাবলি করছে পথ ঘাট নাকি আশ্রয়প্রার্থীদের মৃতদেহে ছেয়ে গিয়েছে। আর লুসিয় নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। যে রকম অস্থিরমতি ছেলে ও! ওর মত লোক সবার আগে তলিয়ে যায়।

এবার কী হবে? লাভালের মুখে তো হাসি হাসি ভাবটা লেগেই আছে। কেদোর মনের কথায় মার্কের গর্ব আর ধরে না। ব্রতৈল কেবল সরাসরি বলে দেয়, 'এ সব ঠিক হয়ে যাবে।' আলোর সামান্যতম রেখাটুকুও কোনদিকে দেখা যাচ্ছে না। জার্মানরা এগিয়েই আসছে, ব্রেষ্ট আর লির দখল করা হয়ে গেছে। বোর্দোর অনতিদূরে লা রশেল-এ এসে পৌচেছে ওরা। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে পিকার সমভিব্যাহারে রাজপ্রতিনিধিরা রওনা হয়েছে। কে জানে, জার্মানরা কি বলবে? হয়ত ওরা ইচ্ছে করেই দেরী করছে। এদিকে ফুঁসে উঠছে সারা দেশ। পমারে বলেছে, কমিউনিস্টরা নাকি মার্সাইএর ময়দানে ময়দানে গলা কাটিয়ে বেড়াচ্ছে, আর বোর্দোর লোকদের মনোভাবও কী জঘন্য! ডক-মজুরদের সঙ্গে তার সাক্ষাতের সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়ায় তেসা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছ গল তো সোজাসুজি অসহযোগ করতে উস্কানি দিচ্ছে, 'বিমান আর যুদ্ধের মালপত্র ধ্বংস করো, যাতে তারা শত্রুর হাতে গিয়ে না পড়ে!' অবশ্য বাইস লোকটা কেমন অশিষ্ট কিন্তু ওর কথাই ঠিক—বিমানগুলোর হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে জার্মানদের। কোন কোন র‍্যাডিকালপন্থী লোক আফ্রিকায় পালিয়ে যাবার কথা ভাবছে। মতলবটা মন্দ নয়! ওরা 'মাসিলা' জাহাজে একটা বার্থ পর্যন্ত তেসাকে দিতে চেয়েছিল। তেসাও তো প্রায় রাজীই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ব্রতৈল বলল, 'মাসিলার' আরোহীদের আমরা দেওয়ালে টাঙিয়ে মারব।' তেসাও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'ঠিক কথা! এই দুঃসময়ে লোকে কখনো নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে?'

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল; মন্ত্রীদের সভায় ডাক পড়েছে তেসার।

লেব্র‍্যাঁকে নাক ঝাড়তে দেখা মাত্রই তেসা বুঝল খবরটা সুবিধার নয়। পিকারের টেলিগ্রাফ করা জার্মান শর্তগুলো ব্রতৈল সমাধি-স্তবের মত সুর করে পড়ে যাচ্ছে।

তেসা বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'শর্তগুলো অসম্মানকর!'

ব্রতৈল তার দিকে কড়া নজরে তাকিয়ে বলল, 'আমরা যে হেরে গেছি একথা ভুলে গেলে চলবে না।'

তেসা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য সই করারই পক্ষে।'

ক্লান্তিতে আধ-মরা হয়ে তেসা মাইক্রোফোনের কাছে উঠে গেল এবং তারপর গলাটা সাফ করে নিয়ে তার স্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা

শুরু করল: 'আসুন, নিরুৎসাহ হয়ে কোন লাভ নেই! শান্তির যে সব শর্ত আমাদের প্রতিনিধিরা মেনে নিয়েছেন সেগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু তাই বলে শর্তগুলি অপমানজনক নয়। শর্তগুলি মর্যাদাপূর্ণ। আমার গোটা জীবনটাই তার জামীন হয়ে রইল!'

কিন্তু পরে, এক গ্লাশ সোডা খাওয়ার পর অত্যন্ত নরম গলায় ব্রতৈলকে বলল, 'দেখো, বক্তৃতাটা ছাপা না হয় যেন। অন্তত সৈন্যরা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত। আগুন নিয়ে খেলা করে লাভ নেই। ওদের মধ্যে অনেক মাথা-গরম লোক আছে।'

পিকার্ বোর্দোয় ফিরে এল। তেসা তৎক্ষণাৎ ছুটল তার সঙ্গে দেখা করতে।

'তারপর, কী রকম দেখলে?' তেসা জিজ্ঞাসা করল, 'মানে, আবহাওয়াটা দেখলে কেমন?'

ম্লান ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থেকে জেনারেল উত্তর দিল, 'আমার নিজের উর্দির কথা ভেবে বার বার মাথা হেঁট হয়ে আসছিল।'

'শুধু এইটুকুই? আমার কিন্তু খুঁটিনাটির ওপরই বেশী আগ্রহ।'

'খুঁটিনাটি? নিশ্চয়ই। একটা টেবিল, এক পাত্র জল, একটা কলমদানি আর কিছু কলম—এগুলোই ওদের ওখানে নজরে পড়ল। অফিসারটি আমায় বলল, 'আমরা আপনাকে গভীর মহানুভবতার সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি, তাই না?' বলেই জলের পাত্রটির দিকে আঙুল দেখাল। তারপর তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বলল—আমি মার্শাল ফশ নই।'

'তাহলে ও লোকটা বলতে চায় কী? তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করল?'

'লোকটা ফিল্মের অভিনেতার মত। সদর্পে পায়চারি করল, হৈ চৈ করল আর তারপর বক্তৃতা দিল—কী হেঁড়ে গলা লোকটার! মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো দিয়ে ঘাস মাড়াল, যেন বলতে চাইল: 'আমি ফ্রান্সের মাটিকে পায়ের নীচে মাড়াচ্ছি।' এইটুকু। বাকী যা ঘটেছে তা আমি নিজের কাছেও বলতে পারব না—ভয়ানক লজ্জাকর সমস্ত ব্যাপারটা।'

আরো তিন দিন কাটল। তেসা ব্যতিব্যস্ত রইল নিজের কাজে। সারাদিনের ভাবনাচিন্তা তাকে তার নিজস্ব চিন্তাস্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। নানা কাজ করতে হল তাকে—সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলল, পুলিশ বেষ্টনীগুলি পরীক্ষা করল, ময়দার সরবরাহ তদারক করল আর দহরম-মহরম করল স্পেনের

রাজদূতের সঙ্গে। আর—তারপর মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হল; নতুন মন্ত্রী নেওয়া হল মুজন।

আপোষপ্রার্থী দূতরা রওনা হল রোমে। সবাই শেষ সমাধানের প্রতীক্ষায় আছে। এদিকে শহরগুলোর ওপর বোমাবর্ষণ করছে জার্মানরা।

'আমার আর কারো ওপর আস্থা নেই।' জোলিও খেঁকিয়ে উঠল, 'দেখে নিও, ওরা ঠিক বোর্দো পর্যন্ত ধাওয়া করবে।'

'অবশেষে আপোষের শর্তগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করা হল। ব্রতৈল প্রস্তাব করল, 'জাতীয় শোকদিবস' উদযাপন করা হোক।

তেসা হেসে বলল, 'ও লোকটা শুধু একটা জিনিস জানে, আর তা হল খ্রীষ্ট নাম জপ করা। ধূপের গন্ধ ওর খুব পছন্দ।'

শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে পবিত্র উপাসনা-সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পেতাঁ এবং সমস্ত মন্ত্রীরাই উপস্থিত হল সেই সভায়। শবযাত্রায় যাওয়ার মত তেসা একটা কালো টাই পরে এসেছে। গির্জার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কিছু লোক চিৎকার করে বলছে, 'মার্শাল দীর্ঘজীবী হোক!' তেসা বিরক্ত হল; আবার ওরা মার্শালকে আলাদা করে দেখছে!

উৎসবটা এত বেশী বিরক্তিকর মনে হল তার কাছে যে নানা রকম অর্থহীন চিন্তা তার মাথার মধ্যে আনাগোনা করতে থাকল। আচ্ছা, পলেৎ যদি বেঁচে থাকে আর প্রেমে পড়ে থাকে অন্য কারো সঙ্গে। অবশ্য ভীইয়ার যে মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়নি তাতে সে নিজেই আনন্দিত। পরে সে বলে বেড়াবে: 'আমি এসবের মধ্যে নেই। 'আমি সইও দিইনি।' দু-এক দিনের মধ্যেই তাদের অন্য কোথাও সরে যেতে হবে। কী হাস্যকর পরিণতি! আর হিটলারের ছোট্ট গোঁফটা কিনা ঠিক চার্লি চ্যাপলিনের মত। গির্জার ভেতরটা কী গরম!

গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতেই এক সুদর্শন প্রৌঢ় লোক এসে তেসাকে ধরল। লোকটার বোতাম ঘরে একটি ফিতে লাগানো।

তেসা ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই আপনার?'

কোন উত্তর না দিয়ে আগন্তুকটি একটা চড় মারল। তেসা গালে হাত দিয়ে শুধু চিৎকার করে উঠল, 'কী জন্যে?'

কালো ক্রুদ্ধ দু চোখে তাকিয়ে থেকে লোকটি বলল, 'আমি আমার দু-দুটো ছেলেকে হারিয়েছি।'

লোকটি আর কিছু বলতে পারল না, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। ধীরে ধীরে ভীড় কমল। এক শোকাচ্ছন্ন বৃদ্ধা কেঁদে উঠল। কে যেন চাপা হাসি হেসে বলল, 'জোর ঘুষি মেরেছে ওরা ওর চোয়ালে।' তেসা তাড়াতাড়ি উঠে বসল তার গাড়ীতে।

যখন জোলিও হন্তদন্ত হয়ে এসে পৌঁছল তখনো তেসা তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি।

'আবার তুমি আমায় গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়েছ।' জোলিও কেঁদে পড়ল। 'দেখা যাচ্ছে যে, শর্ত অনুযায়ী ওরা নাকি বোর্দো দখল করবে। আমার অবাক লাগছে, মার্সাইটাও দিয়ে দিলে না কেন এর সঙ্গে?'

তেসা বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। বলল, ক্লেরমঁ-ফেরাঁয় ভাল ভাল ছাপাখানা আছে এবং ওখানে খবরের কাগজও খাসা চলবে—তেসা নিজে একটা অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থাও করে দেবে।

জোলিও আর্তনাদ করে উঠল: 'যেন তোমার সাহায্যের জন্যে আমি হাঁ পিত্যেস করে আছি! ওর আর কাণাকড়িরও দাম নেই। একজন ভদ্রলোকের দালালী করা যেতে পারে কিন্তু তাই বলে দালালদের দালালী করা চলে না! তার চেয়ে মার্সাইয়ের পথে পথে মাছ ফিরি করে বেড়াব আমি।'

জোলিও অনেকক্ষণ বসে বসে গজরালো। তারপর ফিরে গেল হোটেলে, মারি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। শান্ত হতে কিছু সময় নিল জোলিও—পুরো এক পাত্র মদ পান করে ফেলল। অবশেষে নিশ্বাস নিতে পারল প্রাণ ভরে। স্ত্রীকে বলল, 'তেসা ক্লেরমঁ-ফেরাঁয় চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে চার নম্বর রাজধানী। এর পর হবে পাঁচ নম্বর। কিন্তু আমার ঘেন্না ধরে গেছে। এবার পূর্ণচ্ছেদ। যাই হোক জার্মানরাই তো এখন ফ্রান্সের শাসনকর্তা। সুতরাং আমরা পারীতে ফিরে যেতে পারি। অন্তত ওখানে আমাদের নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে।'

'কিন্তু পারীতে গিয়ে কি করব?'

'যা আগে করতাম। লা ভোয়া নুভেল্ চালাব। জার্মানদের বুঝি আর কাগজের দরকার নেই! আর কে আমার পিছু লাগবে? তেসা? ও এইমাত্র চোয়ালে একটা ঘুষি খেয়েছে। গাল ফুলে গেছে। যাহোক কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল।'

কয়েকদিন পরেই গভর্নমেণ্ট ক্লেরমঁ-ফেরাঁয় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। তেসা তার দলিলপত্র বিরাট হাত-ব্যাগটায় ভরল আর তোরঙ্গের তালাগুলো

পরীক্ষা করে দেখল। তারপর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে পিছনে সরে এল। রাস্তা দিয়ে জার্মান সৈন্য মার্চ করে আসছে। ফিটফাট লেফ্টেনেন্টটি বিনয়ের ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে কয়েকজন পথচারীর দিকে। তেসা চটে উঠেছে; সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না জার্মানরা। সত্যিই কী বিশ্রী। একই সঙ্গে স্বাধীন গভর্নমেন্টের অবস্থান আর বিদেশী শক্তির প্রবেশ। বিদেশে লোকে কি ভাববে? ভেলভেটের পরদাগুলো টেনে দিল তেসা—জার্মানদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চাইল নিজেকে।

সেক্রেটারী এসে খবর দিল গাড়ী তৈরী হতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। ইঞ্জিন মেরামত করা হচ্ছে। রওনা হওয়ার আগে খানিকটা শুয়ে নিল তেসা। সোনালী সূর্যের কিরণ পরদার মধ্যে দিয়ে এসে দেওয়ালের গায়ে লাফালাফি করছে। হঠাৎ তেসার মনে হল যে লোকটা তাকে অপমান করেছিল, তার ধাতব চোখগুলো সে যেন দেখতে পাচ্ছে। লোকটার কী হল কে জানে। তার পিতৃসুলভ হৃদয়বৃত্তিকে স্বীকার করতেই হবে।......দেনিস কী করছে? আর লুসিয়ঁ?

এই সব চিন্তার পর তেসা প্রিফেক্টকে ফোন করল, 'তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আজ একটা লোক আমায় আক্রমণ করেছিল। হ্যাঁ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ঠিক আছে। আমি চাই লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। ও বলছিল ওর ছেলেরা নাকি যুদ্ধে মারা গেছে। তুমি একটা পরিবারের কর্তা। তুমি বুঝবে কতটা দুর্ভাগ্য এটা। ব্যাপারটা একটা মানুষকে পাগল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আমারও দুটো ছেলে মেয়ে আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারা গেছে ওরা।'

তেসা কোন মতে কথাটা শেষ করল, কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার।

সেক্রেটারী এসে জানাল, 'গাড়ী তৈরী হয়ে গেছে।'

নিজেকে তুলে দাঁড় করাল তেসা। কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা লোক এসে বসল গাড়ীতে, এমন একটি লোক, যে মনে মনে বিশ্বাস করে যে সারা জাতির আস্থার অধিকারী সে।

৩৫

গভর্নমেন্ট ক্লেরম-ফের‍্যাঁয় উঠে এল তার কারণ তার আশেপাশে অনেকগুলি ঝরণা আর তার চারদিকে উষ্ণ প্রস্রবণ সমৃদ্ধ একাধিক আরামপ্রদ হোটেলের সমারোহ। লাভাল ক্লেরম-ফের‍্যাঁয় রইল। আর বাকী মন্ত্রীরা কেউ ভিশি,

কেউবা ম-দোর বা লা বুরবুল পছন্দ করল। তেসার বিচারে রয়া-ই সবচেয়ে উপযোগী জায়গা—রিপাব্লিকের সভাপতির জন্তে আসন সংরক্ষিত করা হয়েছিল এখানে।

বড় খাবারের দোকান 'লা মারকিস ছ সেভিনি' খদ্দেরের ভীড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। খালি টেবিল পাওয়ার আশায় বাইরে অপেক্ষা করছে জনতা। রয়া-র স্বনামধন্ত ঘন চকোলেটের আকর্ষণ আশ্রয়প্রার্থীদের কাছে ততোটা নয় যতটা তার অভিজাত সমাজের। এত সব বিভীষিকার পর নিজের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হতে আর আপন চক্রের মাঝে ফিরে যেতে সত্যিই অদ্ভুত লাগে। সাঁজ এলিজের প্রায় সমস্ত কাফেগুলিই এখানে উঠে এসেছে—মারিনি, কার্ল্তঁ বার আর লুসিয়ঁর প্রিয় কাফে—ফুকেৎ।

উত্তাপ আর দুঃখের বোঝায় হাঁপাতে হাঁপাতে মাদাম মতিনি তার গল্প বলে চলেছে: 'বিপর্যয়ের এক সপ্তাহ আগেই আমার পারীতে ফিরতে হল—আমার স্বামী কণ্ঠ-প্রদাহে ভুগছিলেন। ওখান থেকে কোন রকমে চলে আসতে পেরেছি আমরা। উঃ, কী ভীষণ পথ! নেভের্-এ গাড়ীটা রেখে আসতে হল—পেট্রল পাওয়া গেল না। তারপর কতগুলো গুণ্ডা এসে ভিশিতে পৌঁছে দিয়ে গেল আমাদের। আমার বোধহয় গাড়ীটা এখনো অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে......'

অন্ত একটা টেবিলে এক সৌখিন নাট্যকার তার দুঃখের কথা বলছে: 'ষোলো তারিখেই প্রথম অভিনয় হবার কথা কিন্তু দশ তারিখ থেকেই গণ্ডগোল বাধল আর এখন কে জানে নাটকের মরশুম কবে শুরু হবে.........'

শেয়ার বাজারের এক দালাল তার এক কানে যন্ত্র লাগানো কালা সঙ্গীকে চিৎকার করে বলছে, 'নিউ ইয়র্কের বাজার দর না দেখে নিশ্চিত কোন কিছু বলা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমি ঝুঁকি নেব না। যখন সব কিছু থিতিয়ে যাবে শেয়ারের দাম আপনিই বাড়বে।'

গাল-গল্প, অনুযোগ-অভিযোগ ও ভবিষ্যদ্বাণী শুনে দেসের অত্যন্ত দুঃখের হাসি হাসল। কি ঘটেছে ওরা এখনো বুঝতে পারেনি। ভাবছে, এক সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে আবার পুরনো জীবন ফিরে আসবে।

দেসেরই বা এখানে এসেছে কেন? অভিজাত জায়গার প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই এবং চকোলেটের চেয়ে মদই সে বেশী পছন্দ করে। আর এই বিমূঢ় আর চিন্তিত মেয়েদের বকবকানি, ধুলোটে বিছানা-পত্রওলা পুরুষদের বিলাপ, পিকিনিজ আর বাচ্চা টেরিয়ারদের ঘেউ ঘেউ ধ্বনি, দীর্ঘশ্বাস ('মুল্যাঁয়

আমি আমার সুটকেশটা হারিয়েছি'), বড়াই ('কুলিটাকে একটা ঘরের জন্যে আমি তিন হাজার ফ্রাঁ দিয়েছি'), অভিজাত সমাজের উত্তেজনাপ্রসূত হুড়ো-হুড়ি আর তাদের মোসায়েবের দল—সমস্ত কিছু দ্বিগুণ বীভৎস মনে হল দেসেরের কাছে। কিন্তু পেট ভরে খেতে আর পান করতে চায় সে। তেসাকে খাবারের দোকানে ঢুকতে দেখে দেসের গাড়ী থেকে নেমেছে।

বকবকানি শুনতে শুনতে শ্বাসরোধ হয়ে এল দেসেরের। সমস্ত কিছু নীচতা আর নোংরামি এসে জমা হয়েছে এখানে! দেসের এখনো চোখের সামনে রক্ত দেখতে পাচ্ছে। পারী থেকে নীস পর্যন্ত যে 'নীল পথ' গিয়েছে সেই পথ দিয়েই এসেছে সে। আগে এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করত পয়সাওলা ফুলবাবু, ছোট ইজের-পরা মহিলা, ফোতোবাবু আর দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াতে কিংবা রুলেৎ খেলতে যারা ভালবাসে। এখন এই পথেই আশ্রয়প্রার্থীরা জটলা পাকিয়েছে। জার্মান উড়োজাহাজ নেমে এসেছে অত্যন্ত নীচুতে আর তারপর বৈমানিকরা হাসতে হাসতে একে অপরকে উড়বার পথ করে দিয়েছে। গোরস্থানগুলো নজরে পড়েছে দেসেরের আর চোখে পড়েছে হাজার হাজার নিরাশ্রয় মানুষ। পারীর বাস্‌গুলো বাসস্থানে পরিণত হয়েছে আর সেই বাস-গাড়ীর বাসিন্দারা সেজন্যে ভাগ্যবান মনে করেছে নিজেদের। অভুক্ত সৈনিকরা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে বীট আর সালগমের সন্ধানে। মেয়েরা উন্মাদের মত তাদের হারানো সন্তানদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে আহ্বান জানিয়েছে। শহরগুলি পরিণত হয়েছে ধ্বংসাবশেষে। না-দোয়া গরুরা পাগলের মত ডেকে বেড়িয়েছে। চারদিকে কেমন পোড়া আর মৃতদেহের গন্ধ।

'নীল পথের' কথা মনে করে দেসের চোখ বুজল। তেসার হাসি শুনে আবার চোখ মেলে চাইল সে।

'কী হে, তুমিও দেখছি এখানে?' তেসা বলল। 'সত্যিই পৃথিবীটা ভয়ানক ছোট! কে ভাবতে পেরেছিল যে এত কাণ্ডের পর আবার আমরা লা মার্কিস দ্য সেভিনিতে মিলিত হব!'

দেসের কিছু বলল না। তেসা বলে চলল, 'তোমাকে সুস্থ দেখাচ্ছে না। জুল, এটা খুব খারাপ কথা কিন্তু। চাঙ্গা হয়ে ওঠা উচিত তোমার। আমি নিজে তো অনেক খারাপ অবস্থা হবে আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু সব কিছুই ঠিক ঠিক হয়ে গেল। আহাম্মুকদের ব্যাপার তো জানই—মাদেল আর তার দলবল—ওরা সরে পড়তে চেয়েছিল আফ্রিকায়। কিন্তু আমরা যেতে দিলাম না। এই সময়ে

সমস্ত জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। খুব শিগ্‌গিরই সমস্ত ব্যাপার মিটে যাবে। জার্মানরা লণ্ডনের দিকে ধাওয়া করবে। এ কেবল দু-তিন মাসের ব্যাপার। খেলা থেকে আমরা সরে গেছি আর এতে আমাদেরই সুবিধে। তুমি কী করবে ভাবছ? তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার—আমরা দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিচ্ছি। হাসছ কেন? কথাগুলো মিছিমিছি বলছি না।'

দেসেরের হাসি মিলিয়ে গেল। বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'একটা ভাল কথা যে, কিছুই মাথায় ঢোকে না তোমার। তোমার ভাববার দরকার নেই, চকোলেট খাও। আসলে তুমি একটা অভিজাত লোক। রাগ কোরো না, তুমি সত্যিই একটা বনেদী আর সদ্বংশ অভিজাত মানুষ। থাকতেও তুমি এক বনেদী সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে। এখন বাড়ীটা জ্বলে পুড়ে গেছে। কিন্তু তুমি সেই অভিজাত মানুষটিই থেকে গেছ। তবে, এর আর কী মূল্য আছে? তোমার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

তেসা উষ্মায় ফেটে পড়ল, 'তুমি বরং নিজের জন্যে দুঃখিত হলেই ভাল কাজ করবে! আমি তোমার করুণার অপেক্ষায় বসে নেই। আমি ফুজে নই, বুঝলে! হাল আমলের ধ্যান-ধারণাওলা মানুষ আমি। আসলে তুমিই অতীতকে আঁকড়ে ছিলে—পপুলার ফ্রণ্ট, উদারনীতি আর আমেরিকা। জেনে রাখ, দেশটাকে সাফ করতে চলেছি আমরা। আমি নতুন গঠনতন্ত্র তৈরী করছি। হিটলারের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান সে সব কিছুই আমরা নেব—সমস্ত শ্রেণীর সহযোগিতার আদর্শ, যাজকতন্ত্র, শৃঙ্খলা আর আমরা তার সঙ্গে মেলাব আমাদের ঐতিহ্য, পরিবারগত ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, ফরাসী নীতিবোধ আর তারপর.........'

তেসার কথায় কর্ণপাত করল না দেসের। সে কেবল বারবার ভাবুকের মত আবৃত্তি করে চলল: 'আহা বেচারী বনেদী এ্যারিস্টোক্রাট!'

তেসা উঠে পড়ল। দেসের তবু বসে রইল সেখানে। প্রতিবেশীদের কথাবার্তা আর শুনছে না সে বা তাদের দিকের তাকিয়েও দেখছে না। এক সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে অস্থির পদক্ষেপে হেঁটে গেল দরজা পর্যন্ত। কে যেন জোরে বলে উঠল, 'এই যে দেসেরও দেখছি এখানে! তার মানে হালচাল ঠিকই আছে সব।'

দেসের ফিরে দাঁড়াল না; হয়ত সে শুনতেই পায়নি। আবার সেই কালো তুষারাচ্ছন্ন পারী, শকট-আরোহী আশ্রয়প্রার্থী আর নুড়ি-বিছানো পাহাড়কে

দেখতে গেল সে। এই ফ্রান্সকেই তো সে রক্ষা করতে চেয়েছিল—তার শৈশব, মৎসশিকারী, চীনা লণ্ঠন আর কাফে স্থ কমের্সের ফ্রান্স।

একবার সে এক নিরিবিলি নির্জন রাস্তার ধারের আলো-ঝলমল জানলাগুলো দেখিয়েছিল লুসিয়ঁকে—যেখানে লোকে স্যুপ খায়, তাদের পড়া তৈরী করে, বেল্ট্ বোনে, প্রেম করে আর চুমু খায়। এখন আর সেখানে সে সব কিছু নেই : আছে শুধু চোখের কোটরের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন জানলা, বোমা-চিহ্নিত দেওয়াল আর প্লাস স্থ লা কঁকর্দ-এ জার্মানদের ভীড়। তাকে অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। অনেক কিছুই সে রক্ষা করতে চেয়েছিল। অনেক, অনেক অভিজাত বংশের লোককেই সে আপ্যায়িত করেছে। শাদা-সিদে মদের দোকান আর লক্ষ লক্ষ টাকা সে ভালবাসত। কিন্তু সে সব কিছুই ভুয়ো! আর এই জন্তেই চিন্তিত বোধ করত জিনেৎ। হ্যাঁ, তার দীর্ঘ জীবনে সে এক চঞ্চলমতি, নগণ্য ভাল মেয়েকে ভালবেসেছে। জিনেতের কী হয়েছে কে জানে? হয়ত সে এইখানেই কোথাও রাত্রের আশ্রয়ের জন্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি সে পথে মারা গিয়ে থাকে? কিংবা হয়ত পারীতে রয়ে গিয়ে দীর্ঘ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে? পুরনো রাস্তা দিয়ে ধুসর-সবুজ রঙা উর্দি পরে সৈনিকরা মার্চ করে যাচ্ছে এখন। সত্যিই, জিনেৎকে বাঁচাতে পারল না সে; সবাইকেই সে পথে বসিয়েছে।

হোটেল, দোকানপাট আর গাড়ীর ভীড় ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে দেসের। গাডী চালিয়ে চলেছে সে; ঘাসের কেমন একটা টাটকা গন্ধ ভেসে আসছে। জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত চোখ দুটি পুলকিত হয়ে উঠেছে ঘন-সবুজ ঘাস দেখে। কোথায় চলেছে তা না জেনেই গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে দেসের। কোন এক অজ্ঞাত কারণে সে দক্ষিণ দিকের খাড়া রাস্তাটার ওপর গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিল। কী ঠাণ্ডা আর টাটকা বাতাস! আহা, কী মধুর! গাড়ীটা থামিয়ে নেমে পড়ল সে। জায়গাটা একেবারে নির্জন। অনেক দিন পরে এই প্রথম সে একা রয়েছে। মাঠ আর হলদে, গোলাপী ও বেগুনী ফুলগুলোর দিকে খুশির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দেসের। ঐ ফুল গাছগুলোকে লোকে বলে 'স্ন্যাপড্রাগন'। কী ছেলেমানুষি নাম! আর এই সব ছাড়িয়েই ঘন নীল পাহাড়ের সারি। তার ওপরকার মেঘগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক ভেড়ার মত।

এখানকার হাওয়াটা এত নির্মল যে দেসের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে নিশ্বাস

নিল। সম্প্রতি তার মনে হচ্ছিল তার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। কিন্তু এখানে এসে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে, কপালের রগ দুটো টিপ টিপ করছে আর কান দুটো আলোড়িত হয়ে উঠেছে গোঁ গোঁ শব্দে।

তার পুরনো বন্ধু বেরনারের কথা মনে পড়ল। প্রত্যেকেই বেরনারকে অভিজ্ঞ অস্ত্র-চিকিৎসক বলে জানত। গতকাল দেসের খবর পেয়েছে যে বেরনার গুলি করে আত্মহত্যা করেছে। ওর মুখখানা ছিল ঠিক যেন ইব্‌সেন-বর্ণিত কোন পাদরীর মত—কেমন যেন নীরস আর দৃঢ়। কিন্তু জীবনকে ও ভালবাসত, ফুলের বাগান তৈরী করত আর খেলা করত ওর ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে। আর এখন গুলি করে আত্মহত্যা করেছে বেরনার—ও জানলার ধার দিয়ে জার্মানদের যাতায়াত করতে দেখেছিল, তাই হিজিবিজি কাটবার খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখেছিল: 'এ আমার পক্ষে অসহ্য। মৃত্যুকেই আমি শ্রেয় মনে করি।'

এক সময়ে মৃত্যুর কথা ভেবে দেসের আতঙ্কিত হয়ে উঠত। কেমন বিচিত্র আর দুর্বোধ্য মনে হত তার। এখন বেরনারের মৃত্যুকে সমীচীন মনে করল সে, জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত এই মৃত্যু। দেসের অকস্মাৎ বুঝতে পারল যে মৃত্যু জীবনেরই একটা অংশ; আর মরণের ভয় কেটে গেল তার মন থেকে।

দেসের মাঠের মাঝখান দিয়ে গাছ পর্যন্ত হেঁটে চলল। বিচিত্র তার হাঁটবার ভঙ্গী—ফুলগুলোকে মাড়াতে চায় না সে। গাছটা দেখে ফ্ল্যারি আর জিনেতের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে পড়ল দেসেরের।

'সংসারের খেয়াঘাটে খুঁজে নেব মোরা দুইজনে
স্মরণের পরপারে দূরযাত্রী স্বপ্নের জাহাজ
আলোঝরা সেই স্বর্গে আমাদের মুক্ত অভিসার......'

আর এই তো সেই বিস্মৃতির লীলাভূমি, স্বর্গ!

একজন বেঁটে আর মোটা প্রবীণ লোক দীর্ঘ ওভারকোট পরে মাঠের মাঝখান দিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে চলেছে আর হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বিড় বিড় করে বলছে, 'শস্য...ভালবাসা...ঠাণ্ডা...' সত্যিই বিচিত্র একটা দৃশ্য! কিন্তু তাকে লক্ষ্য করবার মত এখানে কেউ নেই। শুধু পাহাড়ের ধারে রাখালরা আগুন জ্বালছে; রেডিওর চিৎকার আর আশ্রয়প্রার্থীদের আর্তনাদ নেই এখানে। অতীতের শান্তির মধ্যে বাস করছে ওরা।

পাহাড়ের নীচে সূর্য ডুবে গেল। হাল্‌কা কুয়াশার রূপ নিয়ে মৃত্যু এগিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। কুয়াশাটা কেমন সজীব আর কম্পমান, ভেড়ার মত তার গতিবিধি।

অন্যমনস্ক হয়ে হেসে উঠল দেসের, তারপর উরুর পকেট থেকে টেনে বের করল মস্ত বড় একটা রিভলবার। বন্দুকের মুখের ওপর ঠোঁটটা চেপে ধরল ব্যগ্রভাবে, যেন ওটা একটা বোতলের মুখ আর গ্রীষ্মের দিনে তেষ্টায় ছটফট করছে সে।

গুলির শব্দ পুনরুক্ত হল প্রতিধ্বনিতে। রাখালরা সতর্ক হয়ে দাঁড়াল, ভাবল সর্বনাশা যুদ্ধের কালছায়া বুঝি তাদের মধ্যেও এসে উপস্থিত হয়েছে!

৩৬

ইতিমধ্যে জুলাই মাস শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু লিমুস্যাঁর ময়দানগুলো মে মাসের মতই ঝলমলে সবুজ। লুসিয়ঁ ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে রইল এই সবুজাভ বিস্তৃতির দিকে। সত্যিই, কী স্নিগ্ধ! তারপর মাঠ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পথ চলতে শুরু করল। সে নিজেই জানে না কোথায় চলেছে। অনেক আগেই ঐ বিরাট এ্যাশ্ গাছটার নীচে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ত লুসিয়ঁ কিন্তু খিদের জ্বালায় উঠে দাঁড়িয়েছে সে। এই তার শেষ মানবিক উপলব্ধি—মনে মনে হেসে উঠল লুসিয়ঁ। গাজর আর বীট খেয়ে বেঁচে আছে সে। কখনো কখনো তারই মত অপরিচ্ছন্ন আর দাড়ি গজানো কোন সৈনিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে লুসিয়ঁর সঙ্গে রুটি ভাগ করে নেয়। মাঝে মাঝে কোন এক গ্রামে এক বাটি টাটকা দুধ জুটে যায় তার ভাগ্যে আর রুটির উষ্ণ গন্ধ—যা আগে পীড়িত করে তুলত তাকে—চমৎকার মনে হয় তার কাছে ...বিগত যৌবনের স্মৃতিচিহ্ন আর জীবনের সৌরভ।

লুসিয়ঁ নিজের জন্যে একটা ছড়ি বানিয়ে নিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত সে রণাঙ্গনের ৮৭ নং পল্টনের সৈনিক ছিল। কিন্তু এখন আর সৈন্যবাহিনী বলে কোন কিছু নেই, লুসিয়ঁ তার নিজের ধারণায় একজন ভবঘুরে মাত্র। ছোট্ট এক গ্রামে সে তার বাবাকে বেতারে আপোষের শর্ত ঘোষণা করে বক্তৃতা দিতে শুনল। তার পাশে দাঁড়িয়ে এক বুড়ী আর্তনাদ করে উঠল: 'সব চুকে গেল? যাক বাবা, এ একটা ভাল খবর বৈকি!' তার পরে তার শুয়োরটাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলল বুড়ীটা—শুয়োরটার গোলাপী রংটা যেন কোন চিত্রকরের আঁকা নগ্ন নারীদেহের মতই। সৈনিকরা গাল পাড়তে লাগল কিন্তু লুসিয়ঁ মন দিয়ে শুনতে

লাগল তার বাবার কণ্ঠস্বরের ছন্দ-লালিত্য। হ্যাঁ, এই তো তার বাবার কণ্ঠস্বর। অনেক পুরনো শৈশবের স্মৃতিকথা জেগে উঠল মনের মধ্যে। মনে পড়ল, তার রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বাবা একবার বলেছিলেন, 'আমালি, লক্ষীটি, চিন্তা কোরো না। বিজ্ঞান সত্যিই সর্বশক্তিমান।' এখন তার বাবা বলছেন, 'আত্মা অমর।' কিন্তু জিনেৎ তো বাঁচতে চেয়েছিল। লুসিয়ঁ আরও অনেককে দেখেছে যারা বাঁচতে চেয়েছিল। ঐ জার্মান বৈমানিকদের তো দানবীয় শক্তি—স্ত্রীলোকদের আর শিশুদের লক্ষ্য করে সোজাসুজি গুলি করল ওরা...কীই বা অর্থ এই বক্তৃতার? আসলে ব্রতৈলের কাছে প্রশ্রয় পেয়েছে তার বাবা আর খুব সম্ভবত হিটলার একটা 'লৌহ ক্রশ' দেবে তার বাবাকে। লুসিয়ঁ ঘন ঘন হাই তুলছে। কেউ কি দুধ খেতে দেবে তাকে? কিন্তু হাজার হাজার সৈনিকই তো এই ভাবে তার চোখের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। সন্ত্রস্ত চাষীরা ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে তাকে দেখে আর সেই বুড়ী, যার সঙ্গ ধরে ফেলেছে লুসিয়ঁ, সে তার গোলাপী শুয়োরটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলেছে, 'আমার কিছু নেই, কিছু নেই আমার!'

সন্ধ্যাবেলা ভয়ানক ক্ষুধার্ত বোধ করল লুসিয়ঁ। বন্দুক দিয়ে ভয় দেখাল বুড়ীটাকে। কান্না থামিয়ে বুড়ী শুয়োর-বাঁধা দড়িটা আরো আঁকড়ে ধরল ঘনিষ্ঠভাবে, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আমার দেবার মত কিছু নেই।' জমিতে থুতু ফেলে লুসিয়ঁ গর্জন করে উঠল, 'ফের গজগজ করছিস!' শুয়োরটার কথা ভাবছে সে।

লুসিয়ঁ নিজের পথ ধরে এগিয়ে চলল। রাস্তা থেকে কিছু দূরেই একটা খামার। খড়খড়িগুলো বেশ শক্ত করে বন্ধ করা। রাত্রির দিকে তাকাতে ভয় পায় চাষীরা। কুকুরদের একটানা ঘেউ ঘেউ শব্দ ছাড়া আর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। লুসিয়ঁ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই হতভাগারা, কিছু খেতে দে আমায়!' কেউ কোন উত্তর দিল না, কেবল কুকুরগুলো আরও প্রচণ্ডভাবে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাস্তার ধারে ছোট্ট নদীটার দিকে অগ্রসর হল লুসিয়ঁ। তার উষ্ণ জল পান করল, জলে কেমন কাদার গন্ধ। তারপর একটা গরু-ভেড়া থাকবার আটচালার নীচে শুয়ে পড়ল। মেয়েলী কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম ভাঙল তার, একটি মেয়ে তাকে ডাকছে, 'সৈনিক! সৈনিক!' মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। রাত্রির পোষাকের ওপরে মেয়েটি পুরুষদের ওভারকোট পরেছে। জ্যোৎস্না-ঝলকানো রাত, মেয়েটির দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল

লুসিয়ঁ। এমন কি মনে মনে ভাবল : ‘মেয়েটি দেখতে মোটেই খারাপ নয়।’ ঝলমলে চোখ আর খাঁদা নাকে চমৎকার মানিয়েছে তাকে যদিও তার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হবার মত কিছু নেই। মেয়েটি বার বার বলে চলেছে : ‘সৈনিক! তুমি ঘুমোচ্ছ, সৈনিক?’ মেয়েটি তার জন্যে মস্ত বড় এক টুকরো রুটি আর কিছু মাংস এনেছে।

মেয়েটি বলল, ‘গিন্নী-মা না ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতে হল। উনি মাংসটা বাইরে রেখে বাকী সব ভাঁড়ারঘরে তালাবন্ধ করে দিলেন। তোমায় আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আসলে মনিব লোক খারাপ নয় কিন্তু আজকাল তোমাদের মত কত লোকই তো আসছে। উনি বলেন, আমরা সবাই না খেতে পেয়ে মারা যাব। আমি বাইরে এসে দেখি তুমি নদীর দিকে নেমে যাচ্ছ। ওঁনারা শুতে যাওয়া মাত্র আমি খাবার নিয়ে দৌড়ে এসেছি।’

লুসিয়ঁ কথা বলল না, শুধু তার ছুরিটা বের করে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল মেয়েটি। অনেকক্ষণ ধরে খেল লুসিয়ঁ—ভয়ানক তৃপ্তি পেয়েছে সে। কিন্তু খাওয়াটা থামাতে পারল না। ক্লান্তি আর ঘুমে প্রায় হতচেতন হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে লুসিয়ঁ প্রশ্ন করল, ‘তুমি কি বাড়ীর মেয়ে?’

‘আমি ঝি।’

অবশেষে খাওয়া শেষ হলে ঘাসের ওপর ছুরিটা মুছে নিয়ে মেয়েটির দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল লুসিয়ঁ। বুঝল, মেয়েটিও তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। রীতিমত অবাক লাগল লুসিয়ঁর—তার ধারণা তার চেহারাটা যে কোন লোককে ভয় পাইয়ে দেবার মত বস্তু। তার সারা মুখে খোঁচা খোঁচা শক্ত বাদামী দাড়ি। কিন্তু তার সবুজ চোখ দুটো চক চক করে সব সময়ে। ধুলো আর ঘামে তার সারা পোষাক আচ্ছন্ন। লুসিয়ঁ হাতের ইশারায় তাকে বসতে বলল। মেয়েটি তার কথামত এসে বসল। লুসিয়ঁর চেয়ে মেয়েটি প্রায় এক মাথা বেঁটে। ধীরে ধীরে যেন অনেক ভেবে চিন্তে তার কাঁধে হাত রাখল লুসিয়ঁ, তারপর অত্যন্ত সযত্নে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে চুমু খেল তাকে। ভাবল, জল খাচ্ছে সে। আবেগভরে লুসিয়ঁ তাকে অনেকবার চুমু দিল আর তারা দুজন ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লে মেয়েটি ফিস ফিস করে বলল, ‘সৈনিক! সৈনিক!’

ভোর হতে শুরু করেছে। মেয়েটি ছটফট করে উঠল। চুপি চুপি বলল, 'এই বার গিন্নী-মা ঘুম ভেঙে উঠবেন।'

লুসিয়ঁ শুধোলো, 'তোমার নাম কি?'

'জিন প্রেলি।'

বুকটা তোলপাড় করে উঠল লুসিয়ঁর। ধীরে ধীরে মেয়েটির লাল রুক্ষ হাতে টোকা মেরে ঠোঁট নাড়াল—কিছু একটা ভালবাসার কথা বলতে চাইল সে কিন্তু পারল না। অবশেষে বলল, 'জিনেৎ...'

'আর তোমার নাম?'

'লুসিয়ঁ।'

'আর কি?'

'লুসিয়ঁ স্থিভাল।'

তার উর্দি থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলে পথ চলতে শুরু করল লুসিয়ঁ, একবার পেছন ফিরে তাকালও না। নদীর ধারে এই রাত্রি-যাপন তার বিচারে ভাগ্যের উপহার—হতভাগ্য মানুষের স্বপ্ন। এখন সে ঘুম থেকে উঠেছে। স্থিভাল, তুরঁা, প্রেলি—তেসা বাদে যে কোন লোককে বেছে নেওয়া যেতে পারে! ওরা তো লুসিয়ঁকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচত, কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করবে না! একবার শুধু বললেই হল যে সে তেসার ছেলে, তাহলেই ওরা তাকে খাওয়াবে, পরাবে এবং গাড়ীতে করে ভিশিতে নিয়ে যাবে। কিন্তু এর চেয়ে সে বরং ঐ বুড়ীটাকে খুন করবে, সেই বুড়ী—একটা শুয়োর ছিল যার সঙ্গে।

এক অপরিচিত সৈনিকের দেখা মিলল, লাঠি হাতে হেঁটে চলেছে সে। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ কোঁচকাল।

সৈনিকটি রসিকতা করে বলল, 'মার্শাল দেখছি পল্টন হারিয়ে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ, আলপিনের মত।'

তারা যে যার আলাদা পথে চলে গেল। নতুন দিন শুরু হয়েছে, খাবারের সন্ধান করতে হবে তাদের।

অবশ্য মার্শাল পেতাঁর মাথা ব্যথাটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে নয়। গতকালই সে ফরাসী জাতিকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিয়েছে। বলেছে, সে কারো সঙ্গে প্রতারণা

করতে চায় না। অসন্তুষ্ট হয়ে সে পর পর ঘোষণা করেছে, 'রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করবেন না। রাষ্ট্র কিছু দিতে পারবে না আপনাদের। আপনাদের সন্তানসন্ততিদের ওপর নির্ভরশীল হোন। তাদের মধ্যে ধর্মভাব ও পারিবারিক নীতিবোধ জাগিয়ে তুলুন। তারাই আপনাদের বাঁচিয়ে রাখবে।' মার্শালের বক্তৃতা শুনে তেসা প্রথমে ভয়ানক মুশড়ে গেল। তাকে তো কেউ বাঁচিয়ে রাখবে না—ঐ হতচ্ছাড়া লুসিয়ঁটাও নয়, উগ্রমতি মেয়ে দেনিসও নয়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে সে বিদ্রূপ করে লাভালকে বলল, 'পঁচাশি বছর বয়সে এ কথা বলা অবশ্য ন্যায়সঙ্গত, বিশেষ করে যখন ছেলেমেয়েরা নয়, রাষ্ট্রই ওর ভরণ-পোষণ করছে।'

সৈনিকদের কথা কারও মনে নেই। রাজদূত ও প্রতিনিধি বাছাই, ব্রইতেলের নেতৃত্বে পারীতে প্রতিনিধি দল প্রেরণ, নতুন গঠনতন্ত্র রচনা, যুদ্ধের মাল মশলা জার্মানদের হস্তান্তর করা ও স্থ গলের গেরিলা দলের সঙ্গে মোকাবিলা—মন্ত্রীরা এই সব নিয়ে ব্যস্ত। সৈন্যবাহিনী—নিজের খেয়াল খুশি মত ভেঙে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। রেল গাড়ীর চলাচল বন্ধ। অনধিকৃত এলাকার লোকেরা পায় হেঁটে দক্ষিণমুখো আসছে। পারীর বাসিন্দা আর উত্তরাঞ্চলের লোকদের অবস্থা ঠিক ভবঘুরের মত, এদিকে চাষীরা সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে পুলিশের কাছে অনুনয় বিনয় করছে।

লুসিয়ঁ একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে বসল। সারাদিন শুয়ে রইল ঘাসের ওপর, এতটুকু নড়াচড়া করল না পর্যন্ত। দিনটা কেমন ঠাণ্ডা। পূর্বাঞ্চলের দুটি প্রতিবেশী শহরের ধূসর-রঙা দুর্গের উদ্দেশ্যে ভাসমান বিরাট স্ফীতকায় মেঘগুলির পেছনে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। লুসিয়ঁর কাছে কেমন অদ্ভুত লাগল এই মেঘের গতিবিধি। কোন কিছুই তার স্পষ্ট মনে পড়ছে না এবং অতীতের দিনগুলোকেও সে ফিরিয়ে আনতে চায় না, কিন্তু মেঘগুলির গতিবিধির মধ্যে সে একটা সময়-জ্ঞান খুঁজে পেল। মনে হল সে যেন আবার সংক্ষিপ্ত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছে। আঁরির মৃত্যু, কেমিস্টের দোকানের বাইরে জিনেতের চাউনি, বালিয়াড়ির পেছনকার সমুদ্র আর ঐ দুটি দুর্গের ওপরকার হালকা কুয়াশা—সমস্ত কিছু যেন এক সঙ্গে মিশ খাওয়ানো। সেই জন্যে সূর্যাস্ত ও দ্রুতগামী গোধূলির মধ্যে মেঘগুলির বিলুপ্তির পর জীবনটা যেন ফুরিয়ে এল লুসিয়ঁর কাছে। খানিক ঠাণ্ডা আর খানিক ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল সে। এর আগে সে কোনদিন মৃত্যুকে ভয় করেনি। কিন্তু ম্লান কুয়াশাচ্ছন্ন তারাগুলির নীচে পাহাড়ের এই

স্যাঁতসেঁতে সন্ধ্যায় সে ভীত হয়ে উঠল কেন? বিস্মিত হয়ে নিজেই সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'রুটি!' সত্যিই সারাদিন সে কিছুই খায়নি। তাকে উঠে গিয়ে সন্ধান করতেই হবে।

উপত্যকার মধ্যে নেমে পড়ল লুসিয়ঁ। ছোট ছোট চতুষ্কোণ জানলার আলো ঝলমল করছে গাছপালার মধ্যে। দরজায় ঘা দিয়ে লুসিয়ঁ বলে উঠল: 'সৈনিকের জন্যে কিছু রুটি মিলবে?' কেউ জবাব দিল না। সের্জে নামে এক একগুঁয়ে বুড়ো এই বাড়ীটার মালিক। ধর্মযাজকের কাছে স্বীকারোক্তি করার দরুণ তার স্ত্রীকে সে না খেতে দিয়ে মেরেছে। সিংহের মত তার শক্তি; হাতের জোরে তামার পয়সা বেঁকাতে পারে সে। গুহার মধ্যে ওৎ পেতে থাকা ভাল্লুকের মত এই লোকটি। এক সন্ত্রস্ত যুবতী ঝি সঙ্গে থাকে তার। মনিবের বকুনি খেলেই সে হেঁচকি তুলতে শুরু করে। তার বড় ছেলে বহুদিন হল কানাডা গিয়েছে। ছোট ছেলেটি পাশের গ্রামে তার শ্বশুরের সঙ্গে থাকে। মাসখানেক আগে তাকে সৈন্যদলভুক্ত করা হয়েছে যদিও বাঁ হাত দিয়ে সব কাজ করার অভ্যাস ছিল বলে সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল সে। ভাগ্যই লুসিয়ঁকে সের্জের বাড়ীতে এনে উপস্থিত করল।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে লুসিয়ঁ চেঁচিয়ে উঠল, 'কিছু রুটি দে না!' পাশের জানলা থেকে বাঁধাকপি আর পেয়াজের গন্ধ ভেসে আসছে, স্যুপ তৈরী করছে ঝিটা। গন্ধ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল লুসিয়ঁ। একটা বন্য ভাব জেগে উঠল তার মধ্যে, আলোকোজ্জ্বল জানলাটা কিন্তু নিস্তব্ধ। লুসিয়ঁর কাছে অসহ্য লাগল এই নিস্তব্ধতা। ওরা তাকে গালাগালি দিয়ে খেদিয়ে দিতে পারে কিন্তু তাই বলে সাড়া দেবে না কেন? উচ্ছন্নে যাক সব! কাদের জন্য তাহলে যুদ্ধ করল সে? জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। মশারীর মধ্যে একটা বুড়ো লোকের মুখ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে দেখে ব্রতৈলের কথা মনে পড়ল লুসিয়ঁর। সের্জে মোটেই 'মন্ত্রশিষ্য'দের নেতার মত দেখতে নয়, কিন্তু লুসিয়ঁ এতটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে যে তার মনে হচ্ছে এই লোকটির মধ্যে সে ব্রতৈলের সাদৃশ্যই দেখতে পেয়েছে। খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে লুসিয়ঁ আর্তনাদ করে উঠল, 'দোর খোল শয়তান কোথাকার! নইলে গুলি করব তোকে!'

লুসিয়ঁ ঐ আলোকোজ্জ্বল অপয়া জানলাটাকে লক্ষ্য করেই গুলি করত কিন্তু তার আগেই গুলির শব্দ হল; লুসিয়ঁ যেন নাচছে এমনি ভাবে পা দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে মাটিতে পড়ে গেল।

পড়বার সময়ে একটা কথাও উচ্চারণ করল না লুসিয়ঁ। সের্জেই কেবল আর্তনাদ করে উঠল। আশেপাশে কোন বাড়ীঘর থাকলে লোকেরা তক্ষুনি ছুটে আসত, কিন্তু সের্জের বাড়ীটা একটা নির্জন উপত্যকার মাঝখানে আর সেখান থেকে কেবল একটা প্রতিধ্বনি ফিরে এল: 'এ্যাই!' আর রান্নাঘরের ঝিটা ভয়ে হেঁচকি তুলতে তুলতে নিস্তেজ হয়ে এল।

এক সময়ে সের্জে শুয়োর শিকারে যে বন্দুক ব্যবহার করত সেটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি লুসিয়ঁর কাছে দৌড়ল। লুসিয়ঁ শেষ নিশ্বাস ফেলছে। মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু হল তার। কুয়াশাচ্ছন্ন চাঁদ সবুজ আলোয় স্নান করিয়ে দিচ্ছে লুসিয়ঁর গাল দুটো। বেড়ালের মত চক চক করছে তার চোখ আর তার চুলগুলো যেন ঝলসে উঠছে আগুনে। কোন জনপ্রিয় ফিল্মের কন্দর্পকান্তি দস্যুর মত দেখাচ্ছে তাকে। সের্জের লণ্ঠনের আলোয় তার উর্দির ওপরকার রক্ত ঘন টাটকা রঙের মত ভেসে উঠল।

লণ্ঠনটা নীচে নামিয়ে রেখে সের্জে মৃতদেহের পাশে গিয়ে বসল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত একই ভাবে বসে রইল সে; মাঝে ধূমপান করার ইচ্ছে হওয়ায় তামাকের থলিটা টেনে বের করল কিন্তু তারপর ভুলে গেল তার কথা। স্থির হয়ে বসে রইল সের্জে; কেবল উস্কোখুস্কো ধূসর চুলশুদ্ধ বিরাট মাথাটা একটু একটু করে এদিক ওদিক দুলতে থাকল।

ঝিটা বাইরে বেরিয়ে এল। ত্রস্ত পায়ে মৃতদেহের কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ইস! কী সুন্দর চেহারাটা!'—তারপরই হেঁচকি উঠে কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার। সের্জে গর্জে উঠল: 'চুপ!' মেয়েটি চলে যেতে চাইল কিন্তু সের্জে থাকতে বলল তাকে। এক সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বিচিত্র ও অবিচলিত গলায় বলল, 'ডাকাত! কিন্তু কে সে? একজন সৈনিক! একজন ফরাসী......'

মেয়েটি হঠাৎ ভয়ে ছাইএর মত শাদা হয়ে গেল, মৃত লোকটির পাশে বসে চিৎকার করে কাঁদছে তার মনিব:

'পিয়েরো! আমার খোকা!'

সকালে একটা রিপোর্ট লেখা হল। সের্জে সই করে দিয়ে বলল, 'এবার আমায় নিয়ে চলুন।' কিন্তু পুলিশের হাতে ইতিমধ্যে বহু লোক জমা হয়ে গিয়েছে, যাদের সংগ্রহ করতে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করতে হয়নি। সার্জেণ্টটি বলল, 'ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখা হবে। তারপর দরকার পড়লে, ওরা

ডেকে পাঠাবে আপনাকে।' লুসিঁয়র পকেট হাতড়ে ওরা কোন কাগজ খুঁজে পেল না। তাই রিপোর্টে লিখল: 'অপরিচিত লোক—পরনে সৈনিকের উর্দি।' হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, 'এই যে পেয়েছি!' লুসিয়ঁর কোটের ভেতরকার পকেট থেকে যে কাগজের টুকরো পাওয়া গিয়েছে সেটা দেখাল মেয়েটি। সার্জেন্ট কাগজটা খুলল। বড় বড় হরফে তিনটি কথা লেখা আছে কাগজটিতে: 'ফ্রান্স, জিনেৎ, মেরদ্।'

থুতু ফেলে সার্জেন্টটি চেঁচিয়ে উঠল, 'ডাকাত!'

৩৭

ক্ল্যমঁাসের ফ্ল্যাটে দেনিস আত্মগোপন করেছে। বৃদ্ধা মহিলাটি যে এখনো পারীতে আছেন তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই। ট্রামের বাজনা বা গানের শব্দ এই রুদ্ধ গলির ভেতর পৌঁছয় না। নিঃশব্দতাটা প্রায় অসহ্য। দেনিস বহুবার চলে যেতে চেয়েছে কিন্তু ক্ল্যমঁাস বলে কয়ে ধরে রেখেছেন তাকে।

ক্ল্যমঁাস বলেছেন, 'দুটো দিন সবুর করে যাও। দেখছ তো লোকজন আর কেউ নেই। এখন বেরোলেই ধরা পড়বে।'

প্রতিদিন সকালে ক্ল্যমঁাস থলে হাতে বেরিয়ে যান, ফিরে আসেন রুটি তরকারী আর মাঝে মাঝে কিছুটা মাংস নিয়ে। রান্না করতে বসেন খুশি মনে যেন জিনোর জন্যে সপ্তব্যঞ্জন তৈরী করছেন।

সমস্ত খবর তিনি বলেন দেনিসের কাছে: 'দেভিলরা তো ফিরে এসেছে। রুশো আর তার বৌকেও দেখলাম। আরো অনেকে নাকি ফিরে আসছে। দেভিলের তো দেখলাম বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাবার মত অবস্থা। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কমিউনিস্টরা কোথায়? বললাম কমিউনিস্টরা গা-ঢাকা দিয়েছে, সহজে ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার মত লোকও ওরা নয়। এ ছাড়া ওকে আর কীই বা বলা যায়? ও কিন্তু একটু ক্ষুণ্ণই হল যেন। সবাই বলছে, 'আমরা আর কিসের আশায় বেঁচে থাকব?' জার্মানদের আধিপত্য কেউই চায় না। ও কি, আর একটু সসেজ খাও। বাজারে মাংস নেই, দু-একদিনের মধ্যে অন্য কোন জিনিসও আর পাওয়া যাবে না। জার্মানরা

হাতের কাছে যা পাচ্ছে চালান দিচ্ছে। টাকার তো আর অভাব নেই, খুশিমত নোট ছাপিয়ে সৈন্যদের ভেতর বিলি করা হচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, তকমাধারী ফৌজ রাশি রাশি মালপত্র মাথায় নিয়ে চলেছে। কোন বাছবিচার নেই। কফি, মোজা, জুতো—হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই নিচ্ছে। যা পার খেয়ে নাও। কে জানে, হয়ত দু দিন পরে উপোস শুরু হবে। কিন্তু তোমাদের শক্তি যেন এক তিলও ক্ষয় না হয়। দেভিলের কথাই ঠিক—তোমরাই এখন আমাদের ভরসা।'

আতঙ্কের শুরুতেই দেনিসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন সে শহরেই থাকে এবং গাস্তর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পারীর কাজ চালিয়ে যায়। জার্মানরা আসবার আগের দিন। দেনিসকে যে ঠিকানাটা দেওয়া হয়েছিল সেখানে সে গেল। দরজা খুললেন একজন বৃদ্ধা মহিলা, অশ্রু-ভারাক্রান্ত চোখে তিনি বললেন, 'গাস্তকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি আর এখানে থাকব না, পায়ে হেঁটেই পালাচ্ছি'। একে একে সমস্ত কমরেডের বাড়ী ঘুরে এল। বাড়ীগুলো ফাঁকা। সবাই কি পালাল নাকি? নাকি গা-ঢাকা দিয়েছে?

তারপরের দিনগুলোর নিষ্ক্রিয়তাটা সব চেয়ে ভয়ংকর মনে হল তার কাছে। সময় কাটত একটু একটু করে। রাত্রিবেলা ঘড়িটার অবিশ্রান্ত টিক্ টিক্ শব্দ শুনে প্রবল একটা ইচ্ছা হত ওটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। বেসিনের ওপর কলের জল পড়ত ফোঁটা ফোঁটা—টিপ্, টিপ্, টিপ্।

মিশো কোথায়? মিশো বেঁচে আছে কিনা সে খবরটা না জেনেই হয়ত তার মৃত্যু ঘটবে। হয়ত সে আর কোন দিন মিশোকে বলতে শুনবে না—'ঠিক তাই!' ইচ্ছা করলেই তারা দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারত; সুখী হত দুজনে। কিন্তু এখন আর কিছুই নেই—না আছে সভা সমিতি, না আছে জীবন। পারী জার্মানদের কবলে। কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। আর মিশো নেই। হয়ত নিহত বা বন্দী। জীবিত অবস্থায় জার্মানদের হাতে ধরা পড়াটা কী ভয়ংকর! সমগ্র বাহিনীকে ওরা বন্দী করেছে।

জুন মাসের রাত্রি অনন্ত দীর্ঘ মনে হল দেনিসের কাছে। বারবার মনে মনে উচ্চারণ করল, 'মিশো! মিশো!' এবং এই একই নামের পুনরাবৃত্তি কেমন একটা অবচেতন আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করল তার মনে।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে মনে পড়ল ক্লদের কথা; ক্লদ তাকে বলেছিল যে ও পারীতেই থাকবে। ওকে খুঁজে বার করবে সে। ওর ঠিকানা সে জানে।

মে মাসের হাঙ্গামার সময় ওর জন্যে সে ঘর ভাড়া করেছিল। সেই বাড়ীতেই এখনো ও আছে কি না কে জানে ?

বেরুবার আগে ক্ল্যমাঁস দেনিসকে আলিঙ্গন করলেন যেন সে দীর্ঘ ভ্রমণে যাচ্ছে।

ক্ল্যমাঁস বললেন, 'ঠোঁটে আর একটু রং মেখে নাও। রং-মাখা মেয়েদের জার্মানরা ছোঁয় না।'

পারী শহরের কেন্দ্রস্থল দিয়ে দেনিসের যাবার রাস্তা। প্রথম জার্মান সৈন্য চোখে পড়তেই দু পা সরে গেল সে, প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যাবার মত অবস্থা। কী কুৎসিত মুখ! জামার আস্তিনে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা। কিন্তু এতটা সন্ত্রস্ত হলে চলবে না, মনে মনে নিজেকেই নিজে বলল। সমস্ত কিছু গোপন করে চলতে হবে এখন। নিজের পথ ধরে সে এগিয়ে চলল, তার মনে এখন একমাত্র চিন্তা ক্লদকে খুঁজে বার করে আবার সে কাজ শুরু করতে পারবে কিনা।

বুলভারে পৌছে সে চেষ্টা করল কোন দিকে না তাকাতে কিন্তু না তাকিয়েও পারল না। বড় বড় কাফের বারান্দায় জার্মান অফিসার আর বেশ্যাদের ভীড়। মেয়েগুলোর সাজপোষাকের ঘটা দেখলে মনে হয় যেন ওরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে। অনাবৃত উরু, পায়ে স্যাণ্ডাল, এনামেল করা হাতের নখগুলো মুক্তার মত ঝকঝকে। হো হো করে হাসছে, শ্যাম্পেন গিলছে আর গ্লাশে গ্লাশে ঠোকাঠুকি করছে। দোকানের জানলায় জানলায় অভিধান আর জার্মান ভাষায় পারীর পথ-বিবরণী। সৈন্যদের জন্যে থরে থরে সাজানো নানা রকমের স্মৃতি উপহার—খেলনার আকারে ঈফেল টাওয়ারের প্রতিরূপ, ছোটখাটো অলংকার, পোস্টকার্ডে ছাপানো ছবি আর অশ্লীল ফটো। ফলাও ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। ফ্রাঁ বদলে মার্ক নিচ্ছে সবাই। খবরের কাগজের হকাররা হাঁকছে, 'লে মাতাঁ্যা', 'লা ভিক্তোয়ার।'

একটা খবরের কাগজ কিনে দেনিস তাকিয়ে দেখল। প্রথমেই চোখে পড়ল এক জায়গায় লেখা—'আমাদের অমায়িক অতিথিরা যে ফরাসী খাবারের সূক্ষ্ম স্বাদ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' তার-পরেই একটা বিজ্ঞাপন—'আমি দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেছি। জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারি। পরিচারকের কাজ পেলে অনুগৃহীত হব।'

কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দেনিস।

পরিত্যক্ত অধিকৃত শহরে কীট আর পিশাচের অস্বাস্থ্যকর গোপন রাজত্ব শুরু হয়েছে। নিজের বলতে আর কিছুই নেই কারও। দেওয়ালের ছবি, গায়ের জামা, মুখের হাসি, এমন কি শেষ আত্মসম্মানটুকু বিক্রী করছে লোকে। বিরক্তির সঙ্গে দেনিস নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, 'এই কি পারী?'

নদীটা পার হয়ে বাঁ তীর ধরে বহুক্ষণ সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। রাস্তায় লোকজন নেই, জনশূন্য রাস্তাগুলো আরও বেশী দীর্ঘ বলে মনে হয়।

যেন এক মন্ত্রমুগ্ধ শহর! দোকানগুলো পরিত্যক্ত, কিন্তু সচরাচর যেমন থাকে তেমনিভাবে সাজানো রয়েছে টাই, খেলনা, খোদাই করা মদের পাত্র। একটা হাঁ-করা দরজায় বুড়ো মানুষের মত ঠেস দিয়ে রয়েছে একটা ভুলে-ফেলে যাওয়া ছাতা। ওপাশে বারান্দায় একটা ফুলের টবে গাছটা শুকিয়ে ঝরে গেছে। বারান্দায় ঝোলানো পাখীর খাঁচা, ভেতরে একটা মৃত ক্যানেরি পাখী। 'নিদ্রাচ্ছন্না সুন্দরী' কথাটা মনে পড়ল দেনিসের। রূপকথার বইয়ে দেখা সেই ছবিটাও মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

কারুকার্য খচিত অট্টালিকা, রেনেশাঁ প্রতিমূর্তি, অষ্টাদশ শতাব্দীর স্তম্ভ,—এমন খুঁটিয়ে এসব জিনিসকে সে আর কোন দিন দেখেনি। একদিন এই পাথরকে জয় করেছিল মানুষ, আজ মানুষের পরাজয়ে পাথরের আনন্দোৎসবের দিন।

বুলভার পোর্ ‌রয়াল-এ একটা কুঁজো লোক গাছের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি দিয়ে রাস্তা ঠুকতে ঠুকতে একজন অন্ধ রাস্তা পার হয়ে গেল। ওপাশে এক যুবক নেঙচাতে নেঙচাতে পথ চলছে। যত বিকলাঙ্গ আর পিশাচ বেরিয়ে এসেছে গর্ত ছেড়ে। অন্যদের মত এরা পালিয়ে যেতে পারেনি, শহরের মানুষ বলতে এখন এরাই।

লেবুগাছে ফুল ধরেছে, বাতাসে দূরাগত গ্রাম্য গন্ধ। আতঙ্কিত পাখীর দল এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে—আকাশের যান্ত্রিক গর্জনে ওরা এখন পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। অধিকৃত শহরের ওপর দিন-রাত্রি জার্মান বিমান উড়ে বেড়াচ্ছে। এত নীচু দিয়ে উড়ছে মনে হয় ছাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে বুঝি।

তারপর এই জনশূন্য অঞ্চলে হঠাৎ একদিন লোকজন ফিরে এল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুমন্ত শিশু কোলে আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়। এক সপ্তাহ আগে ওরা শহর ছেড়ে পালিয়েছিল। তখন ওদের মুখে ছিল ভয় ও আশার চিহ্ন।

বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল কোন রাস্তা ধরে এগুতে হবে, অভিশাপ দিয়েছিল বিশ্বাসঘাতকদের, নিরাপদ স্থানে পৌঁছবার চেষ্টায় ছুটোছুটি করেছিল এখানে সেখানে। আর এখন কসাইখানার গরু-ভেড়ার মত ধীর মন্থর ওদের গতি। এই কয়দিনে কী ভয়ংকর সব দৃশ্যই না তারা দেখেছে। মেশিনগানের গুলি গোলা থেকে আত্মরক্ষা করেছে, লুণ্ঠিত ট্রেন ছেড়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে, বিষাক্ত কুয়োর জলের ওপর অশ্রুবর্ষণ করেছে। অনেকেরই প্রিয়জন মৃত, প্রত্যেকেই আশাহীন। পালিয়ে যাবার সময় কেউ বুঝতে পারেনি যে পারী চারদিক থেকে অবরুদ্ধ। শাৎ´র, অরলেআঁ আর জিয়ঁতে পৌঁছে জার্মানদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেখান থেকে হটিয়ে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে ওদের। জেল-ফেরৎ পলাতক আসামীর মত ওরা ফিরে এসেছে নিজের দেশে। জার্মানদের দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রন্দনরত শিশুর কানে কানে মা বলছে, 'চুপ কর বাছা।'

একটা প্রাচীরপত্র দেনিসের চোখে পড়ল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একজন জার্মান সৈনিকের কোলে একটি শিশু, পাশে একটি হাস্যমুখী মহিলা। তলায় লেখা, 'ফরাসী জনসাধারণের রক্ষাকর্তা!' তার পাশেই একটা বিবর্ণ ছিন্ন ঘোষণাপত্র: 'ওদেয়ঁ......প্রথম অভিনয়...শেক্স্‌পীয়রের নাটক!' জার্মান সৈনিকটির চোখ উজ্জ্বল নীল। এই রকমের আরো বহু জোড়া চোখ এখন চারদিক থেকে দেনিসের দিকে তাকিয়ে আছে। দেনিস চোখ ফিরিয়ে নিল, তবুও সেই চোখ এড়াতে পারল না। রাস্তাটা পার হয়ে অপর দিকে এসে দাঁড়াল, কিন্তু সেখানেও সেই উজ্জ্বল নীল শাদাটে চোখ। আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল দেনিস—দেওয়ালের গা থেকে বেরিয়ে এসে চোখ দুটো তার দিকে এগিয়ে এল যেন। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি যে ওটা জীবন্ত মানুষ। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্টটি কৌতুকভরে মুখের পাইপটা দু-একবার নাড়াল শুধু।

পরের রাস্তাটার নাম এ্যাভেন্যু দে গোবেলাঁ। খরা রৌদ্রে বিশ-ত্রিশজন স্ত্রীলোক লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল যেন। কে যেন বলে উঠল, 'ওরা সৈন্যদের এক-এক করে বন্দী করছে।'

হঠাৎ সামনে একটা বাড়ীর দিকে স্ত্রীলোকেরা ছুটে গেল। খানিকটা নীল দুধ ছিটকে পড়ল রাস্তার এ্যাস্‌ফল্টের ওপর। বাড়ীটার ভেতর থেকে একজন যুবককে বন্দী করে বেরিয়ে এল একদল পুলিশ। যুবকটির পরনে

ফৌজী পাৎলুন, আর শ্রমিকের নীল কোর্তা। কে যেন বলে উঠল, 'ওর মা আসুক!'

একজন বৃদ্ধা মহিলা—মুহূর্তের জন্তে দেনিসের মনে হল যেন মহিলাটি ক্ল্যমাঁস—এগিয়ে গিয়ে সৈনিকটিকে আবেগভরে আলিঙ্গন করল। 'আচ্ছা যাই মা!' ফিসফিস করে বলল যুবকটি।

একটি পুলিশ-ভ্যানের ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল যুবকটিকে। পুলিশের দলটা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। তাদের দিকে তাকিয়ে মহিলাটি কঠোর স্বরে বললেন, 'ও, এতক্ষণে বোঝা গেল কে তোমাদের লেলিয়ে দিয়েছে!'

তারপর আবার সেই নীল শাদাটে চোখ—কনিয়াক মদ টানছে, সসেজ খাচ্ছে, দাঁত কড়মড় করছে।

রাস্তাটার মোড় ঘুরে দেনিস গিয়ে দাঁড়াল প্লাস দিতালিয়ের পেছনে দরিদ্র অঞ্চলে। বাড়ীগুলো কেমন নেড়া নেড়া। চারদিকে নোংরা আর আবর্জনা। এখন আর কোন সাজসজ্জা নেই—না আছে কলরবমুখর জনতা, না আছে আলোকোজ্জ্বল দোকানের জানলা। এক জায়গায় কয়েকজন বৃদ্ধা তাস খেলছে। দরজায় দরজায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে বহু স্ত্রীলোক, ভঙ্গীটা এমন যেন সৈন্যদের দেখামাত্রই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জার্মানরা এখানে আসে না।

দেনিস ঘণ্টা টিপল কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। কে বলতে পারে? শেষ সময়ে লোকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পালিয়ে গেছে। বিরাট চলমান জনতার ছন্দোবদ্ধ পদধ্বনি এবং দূরদেশে পালিয়ে যাবার উন্মাদ ইচ্ছা তাদের চালিত করেছে। তাছাড়া ক্লদ গ্রেপ্তারও তো হতে পারে। জার্মানরা বাড়ী বাড়ী ঢুকেছে। দরজায় কান পেতে দেনিস শুনতে চেষ্টা করল। কোন রকম শব্দ নেই।

কিন্তু ভেতরে দরজার ছিটকিনিতে হাত রেখে ক্লদ উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবছিল, 'এবার ওরা এসেছে!' কিছুক্ষণ সে দরজা খুলল না—আরও কিছুক্ষণ সে স্বাধীনতাটুকু উপভোগ করে নিতে চায়।

'তুমি!'

বহুক্ষণ দুজনে কোন কথা বলতে পারল না। কথা শুরু করল ক্লদ: 'আমাদের কপালে শেষকালে এই ছিল! কোন দিন ভাবিনি যে এমন ঘটনা ঘটবে! কথাটা বুঝতে পারছ বোধ হয়—পারীতেও জার্মানদের আবির্ভাব ঘটল!'

দেনিস ওর দিকে তাকাল। গাল দুটো ফ্যাকাশে—কিন্তু চোখের ভেতর আগুন জলছে যেন। অত্যন্ত শ্রীহীন একটা ঘর। টেবিলের ওপর এক টুকরো রুটি, কবিতা লেখা একটা খাতা, আর একটা বই—নাম 'ইস্পাত তৈরীর ইতিকথা।'

দেনিস বলল, 'আমাদের কিছু একটা করতে হবে। তোমার সঙ্গে আর কারও যোগাযোগ আছে?'

'না। আমাদের লোকজন যারা ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র জুলিএঁর থাকবার কথা। কিন্তু ওর ঠিকানা আমি জানি না। ভেবেছিলাম ও নিজেই আমার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ও রাস্তায় বেরুতে পারবে। আমরা এখন দাগী লোক হয়ে উঠেছি। আমাদের তল্লাশে ওরা ঘোরাফেরা করছে। শিয়াপ যে এখানে থেকে গেল, তার পেছনে কোন কারণ নেই ভাবো নাকি—ও তো এখন জার্মানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

'ক্লদ, কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। আশ্রয়প্রার্থীরা ফিরে আসছে। প্রথমেই ওরা কাদের কথা জিজ্ঞেস করছে জান? কমিউনিস্টদের কথা। বসে থাকলে চলবে না। এখন বসে থাকাটা রীতিমত অপরাধ।

'আমার এখানে হেক্‌টোগ্রাফ যন্ত্র, কালি আর কাগজ আছে। কিন্তু ওসব দিয়ে এখন আর কি কাজ হবে? ঠিক এই মুহূর্তে কি ধরনের লেখা দরকার তা কি আমরা জানি?'

কথাটা বলে ক্লদ টেনে টেনে কাশতে লাগল। কোন কথা বলল না দেনিস। সে বুঝতে পারছে, কথাটার কোন যৌক্তিকতা নেই। ক্লদ যে একজন অত্যন্ত ভাল কমরেড, যে কোন কাজে ও যে নির্ভীকচিত্তে অগ্রসর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেনিস নিজে যতটা জানে ও তা জানে না। এমন অন্য কেউ নেই যার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।

নিশ্চেষ্ট ভঙ্গীতে জানলার পাশে বসল দেনিস। সামনে প্রসারিত প্রাণহীন রাস্তা। হঠাৎ সব কথা মনে পড়ল দেনিসের। এই রাস্তা দিয়ে মিছিল গিয়েছিল। বারান্দায় বারান্দায় লাল উত্তরীয় আর সংগীতমুখর জনতা, গাছের ডালে ডালে ছোট ছোট ছেলেদের চড়ুই পাখীর মত লম্ফঝম্প—সব মনে আছে দেনিসের। মেয়েরা বজ্রমুষ্টি তুলেছিল আকাশের দিকে। বিচিত্র, উজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল সব কিছু। আর সেই মিছিলের আগে আগে ছিল

মিশো। ঘাড় টান করে বসল দেনিস। মিশো, কোথায় তুমি? কোন উত্তর নেই। সম্মুখে দৃষ্টি রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে মিশো। দীর্ঘ দেহ, প্রাণবন্ত, জার্মান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দীর্ঘ পদক্ষেপে পরিখার পর পরিখা পার হয়ে চলেছে। মিশো জানে, সে ভুল করবে না, সে থামবে না কোনদিন। এগিয়ে চলেছে সে।

অস্পষ্ট হাসল দেনিস, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

'ক্লদ, আমাকে এক টুকরো কাগজ দাও তো।'

ক্লদের মনে হল, দেনিস কবিতা লিখছে। পা টিপে টিপে এক কোণে সরে গেল সে। কিন্তু দেনিস কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কথাগুলো সে ধরতে পেরেছে, কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছিল না। বুলভারে যেতে যেতে যে কথাগুলো তার মনে ভেসে এসেছিল, সেগুলো আবার মনে করতে চেষ্টা করল, 'এই কি পারী?' তারপরেই আরও বহু কথা মনে পড়ল: 'বিপ্লবের লালনাগার......কমিউন প্রতিষ্ঠাকারী নগরী......ফ্রান্সের হৃৎপিণ্ড......'

তার মনে হল যেন সে বহু কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। যে সব সৈনিক সর্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর, নাৎসীদের বিদ্রূপ শুনতে শুনতে যে সব যুদ্ধ-বন্দী রাস্তার পাথর ভাঙছে তাদের কণ্ঠস্বর, যে সব আশ্রয়প্রার্থী অনন্ত দীর্ঘ পথে পথে দিন কাটাচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বর ফরাসী জনসাধারণের। আর এই জনশূন্য নগরীতে একটিমাত্র মেয়ে কান পেতে শুনছে সমস্ত কান্না, সমস্ত নিস্তব্ধতা, আশা ও ক্রোধের সমস্ত বাণী। একবারও না থেমে সে লিখে চলল যেন অন্য কেউ বক্তব্য বিষয় তাকে বলে দিচ্ছে।

আগাগোড়া পাণ্ডুলিপিটা নিঃশব্দে পড়ে ক্লদ চোখ মুছল। হাতে খানিকটা বেগুনী কালি লেগেছিল—কালি লেগে নোংরা হয়ে গেল মুখটা।

'দেনিস, কি করে লিখলে তুমি?'

'চুপ!'

টহলদারী সৈন্যের ভারী পায়ের শব্দ তার কানে গিয়েছিল। তারপর গাড়ীর ছাদে লাগানো লাউড-স্পীকারের গলা ভেসে এল:

'বাড়ী ফিরে যাও! সময় হয়ে গেছে! বাড়ী ফিরে যাও! সময় হয়ে গেছে!'

মার্শাল পেতঁ্যার দ্বারা আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ভিশিতে হবার কথা। এই উপলক্ষে কাসিনো হলঘরটিকে সাজানো হয়েছে। অল্প কিছুকাল আগে পর্যন্ত এইখানেই মতিনি বাজী ধরে তাস খেলত আর লুসিয়ঁর আকর্ষণ ভুলবার জন্যে একটা প্রাণপণ চেষ্টায় যোসেফিন ট্যাঙ্গো নাচত ভেনিজুয়েলার সংবাদ বিভাগের প্রতিনিধির সঙ্গে।

ফ্রান্সের এই বিপর্যয় এমন একটা সময়ে ঘটেছিল যখন কয়েক হাজার বহিরাগত ভিশিতে আসে সেখানকার জলবাতাসে যকৃতের অসুখ ভাল করবার জন্যে। শীতকালে কয়েকটা হোটেলকে সামরিক হাসপাতালে পরিণত করা হল। এখন দেখা যাবে পীড়িত ও আহত সৈন্যরা বিচিত্র জনতার দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভিশিকে এখন আর চেনা যাবে না। শুধু যে ডেপুটিরা আর সেনেটররা ভীড় করে এসেছে তা নয়, পারীর অভিজাত সমাজ উঠে এসেছে এখানে। শিল্পপতি, দালাল, বড় বড় কর্মচারী, সাংবাদিক, বারবণিতা—সবাই এসেছে এখানে। চলতে ফিরতে নানারকম মন্তব্য শোনা যাবে: 'এই যে কাউণ্ট, তুমিও এখানে!' 'আরে বুল, তুমিও আসতে পেরেছ দেখছি?' 'কিন্তু সেই ক্ষুদে বান্ধবীটি গেল কোথায়?,

সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এই অভূতপূর্ব বৎসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আজ ঘটবে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এই ঘটনার কেন্দ্রমূল। লাভালের ইচ্ছা, কোন রকম জাঁকজমক না হয়। কিন্তু ব্রতৈল প্রচলিত রীতিনীতির পক্ষপাতী। সুতরাং ঠিক হল, যথাযোগ্য সমারোহের সঙ্গে তৃতীয় রিপাব্লিকের কবর দেওয়া হবে।

তেসা বহুকাল ধরে এই ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, স্বভাবতই সে এখনো আশাবাদী। দীর্ঘ ভ্রমণের উত্তেজনা কেটে যাবার পর সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, বেঁচে থাকবার ইচ্ছাটা পেয়ে বসেছে আবার। বারবার সে নিজেকে এই কথা বলেছে যে মার্শালের পরিকল্পনা তার পক্ষেই সুবিধাজনক, এখন আর তাকে নির্বাচিত হতে হবে না, সে মনোনীত হবে। মনোনীত হওয়াটা অনেক বেশী নির্ঝঞ্ঝাটের। কিন্তু তবুও মনে মনে উদ্বেগ অনুভব না করে পারছে না। দেসেরের মন্তব্যটা কিছুতেই মন থেকে দূর করা গেল না: 'বেচারা বনেদী এ্যারিস্টোক্রাট!'

অবশ্য দেসেরের চিন্তা এখন আর তার মনে নেই, কিন্তু এই অপ্রীতিকর মন্তব্যের ভেতর কিছুটা সত্যি আছে বৈকি। সে, তেসা, অপরের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর তারা আত্মগোপন করেছিল তার দূরপ্রসারী খ্যাতির আড়ালে। আর আজ তারাই তাকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করছে। আগামী কাল যে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হবে না এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি? দক্ষিণপন্থীরা তাকে র‍্যাডিকাল বলে মনে করে। বোর্দোতে সবাই তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল আর এখানে লাভাল তো তার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল না। লেবুর রস তৈরী হয়ে যাবার পর নিংড়ে-নেওয়া লেবুটাকে নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

প্রায় কান্না পেল তেসার। সবাই তাকে অপমান করছে। সে কি লাভালকে সাহায্য করেনি? জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করা যখন প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখন সেই ভয়ংকর স্প্যানিয়ার্ড লোকটির সঙ্গে কে বোঝাপড়া করেছিল? কে সর্বপ্রথম বলেছিল যে কমাপিএঞ-এ গৃহীত শর্তাবলী সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য? লোকের স্মরণশক্তি এত কম! এমন কি তার নিজের পরিবারের লোকেরাও তাকে বুঝতে পারেনি। ওই খামখেয়ালী দেনিসের কথাই ধরা যাক না কেন। ওকে সে কত ভালবাসত, কত তোয়াজ করত। আর এখন জার্মানরা তো ওর মাথা উড়িয়ে দেবে। ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়! ঠাট্টাতামাসা করে কোন কথা হিটলার বলে না, বলে না বলেই হিটলারের জয়লাভ হয়েছে। দেনিসের কপালে কি আছে কে জানে? দু বার নাক ঝাড়ল তেসা, জল গড়াতে লাগল চোখ থেকে। তারপর লুসিয়ঁর বাদামী রঙের চুলের কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠল তেসা। ও নিশ্চয়ই তেসার নাম ডোবাবে। এটা ওর রক্তের দোষ, ঠিক ওর কাকা রবেরের মতই ও হয়েছে। তফাৎ শুধু এই যে রবের চার বছর জেল খেটেই ছাড়া পাবে কিন্তু লুসিয়ঁটার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতী। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে ও মারা গেছে? তাহলে তেসার বংশ এখানেই শেষ। আর ফ্রান্সেরও তো কোন ভবিষ্যৎ নেই। হাতটা একবার নাড়ল তেসা। হঠাৎ তার মুখে চোখে একটা ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠল—পলেতের কথা ভাবছে সে। ওই নরকের কীটটা এখন বোধ হয় জার্মানদের মন ভোলাচ্ছে। জাতির বিপদে ওর কি আসে যায়, অল্পবয়সী ফুর্তিবাজ কোন লোককে পেলেই ওর হল।

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল তেসার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। এই পরিবর্তনের কারণ ছোট্ট একটি ঘটনা। ব্রতৈভ টেলিফোন করে তার খবরাখবর

নিয়েছে। এখন তেসা বুঝেছে যে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। যদিও জাতীয় পরিষদের সভায় মোড়লী করবার দায়িত্ব সে প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু ছোট্ট একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা সে দেবে। 'লুমানিতে' কাগজে একজন আলশেসিয়ান ইহুদীর আসবারের দোকানের বিজ্ঞাপন হঠাৎ সে আবিষ্কার করেছে। বিষয়টির উল্লেখ করে সে মন্তব্য করবে: 'এই হচ্ছে ইহুদী পুঁজি আর কমিউনিস্টদের ভেতর যোগসূত্র। এই আত্মঘাতী যুদ্ধের মূল এখানে।'

একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রতৈল তেসাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলল, 'শোন, তোমার আজ বক্তৃতা না দেওয়াই ভাল।' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে তেসা তাকিয়ে রইল। ব্রতৈল বুঝিয়ে বলল যে বক্তৃতা না দেওয়াটাই বিচক্ষণতার পরিচয়। লোকের বিভ্রান্তি ভাবটা এখনো কেটে যায়নি, সবাই চেষ্টা করবে অতীতের সমস্ত ঘটনা টেনে বার করতে। স্টাভিস্কি, পপুলার ফ্রণ্ট এবং এমনি আরো নানা কথা উঠবে।' প্রস্তাবে তেসা রাজী হল বটে কিন্তু আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। বেঁচে থাকতে চায় সে, কিন্তু তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে যেন।

মনের এই ভাবটা একটু কাটল সম্ভ পারী প্রত্যাগত গ্রঁদেলের কথায়। বাইরে বারান্দায় তেসা দাঁড়িয়েছিল। গ্রঁদেল তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গভাবে পারীর খবরাখবর বলতে আরম্ভ করল: 'প্রথম দিকে ওখানে লোকজন ছিল না বললেই চলে। কিন্তু একে একে সবাই ফিরে আসছে। দু-একদিনের মধ্যে অপেরাগুলো শুরু হয়ে যাবে। মোটামুটি বলা চলে, জার্মানরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। আর ওদের ব্যবহারও খুব ভাল। ওরা যে বিজয়ীর জাত তা বোঝাই যায় না। মনে হয় যেন অভিভাবক...'

আশে পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ডেপুটি নিঃশব্দে গ্রঁদেলের কথা শুনছিল। একজন সেনেটর বলে উঠল, 'অঃ!' শব্দটা হর্ষসূচক না অসন্তোষসূচক তা একেবারেই বোঝা গেল না।

তেসার হাতে সজোরে একটা নাড়া দিয়ে বের্জেরি বলল, 'এখানে এসে তুমি যে আবার কর্তব্যভার তুলে নিয়েছ তা খুবই সুখের কথা। ফ্রান্সের এই বিপদের দিনে আশা করি তুমি স্থান ত্যাগ করবে না।'

উত্তরে তেসা তার পাখীর মত মাথাটা অল্প একটু কাত করল। খাড়া নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। বের্জেরির মন্তব্য অভিভূত করেছে তাকে। দেখা যাচ্ছে যে কয়েকজন লোক খুব ভাল করেই তার গুরু দায়িত্বের কথা বোঝে।

একটা লজ্জাকর সন্ধি-শর্তে স্বাক্ষর করে এসে অতীতের কবর রচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারাটা কি খুবই সহজ ব্যাপার?

সে বলল, 'আমি ফ্রান্সের সেবক। হ্যাঁ, ভাল কথা, এখানে ব্লুম আর ফ্লুজে দুজনেই হাজির। ভোটাভুটির সময় ওরা কি করে দেখতে হবে। বিশেষ করে ফ্লুজে। পড়ে পড়ে মার খেতে পারাটা তো আর সহজ ব্যাপার নয়, কি বল হে! দেখ না কী কাণ্ডটা হয়। 'বিরুদ্ধে' ভোট দিতে সাহস হবে না ওর। দুফান এখানে নেই, বড় আফসোসের কথা। থাকলে দেখা যেত যুদ্ধ লাগাবার জন্যে কত উস্‌কানিও দিতে পারে।'

'কোথায় আছে ও?'

'খুব সম্ভব ফৌজে।'

গ্রঁদেল যোগ করল, 'আর খুব সম্ভব ও-ই সবার আগে হাল ছেড়ে বসে আছে। ওই সব 'শেষ রাতের মারদেনেওলা ওস্তাদদের' আমি খুব ভাল করেই জানি।'

'কিন্তু ভীইয়ার কোথায়?'

'কেউ জানে না। আমরা তুর ছেড়ে আসবার পর ওর আর কোন খোঁজ নেই।'

'আমি শুনেছি ও স্পেন হয়ে লিসবনের দিকে পালিয়েছে।'

'বল কি? স্প্যানিয়ার্ডরা ওকে ওদেশের মাটি মাড়াতে দেবে ভেবেছ?'

'ভারী মজা হবে কিন্তু—ভীইয়ার গেছে ফ্রাঙ্কোর কাছে ভিসা চাইবার জন্যে!'

'শোনা যাচ্ছে যে স্প্যানিয়ার্ডরা নাকি সীমান্তে মেশিনগান খাড়া করে রেখেছে। সীমান্ত পার হয়ে ওদিকে গেলেই বন্দীশিবিরে যেতে হবে।'

তেসা হাসল। আসলে ইতিহাস কি, ভাবল সে। অনেকটা চারজোড়া মেয়ে-পুরুষের চতুষ্কোণী নাচের মত—একবার সামনে, একবার পেছনে, আর মাঝে মাঝে সঙ্গীবদল......স্প্যানিয়ার্ডরা হয়ত ভীইয়ারকে ধরে গারদে পুরেছে; নাকের ডগায় প্যাঁশনে ঝোলা অবস্থায় ভীইয়ারের ক্রুদ্ধ চেহারাটা বেশ কল্পনা করা যায়। আর ওর ছবিগুলোর কি হল? ছবিগুলো কি সত্যিই ও আভিঞঁতে ফেলে গিয়েছে?

তেসা বলল, 'দুঃখের ভেতরেও কিছুটা ব্যঙ্গ থাকে। ভীইয়ারের কথা ভেবে আমার মজা লাগছে। কি রকম ভয় পেয়েছে ভাবো যে ছবির সংগ্রহকে পর্যন্ত ফেলে যেতে হয়েছে! ওর মুখের ভাব কল্পনা করতে পার?'

তেসার পেছন থেকে আহত গলায় কে যেন বলল, 'কল্পনা করতে না পার তো, চোখে দেখে নিলেই পার। পল, তোমার ঠাট্টাটা মাঠেই মারা গেল।'

তেসা আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাল, 'আরে ওগুস্ত, তুমি? কোত্থেকে এলে?'
'আভিঞোঁ থেকে। আমাকে দেখে এত অবাক হবার কি আছে? চিরদিনের মত আজও আমি স্বস্থানেই আছি।'
তারপর ভীইয়ার ব্যাখ্যা করতে শুরু করল যে সে নতুন ব্যবস্থার একজন উৎসাহী সমর্থক। বলল 'পরাজয়ের ভেতর দিয়ে আমরা ব্যাধিমুক্ত হব। বিজয়ীদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে। হিটলার পারীতে আসতে পারল কি করে? কারণ তার সাহস ছিল। মার্শাল পেতাঁ এই হিসেবে পথ-প্রদর্শক। বয়স আশি হলে কি হবে কিন্তু এখনো তিনি দুঃসাহসী। আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করি।'
ভীইয়ারের কথা শুনে গ্রঁদেল পর্যন্ত বিব্রত বোধ করল। তেসা ভাবল, 'ধাড়ী শেয়াল! বুদ্ধিতে এখনো সবাই ওর কাছে হার মানবে।'
অবশেষে সভাপতির ঘণ্টা বেজে উঠল। বক্তাদের কথায় কান দিল না তেসা। লাভাল তো এখন বলবেই। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে কেন ও চুপ করে ছিল? ভীইয়ারের প্রশংসায় হল ফেটে পড়ছে। ব্লুমের চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন। ব্লুম যে 'বিরুদ্ধে' ভোট দেবে কোন সন্দেহ নেই—যাই করুক ওর দিন শেষ হয়ে গেছে।
বিরতির সময় ডেপুটিরা গ্রঁদেলকে ঘিরে দাঁড়াল। সবাই ওকে খোশামোদ করছে, আর মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে উদাসীন গলায় ও বলছে, 'আচ্ছা বেশ, বেশ, এ সম্পর্কে আমি আবেৎস-এর সঙ্গে কথা বলব।' লুসিয়ঁ যে দলিলটা চুরি করেছিল সেটার কথা মনে পড়ল তেসার। তুচ্ছ একটা গুপ্তচর আজ ফ্রান্সের ত্রাতা—এ কথা কল্পনা করাও অসহ্য।
বিরতির পরে ব্রতৈল বক্তৃতা দিল। বক্তৃতায় সে বলল যে দেশের এই দুরবস্থা পাপের শাস্তি ছাড়া কিছু নয়, এক 'মহান প্রায়শ্চিত্তের' ভেতর দিয়ে দেশকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর বৃটিশকে গালাগালি দিল কিছুক্ষণ এবং অবশেষে দু বাহু প্রসারিত করে উদাত্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের দেশকে যাঁরা জয় করেছে, তাঁরা যে কত মহৎ তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।' তেসা হাই তুলল—কত বড় ভণ্ড লোকটা! ওর নিজের দেশ লোরেনই তো জার্মানদের কবলে। কী ধড়ীবাজ! কিন্তু এদিকে আলাপ-আলোচনায় একেবারে নীরেট!
হঠাৎ সবাই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। মঞ্চের ওপর ব্লুজে উঠেছে। উঠে

দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হুংকার দিয়ে বলতে শুরু করল, 'দেশের যারা শত্রু, আর যারা নীচমনা, তারা যখন হাত তোলে......' তাকে আর বলতে দেওয়া হল না। তারপর শুরু হল ভোটাভুটি। আধ ঘণ্টা পরে সভাপতির ঘোষণা শোনা গেল, 'পক্ষে—৫৬৯, বিপক্ষে—৮০।'

তেসা এমন ক্লান্ত বোধ করল যেন সে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে উঠেছে। বাগানে মহিলারা চিৎকার করছে, 'লাভাল দীর্ঘজীবী হোক!' এই চিৎকার শুনেও তেসার মনে এতটুকু ঈর্ষা এল না। মাথা ধরেছে তার। ক্লান্ত পায়ে সে হোটেলে ফিরে গেল।

কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন। হোটেলের বসবার ঘরে একটি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে নজরে পড়ল। উন্নত বুক, সিঁদুরের মত টকটুকে ঠোঁট, মেয়েটিকে দেখে পলেতের কথা মনে পড়ল তেসার। উৎফুল্ল হয়ে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। এতক্ষণে তার নজরে পড়ল যে মেয়েটির চোখে জল।

মেয়েদের কান্না চিরকালই তেসার কাছে তাদের বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে। উত্তেজিত হয়ে সে বলতে শুরু করল ফ্রান্সের নানা দুর্ভাগ্যের কথা। অপরিচিতা সুন্দরী মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দিল। কথার শেষে অত্যন্ত বিনীতভাবে তেসা যোগ করল, 'মন্ত্রী হিসেবে আমি...' মেয়েটি হাসল তারপর নিজের নানা দুর্ভাগ্যের কথা বলতে শুরু করল। নেভের-এ সে একটা ট্রাঙ্ক হারিয়েছে। তার মা পড়ে আছে পারীতে। এখানে তার কাকার আসবার কথা। তিনি শ্রম-দপ্তরে কাজ করেন এবং দেখে শুনে মনে হয় যে তিনি ক্লেরমঁ-ফের‍্যাতেই থেকে গেছেন। এখন সে নিজে যে কি করবে জানে না। তার ব্যাগে মাত্র একশো ফ্রাঁর একটা নোট ছাড়া কিছু নেই।

তেসা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিল এবং সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেও খানিকটা সান্ত্বনা পেল যেন। দুজনে নৈশভোজন করল একসঙ্গে। ফূর্তি ও আমোদের ভাবটা ফিরে এল তেসার। 'চিরঞ্জীব ফ্রান্স' ও 'চিরঞ্জীব প্রেমের' উদ্দেশ্যে পান করল দুজনে।

রাত্রিবেলা হালকা সুরে তেসা বলল, 'শ্রীমতী, আমার বয়স কত আন্দাজ করতে পার?

'পঞ্চাশ?'

তেসা হাসল তারপর মেয়েটির মুখের সামনে হাতের আঙুল নাচাতে

নাচাতে বলল, 'উঁহু! প্রেমের ব্যাপারে আমার বয়স আঠারো। কিন্তু সাধারণের কাছে অনেক বেশী। অবশ্য মার্শাল আমার বাবার বয়সী।'

হঠাৎ এই ঐতিহাসিক দিনের ঘটনাগুলো নতুন করে মনে পড়ল তেসার: ব্রতৈলের রূঢ় দৃষ্টি, ভীইয়ারের শঠতা, ফ্লজের দাড়ি, আর সেই বিরক্তিকর সংখ্যা ৮০। মাত্র আশিজন অপাপবিদ্ধ! ভবিষ্যতের স্মৃতিকথায় এই আশিজনের সম্পর্কে নিশ্চয়ই এই কথা লিখিত হবে যে এরা 'আত্মসমর্পণের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ভবিষ্যৎ বংশধররা এই ক্লান্তিকর দিনটিকে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের দিন বলে মনে করবে। আর এই বছরটাই তো সে হার্টের অসুখে ভুগল। কাদা-খোঁচা পাখীর মাংসটা তার খাওয়া উচিত হয়নি। মাংসটা খাবার পর থেকেই তার শরীরটা খারাপ লাগছে, মাথা ধরেছে। কিংবা হয়ত এটা শ্যাম্পেন খাবার ফল। চেয়ার থেকে একটু উঠে সে মেয়েটির ঘুম-জড়ানো চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। মনে হল গলার ভেতর কি যেন একটা আটকেছে।

'আজ কাসিনো হলে কি কাণ্ড ঘটল জান?' বিড়বিড় করে বলল তেসা।

'কুলির মুখে শুনলাম। কি যেন একটা জরুরী অধিবেশন ছিল।'

'আসলে কি হয়েছে জান? হারিকিরি। বুঝতে পারছ না বোধ হয়। আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি। ডেপুটিরা আর সেনেটররা তো এল দল বেঁধে। বক্তৃতা হল লাভালের। লাভাল তো সব সময়েই শাদা টাই পরে। তারপর ...হ্যাঁ, তারপর আমরা আত্মহত্যা করলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না, না? আমি শপথ করে বলছি। প্রথমে আমরা ঘোষণা করলাম যে আমরা মরে গেছি তারপর প্রচণ্ডভাবে হাততালি দিলাম। ৫৬৯টা মড়া আর ৮০জন বেয়াড়া প্রকৃতির লোক ছিল সেখানে। ব্যস, এখন তোমার সামনে যে বসে আছে সে তেসার ভূত, তার ছায়া মাত্র।' একটা হেঁচকি তুলে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে সে আবার বলল, 'এতটা শ্যাম্পেন খাওয়া আমার উচিত হয়নি, কিন্তু এখন আর কিছু আসে যায় না। মৃত্যুর পরোয়ানা অনেক আগেই এসে গেছে।'

মেয়েটির ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু জোর করে ঘুম চেপে বলল, 'দুঃখ করে লাভ কি? জার্মানরা যখন পারী ছেড়ে চলে যাবে, আমরা আবার আগের মত দিন কাটাব। আপনি নিজেই বললেন যে মনের দিক থেকে আপনি তরুণ...' একটা হাই চেপে ফিসফিস করে বলল, 'আপনি—আপনি একজন খাঁটি প্রেমিক।'

মাথা নেড়ে ভেসা বলল, 'না। ও সব অতীতের কথা। আজকে স্পষ্ট করে সত্যি কথা বলবার দিন এসেছে। শোন, নিজের সম্পর্কে একটা কথা বলছি। আমি একটা ছারপোকা। ফাটলের ভেতরে বুড়ো বনেদী ছারপোকা।'

কথাটা বলে সে টলতে টলতে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

ভীষণ একটা উত্তেজনা নিয়ে ফুজে কাসিনো হল ছেড়ে বেরিয়ে এল। হাত পা নেড়ে অনবরত সে বিড়বিড় করছিল, যেন কয়েকজন অদৃশ্য শ্রোতার উদ্দেশ্যে কথা বলছে। একদল কাপুরুষের হাতে রিপাব্লিকের মৃত্যু হল। কিসের জন্যে ভাল্মির বীরেরা আত্মদান করেছিল? কিসের জন্য বীরের মত সংগ্রাম করেছিল ভের্দ্যুর সৈন্যরা। এ লজ্জা ঢাকবে কিসে বন্ধুগণ! ফ্রান্সকে হিটলারের পদলেহন করতে দেখে সমস্ত পৃথিবী যে ঘৃণায় মুখ ফেরাবে। অবশ্য ফুজে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু ওরা তাকে সত্যপ্রকাশ করতে দেয়নি। এখন সে ফিরে চলেছে নিজের হোটেলে। তারপর ওয়েটার স্যুপ নিয়ে আসবে, স্যুপটা খেয়ে শুতে যাবে সে। কিন্তু আজকে যা ঘটে গেল, তারপরে এই নিশ্চিন্ত জীবন একেবারেই অসহ্য। শহীদ হতে হবে তাকে। বোমা ফাটুক, গিলোটিন নেমে আসুক। লোকগুলোর কাণ্ড দেখ না! কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে কাফের বারান্দায় বসে ভারমুথ টানছে!

সারা রাত্রি সে ঘরের ভেতর অস্থির হয়ে পায়চারি করে বেড়াল। মারি-লুই বা ছেলের চিন্তা এখন আর নেই। সমস্ত শরীর রি রি করে উঠছে। কবলেনৎস-এ সে ছিল। হ্যাঁ, ভিশি হচ্ছে দ্বিতীয় কবলেনৎস। ১৭৯২ সালে এই কবলেনৎস-এ বহিরাগত প্রতি-বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। কে ছিল সেই বিশ্বাসঘাতকদের নেতা? সেই লোকটি যদি লাভাল হয় তো কেউ আশ্চর্য হবে কি? সবাই জানে লাভাল এমন একটা জীব যে শয়তানের কাছেও আত্মবিক্রয় করিতে পারে। ভেসা থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পয়সার জন্যে ও লোকটা সব কিছু করতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকদের দলে রয়েছেন রিপাব্লিকের একজন বীর সৈনিক, বৃদ্ধ মার্শাল। চিরকালের জন্যে সৈনিকদের নাম কলঙ্কিত হয়ে রইল। বৃদ্ধদের পক্ককেশের প্রতি আর কারো শ্রদ্ধা রইল না। কাকে বিশ্বাস করা যায়? সমস্ত কিছু কলঙ্কিত, অপব্যয়িত, নিঃশেষিত—কাফের বারান্দায়—আত্মসম্মান ও সাধারণ সৌজন্যবোধ দুটোর কোনটাই আর অবশিষ্ট নেই।

আগামী কাল হয়ত চিৎকার শোনা যাবে, 'ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা মহানহৃদয় বশ্‌রা

দীর্ঘজীবী হোক!' প্রাশিয়ানদের সামনে নতজানু হয়ে তোষামোদ করবে সবাই! গোয়েরিংকে যোয়ান অফ আর্ক আখ্যা পর্যন্ত দেওয়া হতে পারে। ব্যাপারটা হাস্যকর নয়—রীতিমত বিরক্তিকর।

কার উদ্দেশ্যে ফুজে কথা বলছে? দেওয়ালের প্রজাপতি? আয়নায় নিজের অস্পষ্ট ছায়া? ম্লান প্রত্যুষ?

নটার সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। একদল পুলিশ, পরনে আলপাকার কোট। একজন বলল, 'কোন একটা অনুসন্ধানকার্যের জন্যে আপনাকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা নিয়ে আমরা এসেছি।'

হাসতে হাসতে ফুজে বলল, 'বেশ, চলুন। কিন্তু জার্মান ভাষায় কথা বলছেন না যে? জার্মান ভাষাটা শিখে ফেলুন না! কত আর অনুবাদ হবে! মূল ভাষাই আমি পছন্দ করি, যাক্‌গে, লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। আপনারা তো আর ভের্দ্যঁর বীর নন।' তারপর দাড়ি আঁচড়িয়ে টুপি পরে সে আবার বলল, 'আমি প্রস্তুত। রিপাব্‌লিক জিন্দাবাদ!'

সিঁড়িতে তেসার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দাড়ি কামিয়ে প্রাতরাশ শেষ করে তেসা চলেছে উকিলদের একটা বৈঠকে। ফুজেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল তেসা। কেমন কঠিন আর থমথমে হয়ে উঠল মুখটা—যেন সে মৃতের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফুজে অভিশাপ দিল, 'জাহান্নমে যাও তোমরা!'

৩৯

পারীতে থাকতে জেনারেল লেরিদো বলেছিল, '"যে যুদ্ধে জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, সে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। এমন কি সেটা আমার মতে মূর্খতার পরিচয়।'

ব্রতেলের ইচ্ছা ছিল, যে প্রতিনিধি-দল সন্ধি-শর্তে স্বাক্ষর করবে তার মধ্যে লেরিদোও থাকুক। কিন্তু লেরিদো যকৃতের অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। এবং এই অসুখকে সৌভাগ্য বলেই মনে করল সে। ইতিহাসের পাতায় এই শোচনীয় দলিলে স্বাক্ষর রাখবার ইচ্ছা তার ছিল না।

সরকারী পুনর্গঠনের সময় যুদ্ধাস্ত্র-মন্ত্রী নিযুক্ত হল লেরিদো। লা বুরবুলের কাছে একটা পাহাড়ে জায়গায় যুদ্ধাস্ত্র-মন্ত্রীর দপ্তর। লা বুরবুল হাঁপানী

রোগের চিকিৎসার জন্যে বিখ্যাত; শুনে সে রীতিমত দুঃখিত হল। তার আশা ছিল ভিশিতে যাবে এবং সেখানে যকৃতের চিকিৎসা করাতে পারবে। তবুও সে প্রতিদিন চিকিৎসালয়ে যাতায়াত করতে লাগল। বলল, 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন পুনর্গঠনের সময়। চিকিৎসা যে অসুখেরই হোক না কেন, তাতে কোন ক্ষতি হবে না।'

বৌকে আনিয়ে নিল নিজের কাছে, বাদামী ড্রেসিং-গাউন পরা বৌকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে। দুজনে থাকল একটা হোটেলে। বৌ আসবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশ্রী ঘরটায় একটা গৃহস্থালীর শ্রী ফিরে এল যেন; উপকরণ বিশেষ কিছু নয়—বুনবার সাজসরঞ্জাম, ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি এবং জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা সম্পর্কে কথাবার্তা। কোন দুঃখ রইল না লেরিদোর। তবু একটিমাত্র দুশ্চিন্তা তার ছিল—সেটা হচ্ছে নিজের কাজের দায়িত্ব। সন্ধির শর্তানুযায়ী, সমস্ত যুদ্ধ-উপকরণ জার্মানদের হস্তান্তর করতে হবে। সে বলত, 'আমি মনে করতাম যে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করাটাই খুব একটা শক্ত কাজ। কিন্তু এখন কি দেখছি জান সোফি, নিরস্ত্রীকরণটা তার চেয়েও শক্ত কাজ।'

সে মনে করত যত বেশী সম্ভব যুদ্ধ-উপকরণ জার্মানদের কাছ থেকে গোপন রাখা তার দায়িত্ব। কর্নেল মোরো ছিল তার সহকারী, তাকে সে বলত, '১৯৬০ সালের জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। হ্যাঁ কোন সন্দেহ নেই! গতবার পরাজয়ের পর জার্মানরা একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হতে শুরু করেছিল। প্রকৃতির নিয়মই এই।' কিন্তু মোরো প্রশ্রয়ের হাসি হাসত: 'কোন চিন্তা নেই। চাঁদ কখনো সূর্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না।'

সকালবেলা চিকিৎসালয় থেকে ফিরে এসে লেরিদো কফি পান করছিল, এমন সময় দরজায় কে যেন করাঘাত করল। বোধ হয় তার সহকারী কিংবা আর্দালী মনে করে জেনারেল বলল, 'ভেতরে এস!' ভেতরে ঢুকল বাইস।

কোলমার থেকে নির্বাচিত ভূতপূর্ব র‍্যাডিকালটি এখন লাভালের প্রাণের বন্ধু এবং যুক্ত ফরাসী-জার্মান কমিশনের একজন সভ্য।

চিকিৎসালয় থেকে ফিরে এসে জেনারেল তখনো ড্রেসিং গাউন ছাড়েনি। সেই বেশে তাকে মনে হচ্ছিল যেন কার্নিভালের পুতুল। হাসি চাপতে পারল না বাইস। লেরিদো কেমন বিব্রত বোধ করল: সেনাপতির উচিত আপন মর্যাদার উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

সে বলল, 'আমাদের তাঁবু ফেলা হচ্ছে; আমার সহকারীটি অনভিজ্ঞ।'

'এত ভোরে এসেছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে।'

মিনিট পনের পরে যখন জেনারেল লেরিদো আবার বাইসের কাছে এল, তখন তার পরিপূর্ণ সাজপোষাক, বুকের ওপর ছটা সম্মানপদক।

বাইস সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা জেনারেল, মঁপেলিএ-তে বিয়াল্লিশটা মাঝারি ট্যাঙ্ক ছিল না কি? কিন্তু মাত্র ষোলটি হস্তান্তর করা হয়েছে।'

লেরিদো মাথা নাড়ল, তারপর সরলভাবে উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই। জার্মানরা ষোলটার কথাই বলেছিল।'

'কিন্তু আমাদের শর্তটা কি?'

'মঁশিয় বাইস, আমি মনে করি যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি আমাদের কর্তব্য...'

বাধা দিয়ে বাইস বলল, 'এই ঘটনার সঙ্গে অত সব বড় বড় কথার সম্পর্ক কি? ষোল মানে ষোল। বিয়াল্লিশ মানে বিয়াল্লিশ। ছাব্বিশটা ট্যাঙ্ক লুকিয়ে রাখবার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে?'

এবার লেরিদোও গলা চড়াল, 'কি বলতে চান আপনি? আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আমি স্কুলের ছেলে। আমি একজন ফরাসী সৈনিক, মশিয়ঁ!'

কথাটা বলে সে টান হয়ে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো মানুষটি, তবুও তার মনে হল যেন বাইসকে সে অবজ্ঞা করতে পেরেছে।'

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বাইস বলল, 'আপনি মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন, জেনারেল। আপনি এখানে যুদ্ধ করতে আসেননি। এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি আপনার ওপরওলাকে বলব যেন আপনাকে একটু পাটিগণিত শিক্ষা দেওয়া হয়।'

কথাটা বলে বাইস ঘর ছেড়ে চলে গেল। ধাক্কাটা সামলে উঠতে অনেকক্ষণ সময় লাগল লেরিদোর।

সোফির কাছে সে বলল, 'যারা আমাদের শত্রু ছিল, তাদের হাতে কেন যে ছাব্বিশটা ট্যাঙ্ক তুলে দিতে হবে আমি বুঝি না। লাভালের বন্ধু, ব্রভেলের বিশ্বস্ত একজন ফরাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এমনভাবে সে

আমার সঙ্গে কথা বলল যেন সে একজন জার্মান অফিসার। এমন অদ্ভুত কাণ্ড আর দেখিনি।'

পরের দিন লেরিদো গেল জেনারেল পিকারের সঙ্গে দেখা করতে। সামরিক ব্যাপারে বাইসের মত রাজনীতিকদের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সে একটা রিপোর্ট তৈরী করেছিল। এই হস্তক্ষেপের অর্থ মার্শালের নির্দেশ অমান্য করা।

কোন রকম উৎসাহ না দেখিয়া পিকার্ বলল, 'মনে হচ্ছে দ্য গলের প্রলাপ আপনাকে প্রভাবান্বিত করেছে। আপনি মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। জার্মানরা যে লণ্ডনে পৌছবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুব দেরী হয় তো আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। আপনার বয়সটা কম নয়, অভিজ্ঞতাও হয়েছে অনেক। আপনার অতীত সৈন্যজীবন একটা বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করেছে। বিশ্বাসঘাতক-দের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক আপনি রাখতে পারেন না।'

লেরিদো বিব্রত বোধ করল। একবার সে মুখ ফুটে বলতেও পারল না যে এই অভিযোগ তার প্রাপ্য নয় বলেই সে মনে করে।

পিকার্ বুঝতে পারল যে একটু রূঢ় উক্তি হয়ে গেছে। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দুজনের। লা বুরবুল্-এ ফিরে এসে গণ্ডগোল দূর করবার কাজে মন দিল লেরিদো। সমানে ধমকাতে লাগল সাঙ্গপাঙ্গদের: 'ওই মেশিনগানগুলোর জন্যে তুমিই দায়ী মেজর! মনে কোরো না ওদের যা বলবে তাই বুঝবে। আমাদের পূর্বতন শত্রুদের দেখিয়ে দিতে হবে যে তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারে পর্যন্ত আমরা চুক্তি রক্ষা করে চলি। ক্যাপ্টেন, দেখো যেন একটা বোতামের হিসেবেও ভুলচুক না হয়! বুঝলে তো?'

রাত্রিবেলা খাবার পরে মোরোর সঙ্গে খানিকটা রাজনীতি আলোচনা হল। সে বলল, 'ওই অপরিণামদর্শী দ্য গলটা ভুল ঘোড়ার ওপর বাজী ধরেছে। আমি এটা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। উপকূলের কাছে জার্মানরা বিরাট ফৌজ জড়ো করেছে। চ্যানেল পার হবে কি করে বলছ? ওসব বাজে কথা রাখ! সমুদ্র পার হয়ে কি ভাবে ফৌজ নামাতে হয় সে সম্পর্কে সমস্ত ধারণা ওরা নার্ভিক-এ পালটে দিয়েছে। এক মাসের মধ্যে হিটলার লণ্ডনে হাজির হবে। এ তো অ-আ-ক-খর মত সোজা! আমার মনে হয় লাভালের পথই ঠিক। অবশ্য আমরা সৈন্যবাহিনীর লোক, রাজনীতিতে অনধিকার চর্চা করা আমাদের উচিত নয়। কিন্তু এখন তো আর এটা পার্লামেণ্টারি তর্কবিতর্ক নয়, ফ্রান্সের ভাগ্য এর সঙ্গে জড়িত। তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলছি,—জার্মানদের জয়

হলে আমাদেরই সুবিধা। ইতালীর সঙ্গে সমপর্যায়ে আমরাও নতুন ইউরোপে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারব। ইংলণ্ডকে শেষ করবার পর হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। অবশ্য রাশিয়ার লালফৌজ আছে। কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। ওই দেশটাই বড়, বুঝলে বন্ধু, প্রকাণ্ড দেশটা। আমার স্থির বিশ্বাস, এই কাজে আমাদের সাহায্য না নিয়ে হিটলারের উপায় নেই, তখন আমরা কিছু কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে পারব। জেনারেল পিকার্ মনে করে হিটলার যদি কিয়েভ অধিকার করতে পারে তবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা লিল ফিরে পাব। আচ্ছা ধরা যাক ইংলণ্ড এই যুদ্ধে জিতবে। তা যদি হয় তো ফল ভীষণ খারাপ। আমরা জার্মানীর সঙ্গে পৃথক সন্ধি করেছি এই অপরাধে চার্চিল কক্ষনো আমাদের ক্ষমা করবে না। আর গ্য গলের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ তারা তো সব অখ্যাত চুনোপুটি। ও যদি কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে যায় তবুও আমি আশ্চর্য হব না। আরে এসব লোক সব পারে! ব্যক্তিগতভাবে আমি জার্মানদের পছন্দ করি। ওরা আমাদের শত্রু ছিল বটে কিন্তু মানুষ হিসাবে ওরা খাঁটি। পেরুর্ত বা ভূতপূর্ব ডেপুটিদের মনে সন্দেহ আসতে পারে, কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি। জার্মানদের সত্যিই আমাদের সাহায্য করতে হবে, আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, মনেপ্রাণে। তুমি কি মনে কর কর্নেল?'

অলস ভঙ্গীতে মোরো উত্তর দিল, 'আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে চাঁদের আলোটা নিজস্ব নয়, ধার করা। যা প্রত্যক্ষ তার বিরুদ্ধে যাওয়া সহজ নয়। এ কথা ঠিক যে ওরা যদি জার্মানদের পরাজিত করতে পারে, তবে আমাদের প্রতি ওদের ব্যবহারটা খুব সদয় হবে না। এ কথাও আমি মনে করি যে গাছের ডালে ঝোলার চেয়ে লা বুরবুল্-এ থাকা ভাল।'

কয়েকদিন পরে জেনারেল লেরিদো একটা পিকনিকের আয়োজন করল। সোফি আর কর্নেলকে সঙ্গে নিয়ে সে গেল একটা পার্বত্য হ্রদে। গাঁ পর্যন্ত তারা গাড়ীতে গেল, তারপর একটা ছোট্ট পথ ধরে হেঁটে গেল হ্রদ পর্যন্ত। চারপাশের দৃশ্য দেখে কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল লেরিদো। ধূসর পাথরের স্তূপগুলো বিশৃঙ্খল— মনে হয় যেন কাজটা কারও ইচ্ছাকৃত। কোথাও ফুল নেই বা গাছ নেই— রুক্ষ, কর্কশ প্রান্তর। শুধু এখানে ওখানে পাথরে ফাঁকে ফাঁকে কাঁটাগাছের মত খানিকটা জঙ্গল—চারপাশের অন্য সব কিছুর মত ধূসর। হ্রদের জলটার রংও ধূসর। আত্মসমর্পণের পর পৃথিবীর চেহারাটা বোধ হয় এই রকমই হয়েছিল।

হঠাৎ কেন জানি তার মনে পড়ল আরদেনের সবুজ জঙ্গল আর একটি খোঁড়া মেয়ের কথা...

সঙ্গে ঠাণ্ডা খাবার ছিল। জেনারেলের বৌকে মোরো এক বাক্স বাদামের বরফি উপহার দিয়ে বলল, 'এটা এখানকার নামজাদা খাবার।' তীক্ষ্ণবুদ্ধি সোফি একবার ঢোঁক গিলে মনে মনে ভাবল, লোকটা নিশ্চয়ই পাগল, নইলে এই দুর্দিনে মিষ্টি কিনে আশি ফ্রাঁ খরচ করে!

সূর্য উঠবার পর হ্রদের জল গোলাপী হয়ে গেল। মনে মনে একটা প্রশান্তি ও পরিপূর্ণতা অনুভব করল লেরিদো, বলল, 'এই প্রকৃতি, একমাত্র প্রকৃতির মধ্যেই মানুষের আবেগের খাঁটি ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া যায়।'

'মিঞঁ' থেকে একটা গান গাইতে লাগল সোফি। সোফির দিকে কোমল ও বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোরো ভাবল, 'পোষা পাখীটি আমার, আমার কাছেই তুমি ধরা দেবে।' লেরিদো ঢুলছিল—বাতাসে এমন একটা তীব্র অনুভূতি যে উৎফুল্ল ভাবও আসে, দুর্বলও বোধ হয়।

এ্যাড্‌জুটেন্টের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত লেরিদোর বিহ্বল ভাবটা কাটল না। সম্পূর্ণভাবে সজাগ হবার পর সে হুংকার দিয়ে উঠল, 'এখানে আসবার অনুমতি তোমাকে কে দিল? আজ রবিবার। আর এটা তো আর যুদ্ধক্ষেত্র নয়!'

'ভীষণ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, জেনারেল।'

যে দুর্ঘটনার জন্যে জেনারেলের রবিবারের আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল, তার মূলে ছিল ২৮৭তম রেজিমেণ্টের একজন কর্পোরাল, 'সীন' কারখানার ভূতপূর্ব শ্রমিক, নাম লেগ্রে।

মে মাস পর্যন্ত লেগ্রেকে ব্রিয়াশঁর কাছে একটা বন্দীশালায় আটক রাখা হয়েছিল। সেখানে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তাকে পাথরের চাঁই টেনে তুলতে হত পাহাড়ের ওপর। পাথরগুলোকে কেন যে টেনে তুলতে হচ্ছে কেউ জানত না। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা নির্জন রাস্তার ধারে পাথরগুলো পড়েছিল। লেগ্রে অসহিষ্ণু হয়নি বা রক্ষী-সৈন্যদের সঙ্গে ঝগড়াও করেনি। তার মনের ভেতরে কি যেন একটা ভেঙে পড়েছিল। কথাবার্তা সে বড় একটা বলত না—শূন্য ও ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি।

মে মাসে অপ্রত্যাশিতভাবে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। বন্দীদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তৃতায় কর্নেল বারবার বলল, 'ফ্রান্স পীড়িত।' মুক্ত বন্দীদের পাঠানো হল ইতালীয়ান সীমান্তে। এমন কি লেগ্রে তার কর্পোরালের পদকও ফিরে পেল। ভাগ্যের এই পরিবর্তন লেগ্রের মনে এতটুকু উৎসাহ জাগাল না। কিন্তু যেদিন সে খবরের কাগজে পড়ল যে জার্মানরা বেলজিয়মে ঢুকেছে, সেদিন থেকে তার নির্লিপ্ততা একেবারে কেটে গেল, পুরনো সংগ্রামী ও আন্দোলনকারীর রূপ অনেকটা ফিরে এল যেন। এখন সে রাইফেল ধরতে লাগল সম্পূর্ণ অন্ত দৃষ্টি নিয়ে এবং উত্তর সীমান্তে তাকে পাঠানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ করতে লাগল বারবার।

একেবারে ফ্রন্টে যেতে চাইত সে, যদিও এই যুদ্ধে জয় হবে বলে বিশ্বাস তার ছিল না। সমস্ত শীতকালটা ধরে তার মনে শুধু একটিমাত্র চিন্তাই ছিল—ফ্রান্স হৃতদৃষ্টি, মোহাচ্ছন্ন, প্রতারিত, বিরাট এক দেশ থেকে মনাকোর মত ছোট্ট এক স্থানে পরিণত! এত বড় একটা অন্যায় অনুষ্ঠিত হতে দেখে তার সমস্ত আশাভরসা একেবারে নির্মূল হয়ে গেল, পুনরুত্থানের সম্ভাবনা আছে বলে বিশ্বাসটুকুও আর রইল না। তার এই ভয়কে বাস্তবে পরিণত হতে দেখবার জন্যে তাকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না। এক মাস পরেই ইতালীয়ানরা ফ্রান্স আক্রমণ করল। লেগ্রের বাহিনীকে রাখা হয়েছিল পেতি স্যাঁ-বের্নারের কাছে একটা জায়গায়। একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি প্রতিরোধ করল লেগ্রে।

চার দিন ধরে অনবরত গোলাবর্ষণ করে গেল ইতালীয়ানরা। কিন্তু প্রতিরোধকারীদের এতটুকু হটানো গেল না। চারদিন পরে নিশ্বাস ফেলবার মত একটু সময় পাওয়া যেতেই খাবার আনা হল কিন্তু খবরের কাগজ ছিল না। শাঁবেরী প্রত্যাগত একজন লেফটেনেন্ট বলল যে জার্মানরা পারী অধিকার করেছে। ফরাসী সরকার যে কোথায় কেউ জানে না।

সৈন্যদের ভেতর নানা রকম গুঞ্জন উঠল।

'ওসব সরকার-টরকার আর কিছু নেই।'

'বোধ হয় ফ্যাশিস্টরা ক্ষমতা লাভ করেছে—লাভাল, দোরিও, পুরো দলটাই।'

'তার মানে লাভালের জন্যে প্রাণ দিতে হবে? আমি এর মধ্যে নেই!'

লেগ্রে জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'ভয় পাচ্ছ বুঝি তোমরা? লাভালের জন্যে কেউ প্রাণ দিতে চায় না। কিন্তু কি করে জানলে যে

লাভালই এখন সরকারী কর্তা হয়ে বসেছে? লোকে বলছে? লোকে তো অনেক কথাই বলে। লাভাল তো আর যুদ্ধ করবে না। ও মুসোলিনির হাতের পুতুল। কার হাতে ক্ষমতা গেছে তা আমরা জানি না।' তারপর পশ্চিম দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'কিন্তু ওদিকে আমাদের সামনে যে কারা রয়েছে তা আমরা জানি। এতে ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তোমরা যা খুশি ভাবতে পার কিন্তু আমি কিছুতেই ওই ফ্যাশিস্টদের দেশের ভেতরে ঢুকতে দেব না।'

মুহূর্তের জন্যে তার শূন্য চোখ দুটো ক্ষোভে ও ক্রোধে জ্বলে উঠল।

সঙ্গীরা সমর্থন জানাল সবাই। পরদিন ইতালীয়ানরা আত্মসমর্পণ করতে বলল ফরাসীদের। ফরাসীরা রাজী হল না। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা আরও পাঁচ দিন প্রতিরোধ করল।

'সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছে'—কথাগুলো প্রথম শুনে লেগ্রের মনে হল যেন সে স্বপ্ন দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা কটূক্তি বেরিয়ে এল মুখ থেকে—'এটা লাভালের কীর্তি!' বাইরে বেরোতেই চোখে পড়ল দুজন ইতালীয়ানের সঙ্গে একজন ফরাসী কর্নেল। কে যেন ক্রুদ্ধ মন্তব্য করল, 'ম্যাকারনি!' আর একবার নিরুৎসাহ ও গম্ভীর হয়ে গেল লেগ্রে।

যে সব বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হল না তার মধ্যে লেগ্রের বাহিনী একটি। ক্লেরমঁ-ফের‍্যাঁর কাছাকাছি একটা জায়গায় ওদের রাখা হল। শহরের কাছেই বিরাট এক অস্ত্রাগার, বারুদ ও যুদ্ধ উপকরণে ঠাসা। একদিন লেগ্রের কানে গেল লেফটেনেণ্ট ব্রেজিএকে মেজর বলছে—'আগামী বুধবার আমরা জার্মানদের সব কিছু হস্তান্তর করব।' জলের ভেতরে সূর্যের আলো ঢুকবার মত এই কথাগুলোও লেগ্রের চেতনায় অস্পষ্ট একটা ছাপ রেখে গেল।

সেদিন রাত্রিটা বেশ গরম। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ঠাণ্ডা পড়েনি। লেগ্রের ডিউটি পড়েছে। সে ভাবছিল জোসেতের কথা। একটিও চিঠি লেখেনি জোসেৎ। হয়ত লিখেছে কিন্তু পৌঁছয়নি। আর এখন তো ডাক বলতে কিছু নেই। ট্রেন অচল। তার নিজের জীবনের মত সব কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মিশো কোথায়? পার্টির অস্তিত্ব আছে কি? হয়ত আছে, হয়ত এই কাছাকাছি কোথাও—কোন প্রতিবেশীরই মনের মধ্যে। কিংবা হয়ত অনেক দূরে। তারা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে: নাৎসীরা এসেছে এবং ফ্রান্সে তাদের বহু বন্ধু,

সাহায্যকারী, পদলেহনকারীও জুটেছে। দু বছর আগে 'লুমানিতে' যে সব কথা লিখেছিল তা এমন পরিপূর্ণভাবে ফলে যাবে তা কল্পনাও করা যায়নি। কী ভীষণ দুঃখের মধ্যেই না টেনে আনা হয়েছে দেশকে! জার্মানরা সর্বগ্রাসী—যন্ত্রপাতি, চিনি, জুতো, যা পাচ্ছে চালান দিচ্ছে। আর যুদ্ধবন্দীদের একজনকেও এখনো ছাড়েনি। মিশো যদি ওদের হাতে বন্দী হয়ে থাকে? এবার বৃটিশদের পালা। তারপর রাশিয়ানদের। ইঁদুরের জাত ওরা, ক্ষুধার্ত ইঁদুর! কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না; কাজ, বীরত্ব, এমন কি সাধারণ মানবিক জীবনও ধ্বংস হবে—তাও কি সম্ভব?

এইভাবে দীর্ঘ দুশ্চিন্তার জাল বোনার মধ্যে দিয়ে রাত্রি শুরু হল। এই রকম রাত্রি লেগ্রের জীবনে এই প্রথম নয়। দিনের বেলা সে কথা বলতে চেষ্টা করেছে, শূন্য চোখের দৃষ্টি মেলে ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করেছে নানাজনকে। কেউ কিছু বলতে পারেনি। এই ঘটনার আঘাতে কারো আর কোন অস্তিত্ব নেই যেন। আপন আপন আত্মীয়স্বজনের সন্ধানে বা খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই। এই ট্রাজেডি নিয়ে চিন্তা করবার অবসর কারো নেই। এই ট্রাজেডিই তো তাদের জীবন।

কিন্তু ভোরের আলোয় যখন গাছপালার ওপর থেকে অন্ধকার সরে গেল, তখন লেগ্রের মনেও একটা সিদ্ধান্ত দানা পাকিয়েছে। নিজের অজানতেই সিদ্ধান্তটা তার মনে এসেছে। বিচারবিশ্লেষণ করে দেখবার অবসর আর হয়নি। এটা তার একটা প্রেরণা। গত কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির নিষ্ফল প্রতিরোধ, আশ্রয়প্রার্থীদের অভিযোগ, গৃহহীন পথাশ্রয়ী বুভুক্ষু সৈন্যদের গল্প, আর মেজরের কাপুরুষোচিত ও নির্লজ্জ উক্তি—'আগামী বুধবার আমরা হস্তান্তর করব'—এ সব কিছু তাকে এই একটিমাত্র পথই দেখিয়েছে। না! হস্তান্তর করতে দেওয়া চলবে না, জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না কিছুতেই!

সৈন্য তিনজনকে লেগ্রে পাঠিয়ে দিল শহরে। লেফটেনেণ্ট ব্রেজিএ নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে, আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। লেগ্রে একাই প্রাণ দিল। তার জীবনের মত তার মৃত্যুও হল সহজ, আড়ম্বরহীন ও আন্তরিক, সমগ্র অঞ্চল কেঁপে উঠল সেই বিস্ফোরণে, ডাল ছেড়ে উড়ে গেল পাখীগুলো। পাঁচ মাইল দূরের ইঁটের কারখানার জানলাগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল থর থর করে।

সমস্ত ঘটনা শুনে জেনারেল লেরিদো দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। ফ্রান্সের পরাজয়ের চেয়েও বড় দুর্ঘটনা বলে মনে হল এই বিস্ফোরণকে। তাকেই এর জন্যে দায়ী করা হবে। জার্মানরা কক্ষনো বিশ্বাস করবে না যে এটা কোন একজন দুর্বৃত্তের কাজ। আর পিকারও সমস্ত দোষ তার ঘাড়েই চাপাবে। হঠাৎ সেই অনাত্মীয় ধূসর হ্রদ ও স্তূপীকৃত পাথরের কথা মনে পড়ল লেরিদোর। সোফিকে বলল, 'সমস্ত কিছু উড়ে গেছে, বোমা ফেলা হয়েছে সব জায়গায়। প্রকৃতিও সে আঘাত থেকে রক্ষা পায়নি। মানুষের হৃদয়ও নয়।'

৪০

জোলিও পারীতেই থেকে গেছে। সেখান থেকেই 'লা ভোয়া নুভেল' আবার প্রকাশিত হচ্ছে, ভিশি থেকে যেমন সে ফ্রাঁ পাচ্ছে, তেমন জার্মানদের কাছ থেকে পাচ্ছে মার্ক। কিন্তু গোলগাল ছোটখাটো মানুষটির মুখে সব সময়েই অনুযোগ শোনা যায় যে, জার্মান দূতাবাসের সীবার্গ লোকটি নাকি অর্থপিশাচ ও জঘন্য। সে বলত, 'খট্টাশের সঙ্গে ওকে এক খাঁচায় আটকে রাখ, দেখবে দম আটকে খট্টাশ মারা যাবে।'

জেনারেল ফন শোমবের্গ জোলিওর প্রতি সহৃদয়। মার্সাইএর এই লোকটির খামখেয়ালী উচ্ছ্বাস ও চমক জেনারেলের ভাল লাগে। কিন্তু জোলিও মনমরা ও বিষণ্ণ, ঠাট্টাতামাসায় যোগ দেয় না, সামাজিকতার ধার ধারে না। আপিস থেকে বাড়ী ফিরে জামাজুতো না খুলেই বিছানার ওপর বসে নিঃশব্দে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। বৌ যদি জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে, সে শুধু মাথা নাড়ে—যেন সে বলতে চাইছে 'কিছু নয়।'

আগের দিন ব্রতৈল একটা প্রবন্ধ নিয়ে আপিসে এসেছিল। প্রবন্ধটা না পড়েই জোলিও লিখে দিল—'যাবে।' কিন্তু ব্রতৈল বলল, 'যা ব্যাপার দেখছি, মনে হয় আর কিছুদিন পরে আমাকে আবার গির্জায় যাতায়াত শুরু করতে হবে।' চাঞ্চল্যকর হেডলাইনের কথা জোলিও এখন আর ভাবে না। কি লাভ ভেবে? কেউ কাগজ পড়বে না। পারীর লোকেরা এই কাগজটা ঘৃণা করে। জার্মানদের নিজেদের কাগজ আছে। জার্মান থেকে অত্যন্ত কাঁচা অনুবাদ নানারকম প্রবন্ধ আসে মাঝে মাঝে। লেখাগুলোয় 'আমরা' কথাটার

জায়গায় 'জার্মানরা' কথাটা সে বসিয়ে দেয়ঃ 'লা ভোয়া নুভেল' যে ফরাসী কাগজ, অন্তত এ চরিত্রটুকু বজায় থাকুক। আর তাছাড়া জোলিও এজন্যে টাকা পায়। ব্রতৈল কি পায় না? হয়ত সেও পায়। কিন্তু ব্রতৈলকে চায় কারা? অতীতের কথা ভাবতেও কষ্ট হয়—৬ই ফেব্রুয়ারী, 'মন্ত্রশিষ্য,' চেম্বারের বক্তৃতা। সবই অতীতের ঘটনা। ফ্রান্সের অস্তিত্ব ছিল তখন। আর এখন খরগোসের মত লালচে-চোখ ওই জার্মান বড়কর্তা ফ্রাঙ্ককে দেখা যাবে 'লা ভোয়া নুভেল' আপিসে বসে থাকতে। সময়নিষ্ঠ আর নোংরা।

জোলিও তার বৌকে বলল, 'ব্রতৈল হাজির হয়েছে, একে একে আসুক সবাই! লাভাল আর তেসাকেও শিগ্‌গিরই দেখা যাবে।'

বৌ গজরাতে লাগল, 'তাতে আমাদের কি, আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব। আজ সারা বাজার ঘুরেছি, কোথাও এক টুকরো সাবান নেই। কোন কিছু পাওয়া যায় না, সব লুটে নিয়ে গেছে ওরা।'

'সে তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কোথায় যাই বল তো? মার্সাইএর অবস্থাও এই। এই হতভাগা ইঁদুরগুলো গোটা ইউরোপটাকে এক টুকরো মাখনের মত গিলে নিয়েছে। ব্রতৈলের কাছে শুনলাম, দেসের গুলি করে আত্মহত্যা করেছে অভেরঞ্-র কাছাকাছি কোন এক জায়গায়। এই হচ্ছে বীরের মত কাজ—মার্ন বা ভের্দ্যা যখন নেই! কী অদ্ভুত! আমার কি মনে হচ্ছিল জান? ওরা যদি—' জানলাটা বন্ধ করে গলা নামিয়ে সে বলল, 'যদি ওরা হেরে যায় তাহলে কি হয় বল দেখি? সেটা যে কী ভীষণ একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার তা তুমি কল্পনাও করতে পার না! এক সন্ধ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বিশেষ সংস্করণ বিক্রী হয়ে যাবে। আর ব্রতৈলের গলায় দড়ি বেঁধে...'

'বলছ কি! বৃটিশরা যদি জেতে ওরা তোমাকেও খুন করবে।'

সাড়ম্বরে মাথা নেড়ে জোলিও বলল, 'ঠিক কথা! ভালই হয় তাহলে! ভগবানের পৃথিবীতে শয়তানগুলোর গলা কাটবে কে! এ-দৃশ্য দেখবার জন্যে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি যাওয়াও ভাল!'

আপিসে যাবার পথে ঠিক করল, এক গ্লাশ সরবত খেলে বেশ হয়—এর পর তো সবই ওদের পেটে যাবে। গলির ভেতর এমন একটা ছোট্ট কাফে সে খুঁজে বার করল যেখানে জার্মানরা ঢোকে না বলেই মনে হয়।

যে মেয়েটি খাবার দিয়ে গেল, তার চোখ দুটি অশ্রুলাঞ্ছিত। একটা খবরের কাগজ তুলে নিল জোলিও। কাগজটা সে পড়ল না, অন্য কিছু

ভাবছিলও না সে। আজকাল প্রায়ই এই রকমের একটা আচ্ছন্নতায় সে ডুবে যায়; কোন একটা দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে যেন সে। দরজাটা শব্দ করে উঠল, ভেতরে ঢুকল একজন জার্মান অফিসার, ভারী চোয়াল, নির্বোধ দৃষ্টি। ভদ্রভাবে সে সকলকে অভিবাদন জানাল, কেউ উত্তর দিল না। মেয়েটি এক পাত্র বিয়ার আনল তার জন্যে। বিয়ার হাতে নিয়ে সে বসতে বলল ওকে কিন্তু নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করল মেয়েটি। আর এক পাত্র বিয়ার খেয়ে সে মেয়েটিকে বলল, 'মুখে কথা নেই কেন সুন্দরী? কই, মুখ বন্ধ করে রইলে যে?'

হাতের ট্রে দিয়ে মুখ ঢেকে ও উত্তর দিল, 'মঁশিয়, আমি ফরাসী মেয়ে।'

অফিসারটি চটে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে সে চিৎকার করে বলে গেল, 'আরসিতে নিজের মুখটা একবার ভাল করে দেখো। তোমার মা নিশ্চয়ই কোন নিগ্রোর সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিল।'

অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল মেয়েটি: 'কেন, কেন আমাদের হাতে একটিও ট্যাঙ্ক ছিল না?'

জোলিও ওকে বলল, 'আমাদের ট্যাঙ্ক ছিল। সেগুলো ছিল ভেসার হাতে। কেঁদে লাভ কি? চোখের জলে তো ওদের তুমি তাড়াতে পারবে না। ওগুলো হচ্ছে ইঁদুর, না মারলে রেহাই নেই। কিন্তু ওটা আমার কাজ নয়। না, কারণ আমি ওদের কাছ থেকে টাকা নিই। সবাই নেয়। আমি কি করতে পারি? এমন কি মার্সাইএরও কোন অস্তিত্ব নেই। ধরতে গেলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই প্রায়—খালি আছে ওই জার্মানগুলো আর কপালের দুঃখ। বাছুরের মত কান্না থামাও দিকি। তার চেয়ে বরং দু গ্লাশ বিয়ারের দামটা রেখে দিতে চেষ্টা কোরো। হয়ত শেষ পরিণতি ভালই হবে—ল্যাম্পপোস্টের দড়ি থেকে আমি ঝুলতে থাকব আর তুমি নাচতে থাকবে মার্সাইএর কোন লোকের সঙ্গে। জানো তো, মার্সাইএ আমরা বেপরোয়াভাবে নাচি।'

৪১

নানা রকম তর্ক তুলে ন্যায়ের দোহাই দিয়ে ব্রতৈল চেষ্টা করল নিজের কথার যৌক্তিকতা বোঝাতে। কিন্তু জেনারেল ফন শোমবের্গ অবিচলিত। গোল গোল নীল চোখে ব্রতৈলের দিকে তাকিয়ে কড়া চুরুট টানতে টানতে

জেনারেল মাঝে মাঝে বলে চলেছে, 'না, না!' যেন তার অভিধানে এই একটিমাত্র কথাই আছে।

জেনারেল ফন শোমবের্গ মনে করে যে ফরাসীদের কথায় কোন গুরুত্ব দিতে নেই। জোলিওকে পছন্দ হয় তার। সংগীত ভবনের একজন অভিনেত্রীকে সে লাঞ্চে আপ্যায়িত করে। 'ফ্রান্স হচ্ছে ছুটি কাটাবার পক্ষে চমৎকার দেশ, আর পারী সে দেশের আশ্চর্য প্রমোদ ভবন'—কথাগুলো বলতে সে ভারী ভালবাসে। ব্রতৈলকে সে মনে করে একজন 'গুরুগম্ভীর ফরাসী', অর্থাৎ অন্য কথায় বোকা।

ইতিপূর্বে বোর্দোতে জার্মানদের দাবীর বহর দেখে ব্রতৈল খানিকটা হতবুদ্ধি হয়েছে। সে মনে করেছিল, এটা একটা জুয়ো খেলা, হাতের তাস লুকিয়ে রেখে শয়তানী বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। পরিবর্তে জার্মানরা তাকে শুধু হুমকি দিয়েছে। সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর সমস্ত বেতারকেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হবে—জার্মানদের এই দাবী শুনে তার বুদ্ধি লোপ পাবার মত অবস্থা। কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলেছে, 'ওরা চায় ফ্রান্স বোবা হয়ে যাক।' কিন্তু তবুও বোর্দোতে ব্রতৈল আশা ত্যাগ করেনি। বাহ্যিক আড়ম্বর হিটলার ভালবাসে, এবং কমপিএঞর লজ্জাকর দৃশ্যটা এই জন্যে তার কাছে প্রয়োজন ছিল। রক্তের ধার রক্তে শোধ করাটাই এতদিনের রীতি, কিন্তু হিটলার চায় চোখের জল দিয়ে চোখের জল মুছতে। যাই হোক, উৎসবের মত্ততা থামবে একদিন, স্তব্ধ হবে জার্মানীর ঘণ্টাধ্বনি, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জয়ের উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা যাবে নিভে—আর তখন সম্ভব হবে কিছু একটা আলাপ আলোচনা করা। ফ্রান্স পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু ফ্রান্সের শক্তি অতীতেও যেমন বিরাট ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। উপনিবেশ ছিল ফ্রান্সের, ছিল নৌশক্তি। আর হিটলারের হাতে এখনো ইংলণ্ড রয়েছে। ফ্রান্সকে যোগ্য মর্যাদা দিতেই হবে হিটলারকে।

কতগুলি জরুরী বিষয় স্থির করবার জন্যে ব্রতৈলকে পারীতে পাঠিয়েছে পেতাঁ। অনধিকৃত অংশে লক্ষ লক্ষ গৃহহীন লোক অনাহারে রয়েছে। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকৃত অংশে ঢুকতে দিতে জার্মানরা অনিচ্ছুক। বন্দীদের দিয়ে ওরা জোর করে গুরু পরিশ্রমের কাজ করাচ্ছে, আহতদের জন্যে কোন ব্যবস্থা নেই।

এই সমস্ত কথা ব্রতৈল জেনারেল ফন শোমবের্গকে বুঝিয়ে বলল। মন দিয়ে

ব্রতৈলের কথা শুনল জেনারেল। কিন্তু ব্রতৈল যখন জিজ্ঞাসা করল, 'এই সব বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে একমত তো?' জেনারেল সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল, 'না।'

এই কথাও ব্রতৈল উল্লেখ করল যে লোরেনের দখলকারী সৈন্যরা ফরাসী ভাষার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিচ্ছে। কথাটা শুনে জেনারেল একটু সজাগ হয়ে উঠল, তারপর বলল, 'লোরেনে কোন দখলকারী সৈন্য নেই। লোরেন এখন জার্মানীর অংশ।'

ব্রতৈল আর সহ্য করতে পারল না। এই প্রথম সে কোন রকম কূটনৈতিক ভাষার আশ্রয় না নিয়ে সোজাসুজি বলে উঠল, 'আমি একজন লোরেনবাসী।'

ফন শোমবের্গ সযত্নে ছাইদানির প্রান্তে চুরুটটা ঠুকে ঠুকে ছাই ফেলল, কিন্তু কোন কথা বলল না। আবার আশ্রয়প্রার্থীদের প্রসঙ্গে ফিরে গেল ব্রতৈল। বিরক্ত হয়ে জেনারেল একটা উখো নিয়ে ঘষে ঘষে হাতের নখ পরিষ্কার করতে লাগল, হাই তুলল কয়েকবার এবং অবশেষে এই বিরক্তিকর আলাপ-আলোচনা বন্ধ করবার জন্যে বলল:

'ওসব খুঁটিনাটি আলোচনায় আমি যেতে চাই না।'

'কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো খুঁটিনাটি নয়। লক্ষ লক্ষ ফরাসীর জীবনমরণের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। জার্মান কর্তৃপক্ষের প্রত্যাখ্যান এই দুই জাতির সহযোগিতায় বাধা সৃষ্টি করবে। আমি আশা করি...'

'না।'

ব্রতৈল উঠে দাঁড়াল। লম্বা, শুকনো চেহারা—দেখে মনে হয় জার্মান অফিসার। ফন শোমবের্গ একটু বিব্রত বোধ করল যেন।

বলল, 'আপনি আমার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি, সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। আপনি কথা বলেন কূটনীতিকের মত। কিন্তু আমি একজন সামরিক লোক ছাড়া কিছু নই। আমার কাছে ফ্রান্স পরাজিত দেশ। আমরা নিশ্চয়ই বদান্যতা দেখাব। কিন্তু আপনি যে সমস্ত অনুরোধ করলেন সেগুলো আমার কাছে বিবেচনাযোগ্য বলে মনে হল না।' কথাটা বলে ব্রতৈলের দিকে একবার তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে আবার বলল 'না মহাশয়, না!'

বাইরে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ব্রতৈল সুস্থ হল না। প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এ একটি

অভিজাত হোটেলে ফন শোমবের্গের হেডকোয়ার্টার। জনশূন্য প্রকাণ্ড স্কোয়ারটার দিকে ব্রতৈল তাকিয়ে দেখল। চারদিকে জার্মান পতাকা। রাস্তায় রাস্তায় জার্মান সৈন্য মার্চ করে চলেছে—রাইট্-লেফ্ট্, রাইট্-লেফ্ট্। সবুজাভ ধূসর উর্দি...চারদিকে নীল রঙের সমারোহ—আকাশ, সীন নদী, ঘরবাড়ী।
ফন শোমবের্গের কথা মনে পড়তেই ব্রতৈল ভুরু কোঁচকাল: 'কী শয়তান লোকটা!' হ্যাঁ, এই জার্মানগুলো মনে করে যে ওরা বিজয়ী জাত। জয়ের নেশায় আকণ্ঠ ডুবে আছে ওরা, অন্তত দশ বছরের আগে ওরা প্রকৃতিস্থ হবে না। 'না! না!'...এই রকম লোকের সঙ্গে সহযোগিতা সম্পর্কে কথা বলে লাভ কি? কোনদিন সে কারো কাছে নতজানু হয়নি আর আজ সে ফরাসী জাতিকে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করছে।
রয়ালের দিকে ঘুরে গেল ব্রতৈল। নিজের চিন্তায় এমন ডুবে ছিল যে প্রহরীর হাঁক শুনতে পায়নি। জার্মান সৈন্যটি গালাগালি দিতে দিতে তার পেছনে ছুটে এল: 'এই হাঁদারাম রাস্তায় নেমে!' কোন প্রতিবাদ না করে ব্রতৈল ফুটপাথ থেকে নেমে এল। তারপর হঠাৎ হাসতে শুরু করল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এমনিতে সে বড় একটা হাসে না, নিজের কর্কশ হাসি শুনে নিজেই ভয় পেল সে। আজ সব কিছুতেই তার হাসি পাচ্ছে—হাসি পাচ্ছে এই ভেবে যে ওরা তাকে ফুটপাথ থেকে নামিয়ে দিল, গ্রি-নেকে একদিন সে খুন করেছিল, লোরেন জার্মানীর অংশ, আর সব কথাতেই জেনারেলের সেই উত্তর—'না!' সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে ফ্রান্সের আর কোন অস্তিত্ব নেই। পারী আছে—আছে পারীর পথঘাট, ঘরবাড়ী, দোকানের সাইনবোর্ড আর আছে বৃদ্ধ মার্শাল ও চার কোটি দুর্ভাগা মানুষ। কিন্তু ফ্রান্স নেই, আর এই একটি মাত্র বিষয়ে জেনারেলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যেন বলা চলে—'না! না!'
কিন্তু রইল কি? নিজের প্রশ্নে নিজেই ভয় পেল ব্রতৈল। জনশূন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঠোঁট নাড়তে লাগল—ছেলেবেলার পরিচিত একটা প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করছে সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সান্ত্বনা পেল না। কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পর ছাপ রেখে গেল না কিছু। স্যাঁ অগস্তিন গির্জার কাছে এসে সে ভেতরে ঢুকল। ভেতরটা ঠাণ্ডা ও শান্ত—আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড় নেই, জার্মানরা নেই। সভাগৃহের দরজার সামনে একজন পাদ্রী দাঁড়িয়ে ছিল, ব্রতৈলকে তিনি আশীর্বাদ করলেন। ব্রতৈল জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন মঁশিয় ?'

তিনি বললেন, 'বড় ভাল নয়। গোড়া থেকেই আমি পারীতে আছি। এত দুঃখকষ্ট আমরা কোনদিন দেখিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্ধ শাসনকর্তাদের তিনি ক্ষমা করুন। জনসাধারণকে তারা ত্যাগ করেছে। আর জার্মানদের কথা যদি বলতে হয় তো বলব যে ওদের বিবেক বলে কিছু নেই।'

ব্রতৈল চোখ বুজল। পাদ্রী বুঝতে পারলেন না তাঁর কথায় এত বিচলিত হবার কি আছে।

ব্রতৈল, বলল, 'ভগবান জানেন এ আমি চাইনি। কিন্তু এখন এই বলে নিজের পক্ষ সমর্থন করার সময় নেই। আমার ছেলে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আবার বেঁচে উঠবে। কিন্তু আমি পারব না। অর্থাৎ আমার আর কোন অস্তিত্বই নেই। হয়ত কোন কালেই আমার অস্তিত্ব ছিল না—প্রতিবিম্ব বা প্রতিরূপ...'

'এই আর একজন।' পাদ্রী ভাবলেন। বিভিন্ন ঘটনায় মানুষের মাথার ঠিক নেই। দিনের পর দিন তাঁকে বহু অসংলগ্ন প্রলাপ শুনতে হচ্ছে।

গির্জা থেকে বেরিয়ে এল ব্রতৈল। দম দেওয়া যন্ত্রমানুষের মত দেখাচ্ছে তাকে—দীর্ঘ অস্থিসার চেহারা, মাথায় কালো টুপি, 'মন্ত্রশিষ্য'দের নেতা। একাধিকবার তার আদেশে বহু লোককে অখ্যাত মৃত্যু বরণ করে নিতে হয়েছে। পরলোকে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে এই আশা নিয়েই সে বেঁচে ছিল। লোরেনের লোক সে, কিন্তু লোরেন আর নেই। এখন কোন কিছুই নেই, সব শেষ—'মন্ত্রশিষ্য', শেষ বিশ্বাস, এমন কি শেষ ফরাসী মাটি পর্যন্ত। রাস্তায় প্রাশিয়ানদের ভীড় আর দুর্বোধ্য ভাষায় কথাবার্তা। যা কিছু পাচ্ছে চালান দিচ্ছে ওরা—সসেজের মোড়ক, জুতো, মোজা, পুতুল, বৌয়ের জন্যে উপহার, ভোজের উপকরণ, দুর্দিনের সঞ্চয়, ফ্রান্সের রক্তমাংস। ফিসফিস করে ব্রতৈল বলল, 'মাংসখাদক, রক্তপায়ী।'

মোটা মোটা ভাঙা গলায় একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করছিল, 'লা ভোয়া নুভেল! শেষ সংস্করণ!' অন্তত খবরের কাগজ কেনার কোন বাধা নেই। কাগজটা খুলে ব্রতৈল পড়ল, 'সহযোগিতার নীতি ফলপ্রসূ হচ্ছে।' গতকাল, ফন শোমবের্গের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে এই প্রবন্ধটা সে নিজেই লিখেছিল। আর এর পরেও আগামী কাল সে লিখবে, 'সহযোগিতার নীতি ফলপ্রসূ হয়েছে।' আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ে আর কোন গণ্ডগোল নেই, বন্দীরা

চমৎকার সুখে দিন কাটাচ্ছে। জার্মান বুটের তলায় ফ্রান্সের কোন দুঃখ নেই। জোলিও সম্পাদক, ব্রতৈল লেখক।

লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে লাগল। তারপর এক সময়ে লাউড-স্পীকারের আর্তনাদ শোনা গেল—'বাড়ী ফিরে যাও! সময় হয়েছে!'

পরিত্যক্ত বাড়ীতে ফিরে সোফার ওপর ছড়ানো জামাকাপড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ব্রতৈল সশব্দে হাই তুলল। তারপর সে ঠিক করল কিছু কাজ করবে। এক টুকরো কাগজের ওপর ছোট্ট একটা ক্রশ এঁকে সে লিখল, 'মানবিক আত্মার ক্লান্তি।' কলমটা রেখে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। শিশুর দোলনাটার সামনে থেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ—কোন কিছু ভাবছিলও না, প্রার্থনাও করছিল না। ফিরে এসে আবার বসল টেবিলের সামনে।

তারপর দ্রুত লিখে গেল:

মহামান্য হের জেনারেল ফন শোমবের্গ সমীপেষু—

দ্য গল এবং ইংলণ্ডের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিদের ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের দরুণ আমি মনে করি যে জার্মান কর্তৃপক্ষের এমন মনোভাব অবলম্বন করা উচিত যাতে জনসাধারণ শান্ত থাকে—এবং এই উদ্দেশ্যে অন্তত সকল বৃহৎ পরিবারস্থিত গৃহিনীদের পারীতে প্রবেশ করবার অনুমতি দেওয়া উচিত। বৃটিশ দালাল, কমিউনিস্ট ও দ্য গল পক্ষাবলম্বীয় ব্যক্তিদের নির্মূল করবার কাজে আমি সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। এই সঙ্গে দুষ্ট প্রকৃতির ফরাসী ব্যক্তিদের একটি তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করছি...

অনেকক্ষণ ধরে সে লিখল। টেবিলের ওপর নিশ্চল হয়ে রইল তার ছায়াটা—বাঁশের ছায়ার মত দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ।

৪২

এতদিন পারীর লোকেরা বাইরে বেরোয়নি। রাস্তায় জার্মান সৈন্যের আবির্ভাবে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছিল না। সকালবেলা আনে বাজার করতে বেরলো। লোকে কোন কিছু না ভাববার চেষ্টা করছে। মনকে অন্যমনস্ক করবার কাজে এক পাউণ্ড আলু বা এক বোতল দুধের সন্ধান করাটা বেশ কার্যকরী। যদিও বা কোন সময়ে দু-একটা কথা হয়, সেটা হয় হারানো আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে—কেউ স্বামী হারিয়েছে, কেউ ছেলে।

কেউ কোন উত্তর দেয় না, সবাই ভাবে : 'ফ্রান্সও গেল !'

পারীর স্তম্ভগুলির দিকে তাকিয়ে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্নের কথা মনে পড়ে লোকের। জল আসে চোখে। কবির বীণা নির্বাক। ফরাসী মার্শালরা মৃত অশ্বের পৃষ্ঠারোহী। কবুতরের সঙ্গে কথা বলছে বক্তারা। অতীতের কথা মনে পড়ে লোকের : 'দাঁতের প্রতিমূর্তির নীচে আমি মাদেলিনের জন্যে অপেক্ষা করতাম।'

এই মিথ্যে জীবনের ভার বয়ে চলতে কেউ রাজী নয় কিন্তু তবুও বেঁচে থাকতে হয়,—দাঁড়াতে হয় লাইনে, রান্না করতে হয়, চিঠি লিখতে হয়। চিঠি লেখে সেই সব পুরনো ঠিকানায় যার কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। ডাক অচল। পরিত্যক্ত শহরে শুধু শোনা যায় জার্মান সৈন্যদের দুর্বোধ্য গান এবং ছায়াচ্ছন্ন স্কোয়ারে স্কোয়ারে পাখীর কাকলি।

যে স্কুলে আনে থাকে, তার কাছেই একটা স্কোয়ার। কয়েকটা প্লেন গাছ ছাড়া স্কোয়ারের ভেতর আর কিছু নেই। বিস্তৃত গাছগুলোর নীচে দুদু খেলা করে, গুঁড়ো গুঁড়ো সোনার মত বালি তোলে মুঠো মুঠো। তাম্রাভ ছোট্ট ছেলেটি, পিয়েরের মতই অশান্ত ও অস্থির, আনের জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

প্রথমে আনে চেয়েছিল পারী ছেড়ে চলে যেতে। প্রথমেই মনে পড়েছিল দাক্স্-এর কথা, যেখানে তার বাবা থাকে। কিন্তু দাক্সেও জার্মান সৈন্য আছে শুনে ভুরু কোঁচকাল। পালিয়ে যাবার শেষ আশ্রয়ও আর রইল না। মনে মনে বলল 'তার মানে জার্মানদের সঙ্গেই বসবাস করতে হবে !'

তার দিন চলত পুরনো জিনিসের দোকানে জামাকাপড়, বইপত্র, এটা-ওটা বিক্রী করে। বুনো জানোয়ারের শীতকালীন ঘুমের মত তার স্বপ্নময় স্থূল অস্তিত্ব। এই রকম জীবন তার একারই নয়, সমগ্র পারীর লোক এইভাবে থাকে। অন্যত্র লোকে এই সব কথা আলোচনা করে, ঠাট্টাতামাসা করে পারীর জীবন নিয়ে বা দুঃখিত হয়। কিন্তু পারীতে কেউ কিছু অনুভব করে না। যেন অস্ত্রোপ্রচারের টেবিলে রুগী শুয়ে আছে, ক্লোরোফর্মের ঠুলিটা খুলে ফেলবার ক্ষমতা তার নেই।

একদিন এক গুমোট সন্ধ্যায় দুদুকে বিছানায় শুইয়ে আনে জানলার কাছে বসেছিল। সময়ের গতি মন্থর। একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। এই সময়ে আর কে হতে পারে? ওরা ছাড়া কেউ নয়...জার্মানদের সম্পর্কে সে 'ওরা' ছাড়া আর কিছু বলে না। কেন ওরা

এসেছে? একটা চিন্তা খুব স্পষ্টভাবেই তার মনে এল—'যদি মৃত্যু হয় তো আমি তার জন্যে প্রস্তুত নই।'

দরজা খুলে দেখল তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে।

'ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে।' যুবক তিনজন বলল।

শূন্য, অপরিষ্কার বসবার ঘরে আনে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

বয়োজ্যেষ্ঠ যুবকটি বলল, 'আমি একজন সৈনিক। ও আমার ভাই আর ও ভাইয়ের বন্ধু। বোভাস থেকে আমরা এসেছি। এ পর্যন্ত আমরা নিরাপদেই আসছিলাম, কিন্তু মেট্রোর কাছে ওরা আমাদের আটকাল।

আমরা ছুটে গেলাম মেট্রোর দিকে। কত ধাক্কা দিলাম, ঘণ্টা টিপলাম, কিন্তু কেউ এল না। বোধ হয় সবাই পালিয়েছে।'

হঠাৎ নীচের দরজায় প্রচণ্ডভাবে কড়ানাড়ার শব্দ শোনা গেল। আতঙ্কিত হল আনে: এখন কি করা উচিত? হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভাঁড়ার-ঘরে কতগুলো বড় বড় বাক্স আছে। ছেলে তিনটিকে তাড়াতাড়ি বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরে ছেঁড়া কম্বল বিছিয়ে দিল—আশ্রয়প্রার্থীদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া কম্বল ছিল অনেক। তারপর কি মনে হতেই হঠাৎ তুতুকে কোলে নিয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে।

ভেতরে ঢুকল দুজন জার্মান ও একজন ফরাসী।

'কে থাকে এখানে?'

'আমি। আর আমার এই চার বছরের ছেলে।'

'আর কেউ?'

'খুঁজে দেখতে পারেন......'

ফরাসী লোকটি প্রথমে ঘরটায় ঢুকে দেওয়াল-আলমারিটার ভেতর দেখল, তারপর কি মনে করে টেবিলের ওপর রাখা বইটা নিল হাতে। জার্মান দুজনের একজন বিনীতভাবে বলল, 'ক্ষমা করবেন, মাদাম। ভুল হয়ে গেছে।'

ওরা চলে যাবার পর তুতুকে বিছানায় শুইয়ে দিল আনে। তুতু ভীষণ চিৎকার করছিল—মাঝে মাঝে অকারণেই ও এ রকম করে। তারপর সে গেল ভাঁড়ার-ঘরে। প্রথমে বেরিয়ে এল একেবারে ছোট ছেলেটি, নাম জাক।

'আমার ভয় হচ্ছিল যে আমি হয়ত হেঁচে ফেলব। ভেতরে এত ধুলো যে ঝাঁটা আটকে যাবে।' জাক হাসল।

'দেখি তোমাদের কিছু খেতে দিতে পারি কিনা।' আনে বলল।

কপালগুণে তখনো কিছুটা ঝোল, ছোট রুটি আর খানিকটা তরকারী ছিল।

এক টুকরো রুটি চিবোতে চিবোতে সৈন্যটি বলল, 'কাল থেকে কিচ্ছু খাওয়া হয়নি।'

'এবার নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করো।' আনে বলল।

'না। ঘণ্টাখানেক এখানে থাকব। যতক্ষণ না গোলমালটা থেমে যায়। তারপর আবার আমাদের যেতে হবে। অন্তত শাৎর্ঁর পর্যন্ত আমরা যেতে চাই। সেখানে লোক আছে, সে আমাদের বার করে দেবে।'

'কিন্তু শাৎর্ঁর থেকেই বা যাবে কোথায়? এমন জায়গা কোথায় যেখানে জার্মানরা নেই?'

পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল তিনজনে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই জানতে চাইছে কথাটা আনের কাছে ভেঙে বলা উচিত কিনা।

সৈন্যটি বলল, 'আমরা কিছু বলব না। কিন্তু আপনি ফরাসী মহিলা, আপনি বুঝতে পারবেন। আমরা যাচ্ছি লণ্ডনে, জেনারেলের কাছে, যুদ্ধ করতে।'

'যুদ্ধ করতে?' আনে বোকার মত বলল, 'কিন্তু সন্ধি তো হয়ে গেছে।'

ঘৃণাকুঞ্চিত মুখে জাক চিৎকার করে উঠল, 'কারা করেছে সন্ধি? বিশ্বাসঘাতকরা!'

'আস্তে! আস্তে!' তারপর আনের দিকে ফিরে সৈন্যটি বলল, 'যুদ্ধ শেষ হয়নি। আমি ডানকার্কে ছিলাম। আমার ভাই আর জাকের তখনো সৈন্যদলে ডাক পড়েনি। কিন্তু এখন সমস্ত সৎ লোককে এগিয়ে আসতে হবে যুদ্ধ করবার জন্যে। ফ্রান্সের কি অবস্থা দেখুন! বোভাস-এ...এসব কথা থাক এখন...না, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। জেনারেল দ্য গল সবাইকে ডাক দিয়েছেন। রেডিওতে তার বক্তৃতা আমরা শুনেছি। শাৎর্ঁর থেকে বৃটানিতে যেতেই হবে আমাদের। সেটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়—বহু জেলে নৌকো পাব। আসল কাজ কোন রকমে পারীর বাইরে যাওয়া। আমার একটা জ্যাকেট আর জামা আছে বটে কিন্তু এগুলো...'

বলে সে তার ফৌজী পোষাকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। তক্ষুনি ছুঁচ সুতো নিয়ে বসল আনে: 'পোষাক তৈরী করতে হবে।' কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে কয়েকটা পোষাক বানিয়ে ফেলল সে। গায়ে

ঠিক হয় কিনা দেখবার জন্যে পরে দেখল তিনজনে। হেসে উঠল প্রত্যেকে। একটু ছোট, কিন্তু কাজ চলবে।

হঠাৎ আনে বলল, 'আমার স্বামী যুদ্ধে মারা গেছেন। যুদ্ধজয়ে আমাদের লাভ কি?' আনের মনে হল সে পিয়েরের সঙ্গে তর্ক করছে, উত্তেজিত হয়ে বলে চলল, 'আসল কথাটা কি জান? তা হচ্ছে আত্মা। কিন্তু লোকে শুধু যুদ্ধক্ষেত্র আর মানচিত্রের কথাই ভাবে...'

'সে আত্মাকে আমরা চিনেছি!' জাক চিৎকার করে উঠল। (আবার সৈন্যটি বলল, 'আস্তে!') 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আত্মা! মানচিত্রে কি ফ্রান্স নেই? আছে, খুব স্পষ্টভাবেই আছে। ফ্রান্স না থাকলে আমি বাঁচব না। আঠারো বছর বয়স আমার, বেঁচে থাকতে চাই আমি, অত্যন্ত প্রবলভাবে বেঁচে থাকতে চাই...আমরা যদি মরে যাই তো ক্ষতি কি? আর একজনের প্রাণ বাঁচবে। আপনার একটি ছেলে আছে। সেই ছেলেই তো ফ্রান্সের প্রতীক, নয় কি?'

আনে মাথা নাড়ল, এখনো তার মত পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ছেলে তিনটিকে বিদায় জানাবার সময় গভীর আবেগে তিনজনকেই সে চুম্বন করল। জল এল চোখে।

তারপর ছুহুর বিছানার পাশে বসে সে কাঁদতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের কান্না, কিন্তু তার মনে হল যেন দীর্ঘ সময় পার হয়েছে। হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে জানলার কাছে ছুটে এল আনে। খুব কাছেই দুবার গুলির শব্দ হয়েছে। ঘুম থেকে জেগে উঠে কাঁদতে লাগল দুহু। প্রচণ্ড শব্দে দরজা ভেঙে জার্মান সৈন্যরা ছুটে এল ঘরের ভেতর।

ফরাসী পুলিশটিকে আনে চিনল, আগের বারেও সে এসেছিল। 'এই সেই!' চিৎকার করে উঠল পুলিশটা। জার্মান অফিসারটি কি যেন বলতেই দুজন সৈন্য এগিয়ে এসে আঁকড়ে ধরল তাকে। অফিসারটি ফরাসী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকগুলো পালাল কি করে?' দুহু কাঁদছিল। সৈন্যরা আনেকে গাড়ীর কাছে নিয়ে গেল। দু হাত মুচড়ে ধরা সত্বেও কোন রকম ব্যথা বা ভয় সে অনুভব করছিল না। হঠাৎ একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল: 'দুহুর কি হবে?' অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

জার্মান অফিসারটি ধমকে উঠল, 'চুপ! এটা প্রণয়-আলিঙ্গন নয়।'

রাত্রিটা যেন আজ বেশী রকম অন্ধকার। আনের মনে হল যেন সে অরণ্য

দেখছে—বাড়ীগুলো যেন গাছ। একটা লম্বা সরু রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। চামড়া, কপি আর প্রস্রাবের গন্ধ! একটা খালি কামরার ভেতর তাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। 'আমি কয়েদখানায় নই,' ভাবল সে। কি ছিল এখানে? মেঝের ওপর কালির দাগ। হয়ত একটা স্কুল? ...মনে হল পিয়েরের ভাবাক্রান্ত মুখটা সে দেখতে পাচ্ছে যেন। তার কাঁধের ওপর দিয়ে পিয়ের তাকিয়ে রয়েছে খাতার দিকে আর চুমু খাচ্ছে তাকে। কী চোখ-ঝলসানো আলো! একেবারে কড়িকাঠের সঙ্গে লাগানো। দেওয়াল ঠেস দিয়ে মেঝের ওপর সে বসল। মনে পড়ল, বাড়ীতে তুতু একা রয়েছে। মনে পড়তেই গভীর একটা হতাশা এল মনে, আচমকা অজ্ঞান হয়ে পড়বার মত ভারী আর বিশ্রী বোধ হল শরীরটা। হঠাৎ সে কেঁপে উঠল—দেওয়ালের গায়ে কি যেন লেখা রয়েছে, হাতের নখ বা পিন দিয়ে লেখা: 'বিদায় মা! বিদায় ফ্রান্স! রবের।' আর ঠিক এই লেখাটার নীচে কেন সে লিখতে চাইল 'বিদায় তুতু'? কেন তার মনে হল যে এই কথা দুটো লিখতে পারলেই সে আরাম বোধ করবে? কিন্তু তার কাছে পিন নেই। হাতের ছোট ছোট নখের দিকে তাকিয়ে তার কান্না পেল। হঠাৎ আর একটা চিন্তা এল—'ওরা বলাবলি করছিল যে তিনজনে পালিয়ে গেছে। তার মানে ওরা ধরা পড়েনি। ওদের জেনারেলের কাছে যেতে পারবে ওরা। চমৎকার ছেলে জাক।' মনে হল, তার জীবনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেন এই যে ওরা পালাতে পেরেছে।

প্রশ্ন করবার জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। জার্মান অফিসারটি ভাল ফরাসী বলতে পারে, দোভাষীর দরকার হল না। অফিসারটি প্রথমে কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলল, 'দু বছর আমি গ্রেনোব্‌ল্‌-এ কাটিয়েছি। ভারী সুন্দর শহর।' লোকটির কথাবার্তা অত্যন্ত ভদ্র, আনেকে সে সান্ত্বনা দিল—'আপনার ছেলে যত্নেই আছে।' তারপর সে চেষ্টা করল আনের মুখ থেকে কথা বার করতে—'আচ্ছা বলুন তো ওই লোক তিনজন কে? বললেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

আনেকে চুপ করে থাকতে দেখে সে চটে উঠল—'মাদাম, নষ্ট করবার মত সময় আমার হাতে নেই। আপনি চুপ করে আছেন যে? তার মানে আপনি ইংরেজদের চর।'

আনে ঘাড় নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।' চোখের দৃষ্টি হল মৃদু ও কোমল, ঠিক

যেমনটি হয়েছিল পিয়েরের তর্জনগর্জন শুনে বেলভিলের জানলার নীচে দাঁড়িয়ে। বলল 'হ্যাঁ, আমি চর। কেন তোমরা আমাদের দেশে এসেছ? সবাই তোমাদের বিরুদ্ধে। এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত। আমি বলব না এই তিনজন কে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তোমরা ওদের ধরতে পারনি। সেটাই বড় কথা। এখন তোমরা ইচ্ছা করলে আমাকে মেরে ফেলতে পার। আমি আর কি কাজে আসব? বন্দুক ধরতে পর্যন্ত জানি না আমি।'

এখন তার মনে হল যেন সে মরতে প্রস্তুত। মনের এই ভাব তার উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনল। এই কিছুক্ষণ আগেও তিনটি ছেলের সঙ্গে সে তর্ক করেছে। আর এখন তার মনে হচ্ছে যে এই সুসজ্জিত লোহিতকায় অফিসারটির সামনে দাঁড়িয়ে একবারও না থেমে সেই ছেলে তিনটির কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করে। কেমন পরিপাটি সিঁথি জার্মান অফিসারটির!

জার্মানটি কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। দোয়াতদানিটা ঠেলে সরিয়ে বলল, 'থাক, আর জাহির না করলেও চলবে। আপনাকে এখানে বক্তৃতা দেবার জন্যে ডাকা হয়নি। আপনি শুধু যেটুকু খবর জানেন বলবেন। ভাল চান তো উত্তর দিন। আপনি ওদের চেনেন?'

'চিনি।'

'কে এরা?'

'ফরাসী!'

প্রচণ্ড রাগে অফিসারটির কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। সাধারণত তার ব্যবহার খুব ভদ্র, অমায়িক ব্যবহারের গুণে এই বছরখানেক আগেও সে সুইন্‌মুণ্ড-এর মেয়েদের মুগ্ধ করেছে—কিন্তু আজ হঠাৎ সে ছুটে এসে আনেকে মুখের ওপর মারল। আনে কাঁদল না, নিজের অজ্ঞান্‌তেই হাতটা উঠে এল মুখের কাছে এবং রক্তমাখা হাতের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। মানুষের ভেতরে যে সব জন্মগত অনুভূতি থাকে তার বাইরে চলে গেছে সে এখন। কোন রকম ব্যথা সে অনুভব করছে না, এই সুসজ্জিত সুরভিত অফিসারটির পশুসুলভ ব্যবহারেও সে ক্ষুব্ধ হয়নি। কেমন একটা আত্ম-বৈরাগ্য ও উল্লাস তাকে অভিভূত করেছে যেন। আপন মনেই সে বলে চলেছে, 'ভালবাসি, ভালবাসি ছুছুকে, ভালবাসি পিয়েরকে, ভালবাসি বাবাকে, ভালবাসি জাককে, ভালবাসি রবেরকে, ভালবাসি অন্য সবাইকে যারা গত কয়েকদিনে পারীর শৃঙ্খলিত পথে পথে ক্লান্ত বিষণ্ণ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে।' তাদেরই একজন

তাকে বলেছে, 'বিদায়!' 'না,' মনে মনে সে বলল, 'বিদায় নয়, বলতে হবে —কেমন আছ, ভাল তো? আবার আমাদে. মলন হয়েছে! মিলন পিয়েরের সঙ্গে, মিলন পারীর সঙ্গে।'

বারান্দায় বসে সে এই কথাগুলো জোরে জোরে উচ্চারণ করল। কর্নেলের কাছে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। কর্নেলের চিবুকে একটা কাটা দাগ, মাছের মত চোখ দুটো চক্রাকারে ঘুরছে। আনেকে বসতে বলল সে।

বলল, 'আমি আপনাকে বাঁচাতে চাই। আপনি শুধু বলুন, লোক তিনজন কে? নিজের ছেলের জন্যেও কি আপনার এতটুকু দরদ নেই? আমিও সন্তানের পিতা—দুটি মেয়ে আছে আমার।'

আনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। এই কথাগুলো তাকে অন্য এক জগত থেকে ফিরিয়ে এনেছে, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে এই রকম চাপা গলায় সে উত্তর দিল, 'ছেলের জন্যে কি আমার দুঃখ হচ্ছে? না। আজ আমি সব কিছু বুঝেছি। একজনের জীবনদান মানে অপর একজনের জীবন রক্ষা। অন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তার এই জীবনের মূল্যে বাঁচবার অধিকার পাবে... জনসাধারণ...আমার দেশের জনসাধারণ...' হঠাৎ মনে পড়ল তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। গোলগাল কাঁধ দুটো টান হয়ে গেল, লোহার রডের মত খাড়া হয়ে উঠল পিঠটা, কথা বলল অন্য সুরে: 'আপনি নিজেকে সন্তানের পিতা বলছেন? কথাটা সত্যি নয়। শুনতে চান আপনি কি? আপনি হচ্ছেন বশ্! খাঁটি বশ্!'

শাস্ত্রীকে ডেকে কর্নেল আদেশ দিল, 'নিয়ে যাও ওকে!'

তারপর আনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'মাদাম, শেষ সময় উপস্থিত আপনার।'

কর্নেলের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আনে উত্তর দিল, 'ফ্রান্সের শেষ সময় নয়, এখানে শেষ নয়। শেষ নেই।'

৪৩

দেনিস ছুটে গেল না, জড়িয়ে ধরল না। শুধু অশ্রুভরা চোখে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে যেমন ছিল কিছুটা ভয়, তেমনি ছিল কিছুটা আনন্দ।

মিশো হাসছিল। তারপর কেমন বোকার মত মনে হল নিজেকে, 'ব্যাপারটা কি, দেনিস ?'

এই মুহূর্তটির জন্যে সে এতকাল অপেক্ষা করেছে! নয় দিন আগে পাহারারত শান্ত্রীকে একটা পাথর ছুঁড়ে সে মারে। রোদে পোড়া গরম পাথর। পড়ে গিয়ে লোকটি আর ওঠেনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা খানার ভেতর সে লুকিয়ে ছিল।

এক বুড়ী তাকে কিছু জামাকাপড় দিয়েছে, নিজের বাড়ীতে থাকতেও বলেছে সকাল পর্যন্ত। শাদা দেওয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে মিশো বসে ছিল আর বুড়ী তার জামার বোতাম বদলে দিয়েছে। বোতামগুলো বুড়ীর মৃত স্বামীর, তিনি ছিলেন 'পেট্রোনেজ্ কাথোলিক্ দ্য স্যাঁ জুস্ত'-এর পরিচালক। খবরের কাগজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে বুড়ী বলেছে যে খবরের কাগজ সে পড়ে না কারণ কাগজগুলো সব জার্মান হয়ে গেছে। ঘড়ির ঘণ্টা বেজেছে দীর্ঘ বিরতির পরে পরে। দুজনের কেউ ঘুমোতে চায়নি। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা হয়েছে, আর সে সব কথাও অসংলগ্ন ও কেমন যেন অদ্ভুত।

মিশো বলেছে, 'তার নাম লেগ্রে। সেও ছিল কমিউনিস্ট...'

'আমি অন্য এক জগতে বাস করি। আমি ধর্মবিশ্বাসী। কিন্তু হিটলার...'

'হিটলারকে আমি ঘৃণা করি!'

'সে জন্যেই তো তোমাকে ঘরে ডেকে আনলাম। স্যাঁ জুস্ত-এ ওরা নোটিশ টাঙিয়েছে। বন্দীদের যে কেউ সাহায্য করবে, গুলি করে মারা হবে তাকে।'

'ওরা আমাকে পথ দেখিয়ে দিল। একদিনের জন্যে ওরা এটা মানেনি। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। পাখীর...'

'আমার বয়স আটান্ন। কোন রকমে দিন কাটছে, কিন্তু তবুও তো জীবন। সমস্ত ওলোটপালোট হয়ে গেছে যেন, আমার স্বামী মনে করতেন যে কমিউনিস্টরাই দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। আমারও তাই ধারণা ছিল। তখনকার দিনে হয়ত এই ধারণাই ঠিক। কিন্তু এখন... আমি 'লোরব্রে' কাগজ নিতাম। দুকান লিখেছিল যে কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক।'

'দুকান কথাটা বড় দেরীতে বুঝেছে।'

'কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই বড় দেরী করেছ, আর ইতিমধ্যে জার্মানরা এসে গেছে। এখন আমি ভাবি, সত্য কি—সাময়িক সত্যের কথা বলছি না, প্রকৃত চিরঞ্জীব সত্য।'

কথাটা বলে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট মূর্তির দিকে তাকিয়েছে বুড়ী। ধূসর প্রত্যূষের আভাস এসেছে জানলার ফাঁক দিয়ে, দেনিসের কথা ভেবেছে মিশো, প্রাণবন্ত জীবন্ত দেনিস—তারপর টুপিটা হাতে নিয়ে বুড়ীকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

আর এখন তার পাশেই দেনিস তবুও দেনিসের মুখে হাসি নেই। দেনিসকে চুমু খেল মিশো, কেবল ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ ঠোঁট দেনিসের।

'দেনিস! হল কি তোমার? এই দেখ আমি চলে এসেছি। পালিয়ে এসেছি ওখান থেকে।'

কান্নাভরা গলায় দেনিস বলল, 'মিশো, যখন তুমি আমাকে চুমু খেলে, আমার কেমন যেন ভয় হল। বেঁচে আছি বলে বিশ্বাস হয় না আমার। বুঝতে পারলে না কথাটা? আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার কেন জানি মনে হয় যে আমরা সবাই মরে গেছি আর তবুও আমরা বেঁচে থাকবার ভান করছি কারণ জার্মানদের আদেশ বেঁচে থাকতে হবে।'

মিশো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। এ কথাও সে স্বীকার করতে চাইল না যে আরাস-এর ঘটনার পর এই কথা সে নিজেও একাধিকবার ভেবেছে। যতবার ভেবেছে, নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে ভীরুতার জন্যে। দেনিসের চিন্তাতেই এতকাল বেঁচে ছিল সে। কেন জানি তার মনে হয়েছিল যে দেনিস তার কাছে আসবে মুখে হাসি নিয়ে, শরীরে উত্তাপ নিয়ে, আর জীবন নিয়ে। দেনিসের নৈরাশ্য দেখে বিমূঢ় বোধ করল মিশো, নিঃশব্দে তার হাতটা টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

পোর্ৎ দ্য ভার্সাইএর কাছাকাছি ছোট্ট লোহার দোকানটার ভেতরে দুজনের কথা হচ্ছিল। এখানেই দেনিস আর ক্লদ ইস্তাহার ছাপে। মিশোর সঙ্গে দেখা হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেনিস শান্ত থেকেছে, ক্লদের সঙ্গে কথা বলেছে সংগ্রাম শক্তি ও জয় সম্পর্কে। আর এখন মিশো আর সে ছাড়া আর কেউ নেই।

'কেঁদো না, দেনিস,' মিশো বলল।

ঘরে ঢুকল ক্লদ। মিশোকে সে প্রথমে দেখতে পায়নি। উত্তেজিতভাবে সে বলতে লাগল, 'কাল টাইপ্ পাওয়া যাবে। বুঝেছ?' তারপর হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, 'মিশো! তুমি! আর আমাদের চিন্তা নেই! দেনিস, আমরা বেঁচে গেলাম। বুঝেছ?'

ক্লদের কাছে মিশোর আগমনের অর্থ তাদের উদ্দেশ্য সাফল্যযুক্ত হওয়া। তার

উল্লাস মিশোকে আত্মশক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করল। সে বুঝতে পারল যে তারা তার অপেক্ষাতেই ছিল এতদিন, নিজের জন্যে লজ্জিত বোধ করতে শুরু করেছিল সে। আর দেনিস ভেবেছিল যে দেনিসের জন্যেই মিশোর এই লজ্জা।

মিশো বলল, 'আমরা আবার কাজ শুরু করে দেব। ক্লদ আমাদের সঙ্গে থাকাতে ভাল হয়েছে। আর ক্লদ এটা তোমার মস্ত কৃতিত্ব যে তুমি টাইপ যোগাড় করতে পেরেছ, এবার আমরা ইস্তাহার ছাপাতে পারব।'

'বড় জোর পাঁচশো।' দেনিস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল।

'এই দিয়েই শুরু করব। আর পাঁচশোই বা মন্দ কি! আমাদের আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। লুমানিতে পাঁচ লক্ষ বিক্রী হত, কিন্তু তবু আমরা হেরে গেলাম। এই সময়টুকুর জন্যে যে ক্ষতি হল, তা পূরণ করে নিতে হবে আমাদের। ভাল লোক যারা আছে, তারা সবাই আজ বিভ্রান্ত। দুষ্কৃতিকারীদের জয় হচ্ছে। দোরিওর কাগজটা আজ দেখলাম। লোকটার ময়ূরের মত আত্মাভিমান। মনে হবে যেন ও-ই পারী অধিকার করেছে। এ সব কিছু মেনে নিতে হবে। ফ্যাশিজ্‌ম-এর যুগে বেঁচে থাকার অর্থটা কি বুঝতে পার? ইতিহাসের একটা যুগ হিসাবে এর ওপর হাজার হাজার বই লেখা হবে। এই একশো বছরের মধ্যেই...কিন্তু আমরা এই যুগেই বেঁচে থাকব এবং জয়লাভও করব। আমি বলছি দেনিস, জয় আমাদের হবেই, ঠিক তাই!'

মিশোর হাতটা চেপে ধরল দেনিস। 'মিশো!' বলল সে।

দেনিসের মনে হল, এই তার পূর্ব পরিচিত মিশো। তার মানে সেও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে পারী। এবং এ সব সত্ত্বেও বেঁচে থাকা সম্ভব। বেঁচে থাকা এবং জয়লাভ করা...

ক্লদ বলল, 'ওদের শক্তি কিন্তু বিরাট। প্রতি রাত্রে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হচ্ছে। এখন ওরা চলেছে দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের দিকে। ইংলণ্ড জয় করতে চায় ওরা।'

মিশো হাসল, 'ওরা চায় কিন্তু দেখতে হবে ওরা পারবে কিনা। ওরা কি পারী জয় করেছিল? পারীকে সোজাসুজি ওদের গ্রাসে তুলে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক চার্চিল পেতাঁ নয়। আমি বলছি না যে জার্মানদের বিরাট শক্তি নেই। আমি দেখেছি কী প্রচুর পরিমাণ ট্যাঙ্ক আছে ওদের। আর আছে ওদের সংযম শক্তি। ঠিক জার্মান রীতিতেই সব কিছু চলে। কিন্তু ওদেরও প্রতিদ্বন্দ্বী

আছে, থাকবেই। হয়ত ইংলণ্ডে কিংবা অন্য কোন জায়গায়। কোথায় আমি জানি না, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মুখোমুখি হতেই হবে ওদের। আমাদের শক্তি অনেক বেশী।

দেনিস চোখ তুলে তাকাল—'কি করে আমাদের শক্তি অনেক বেশী?'

'হিসেব করে দেখ। ইংলণ্ড—অর্থাৎ, নৌশক্তি, রাজকীয় বিমানবাহিনী, জনসাধারণ। আমেরিকা। তারপর আছে বিজিত দেশগুলি। এক এক করে ধর—নরওয়ে, হলাণ্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া। দেখ, গুণে গুণে সাতটা হল। এই সব দেশের সেনাবাহিনী নেই বটে কিন্তু দেশের জনসাধারণও একটা বড় শক্তি। আর তুমি কি মনে কর জার্মানীতে আমাদের নিজেদের লোক নেই? আছে। দেখ না কি হয়। আর আসল শক্তি হচ্ছে রাশিয়া।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে তো অনাক্রমণ-চুক্তি আছে,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্লদ বলল।

'তাতে কি হয়েছে? দেখো, হিটলার নিশ্চয়ই ওদের আক্রমণ করবে। তুমি মনে কর, এতবড় শক্তির অস্তিত্ব হিটলার মেনে নেবে? এ কথা তো শিশুও বোঝে। রাশিয়ানরা ওদের খানিকটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। লালফৌজকে আমরা দেখতে পাব দেনিস। নিশ্চয়ই পাব।'

'বল, ঠিক তাই!' দেনিস হাসল।

'নিশ্চয়ই বলব—ঠিক তাই!'

কাগজ আনবার জন্য ক্লদ বেরিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে মিশোর কথাগুলো সে ভেবে দেখল। মিশো যখন বলেছে না হয়ে যায় না। অর্ধ-মৃত পারী শহরের নোংরা পরিত্যক্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনের খুশিতে ক্লদ হাসতে লাগল। হাসল জার্মান সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে। আসলে সে কিন্তু ওদের দেখছিল না, দেখছিল অন্য কিছু—শাদা কুয়াশার মাঝখানে ছোট একটা লাল তারা। ক্রম-বর্ধমান অসুখের জন্যে এবং নানা দুঃখকষ্টে রোগা শুকিয়ে-যাওয়া শরীর, তবুও শিশুর মত খুশি হয়ে উঠল সে। তারপর পকেট থেকে এক টুকরো খড়ি বার করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সামনের ধূসর দেওয়ালের গায়ে লিখল, 'হিটলার শুরু করেছে, স্টালিন শেষ করবে।' লেখাটা শেষ করে চোখ টিপল নীল এ্যাসফল্টের ওপর বসে থাকা কালো পাখীটার দিকে তাকিয়ে।

দোকানে লোক নেই। মিশো এবং দেনিস পরস্পরের বাহুবেষ্টনে নিঃশব্দে

বসে আছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেনিস বলল, 'পারীর যে কি অবস্থা তা তুমি জান না। কাল একজন জার্মানকে দেখলাম রিভলবার দিয়ে একজন শ্রমিকের মাথায় বাড়ি মারতে। লোকটি পড়ে গেল, কিন্তু জার্মানটা ফিরেও তাকাল না। লণ্ডন বেতার শুনেছে বলে জেমিএকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে। দু দিন সমানে ওর ওপর অত্যাচার চালিয়েছে ওরা। একজন জার্মান অফিসার এসে মারিকে বলল,—'তোমার বাবার জামাটায় রক্ত লেগে গেছে। একটা নতুন জামা দাও।' নতুন জামা এনে দেবার পর অফিসারটি জামাটা নিয়ে চলে গেল। তারপর এক সময়ে ফিরে এসে বলল—তুমি এখনো রয়েছ? কার জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি? তোমার বাবা অনেক আগেই ইংরাজদের স্বর্গে চলে গেছেন। মিশো, ওরা কি মানুষ?'

'না। ওরা ফ্যাশিস্ট। আমিও ঠিক এমনি দৃশ্য দেখেছি। একটি শিশুকে ওরা খুন করেছিল। আচ্ছা ও কথা বরং থাক। কিন্তু আমি বলছি দেনিস, সুখের দিন আসছে, অত্যন্ত সুখের দিন! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? জয়লাভ যে আমাদের নিশ্চিত সেটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে। রাত্রির পর যেমন দিন, শীতের পর যেমন বসন্ত—তেমনি সহজ সত্য এটা। এ না হয়ে পারে না। আমাদের পক্ষে বিরাট জনসাধারণ, জীবন দিতেও তারা প্রস্তুত। কিন্তু ওদের দলে কারা? ডাকাত কিংবা বদমাইশ। নিশ্চয়ই আমরা জিতব! তারপর আসবে সুখের দিন। সেই দিনের জন্যেই উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই! মোটা, সাধারণ সুখ, সামান্যতম সুখও যদি হয় তবুও—সহজভাবে বেঁচে থাকা, পায়ের শব্দ শুনেই ভয় না পাওয়া, সাইরেনের আর্তনাদ না শোনা, ছেলেমেয়েদের আদর করা আর ভালবাসা—যেমন ভালবাসা আছে তোমার এবং আমার মধ্যে ...সুখের দিন আসবে...'

গম্ভীর স্বরে বরদান করবার মত দেনিস বলল, 'তথাস্তু।'

৪৪

সকালটা বেশ গরম। দীর্ঘ সময় আঁদ্রে কাটাল স্টুডিওর ভেতর। বাইরে যেতে ভয় হচ্ছিল। গতকাল লরিএ নাকি খুন হয়েছে। কে যেন চিৎকার করে বলেছিল 'ইহুদী!' আর তারপরেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে লরিএর অন্ধ চোখের ওপর থেকে কালো ব্যাণ্ডেজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

সারা রাত আঁদ্রে স্টুডিওর ভিতরে পায়চারি করেছে। আর বারবার প্রশ্ন করেছে নিজেকে—কি লাভ এই পাহাড়ের জন্যে যুদ্ধ করে? কি লাভ এই বন্ধুত্বে? আঁদ্রে পার পেয়েছে, কিন্তু লরিএকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। একচক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে সে এই ভয়ংকর শহরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। ভয়ংকর এবং বিশ্বাসঘাতক।

কিন্তু তবুও আঁদ্রে কেন আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল? কেন সে ঘুরে বেড়াতে লাগল এই ঘৃণ্য শহরের রাস্তায় রাস্তায়?

সমস্ত বিরূপ মনোভাব ছাপিয়ে তার প্রিয় শহরের সৌন্দর্য আবার তাকে মুগ্ধ করেছে। এত কলঙ্ক সত্বেও পারী এখনো সুন্দর। আঁদ্রের হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ, কিন্তু চোখে সে যা দেখছে তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারছে না। আইল স্যঁা লুই-এর সারি সারি থমথমে বাড়ী, লেথ-এর মত চিররহস্যময়ী সীন নদীর জল, অস্পষ্ট বিবর্ণ আকাশ—অভিভূত হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। খানিকটা সান্ত্বনাও পেল যেন। মনে মনে সে ভাবল, এ ছাড়াও অন্য বহু জিনিস আমরা দেখেছি। আমরা আছি এবং আমরা থাকব। আমরাই হলাম লুটেশিয়া, জাহাজ ও পারীর প্রাণকেন্দ্র।

শাতেলে পর্যন্ত সে হেঁটে গেল। অদ্ভুত লাগছে তার—এত নিঃশব্দ রাস্তায় সে অভ্যস্ত নয়। মোটরগাড়ী অদৃশ্য। লোক হাসে না, চাপা গলায় কথা বলে। রু দ্য রিভলির খিলানের নীচে ধপ্ ধপ্ শব্দ হচ্ছে—জার্মান সৈন্যেরা ঢুকছে দোকানে, রেস্তোরাঁয়, এমনভাবে পা ঠুকছে যেন এটা কুচকাওয়াজের ময়দান। মেয়েদের চেহারা আগের চেয়েও ফ্যাকাশে। হয় তারা প্রসাধন করে না, কিংবা সত্যিই তাদের শরীর খারাপ। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে আরও বেশী সাদাসিধে হতে, আরও কম নজরে পড়তে, আরও নগণ্য হতে। কীটের মত, আঁদ্রে ভাবল। যেন আত্মাহীন শরীর—পারীর কঙ্কাল। কিন্তু পারী এ নয়, এ অন্য এক বিদেশী শহর।

হঠাৎ শিঙার শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। প্লাস দ্য লোপেরা-তে যে সে পৌঁছে গেছে তা এতক্ষণ টের পায়নি। সবুজ-ধূসর পোষাক পরা জার্মান বাদকদল রঙ্গমঞ্চের সিঁড়ির ওপর বসে শিঙা বাজাচ্ছে। জার্মান সামরিক বাদ্যে কোথায় যেন ভীষণ রকমের একটা দৈন্য আছে—অনেকটা খিলানের নীচে ভবঘুরেদের অবসর যাপনের মত: কুচকাওয়াজের তালে তালে বাঁধা জীবনের পদক্ষেপ। কাফের বারান্দায় বারান্দায় পানাহাররত জার্মান অফিসার, তাদের ঘিরে রয়েছে

বাহারে সাজপোষাক পরা মেয়ের দল। কিন্তু ঠিক আগের মতই পারীর আকাশ।

একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আন্দ্রে দাঁড়াল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে বুঝতে পারল না আসলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে। আবার কেমন একটা ভোঁতা আচ্ছন্নভাব তাকে পেয়ে বসল। কতগুলি টুকরো টুকরো অসংলগ্ন ছবি ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে—এক চোখে লেন্স লাগান একজন অফিসার, ফোয়ারার জলকন্যা মূর্তি ও তার হাতের শূন্য পাত্র, তুইয়েরিসের পথে লম্বা লম্বা ঘাস, আর একটা পাহাড়, সেই যে পাহাড়ে...

একটি মেয়ের চিৎকারে সে সজাগ হয়ে উঠল। মেয়েটি সান্ধ্য কাগজ বিক্রী করছিল। বিরক্ত হয়ে সে সরে যেতে বলল মেয়েটিকে। অপরাধীর মত চাপা গলায় ফিসফিস করে মেয়েটি বলল, 'আমি জানি। কি করব, বাড়ীতে আমার একটা ছোট্ট বোন আছে।'

মেয়েটিকে একটি মুদ্রা দিয়ে কাগজটা সে তুলে ধরল। তারিখটার ওপর চোখ পড়তেই কিন্তু সে না হেসে থাকতে পারল না। ১৪ই জুলাই। বোধ হয় এই জন্যেই জার্মানরা শিঙা ফুঁকছে। আজ যে ছুটির দিন তা কারো মনে নেই। কেউ দাঁড়িয়ে আছে দুধের লাইনে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে।

একদিন এই পারীই বাস্তিল কারাগারকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল···

আর একটা রাত্রির কথা তার মনে পড়ল—নাগরদোলা, চকচকে নীল হাতী, বাদাম গাছ আর চীনে লণ্ঠনের ঝাড়। জিনেৎ এখন কোথায়? সে কি এই অভিশপ্ত শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে? পরিচিত ঘরবাড়ী কি তার চোখে পড়ছে না? বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হয়ে বারবার দেখা হচ্ছে সবুজ-ধূসর জার্মানদের সঙ্গে? না কি সে পালিয়েছে কোন নিরাপদ জায়গায়? কিন্তু এত দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ কোথায়? নিরাপদ জায়গা কি আছে? 'প্রতারিত আমি তাই মৃত্যুপথগামী!' তখনকার দিনে এটা ছিল বিজ্ঞাপনের ভাষা। কেউ বুঝতে চায়নি যে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে রাত্রির আকাশের তলায় বসে বসে কেঁদেছে—আর রাস্তায় ধুলো ও রক্তে কলঙ্কিত, মৃত ফ্রান্সেরও কান্না উঠেছে সেই সঙ্গে সঙ্গে।

কথাগুলো বলতে বলতে সে স্টুডিওর সিঁড়ি দিয়ে উঠে জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সামনে রু শেরস্ মিদি। মার্চ করে চলেছে জার্মান সৈন্যেরা।

যোসেফিন তাকে বলেছে, 'রেস্তোরাঁটা আবার খুলব ভাবছি। খেয়ে বাঁচতে হবে তো।' কথাটা বলে সংকুচিত হয়ে সে তাকিয়েছে আঁদ্রের দিকে—আঁদ্রে যে কথা বলেনি সেটা যেন তার পক্ষে অপমানজনক। হ্যাঁ, এবার সেকে ও জার্মানদের জন্যে খাবার তৈরী করবে। মুচিরা সেলাই করবে জার্মানদের জুতো। ফুলের দোকানের মেয়েটি মারা যাবে আর সে জায়গায় আর একজন এসে ফুলের তোড়া তুলে দেবে এক চোখে লেন্স লাগানো এক জার্মান অফিসারের হাতে। কিন্তু রাস্তাগুলো পারীর রাস্তাই থাকবে: এই চক্র থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। দেওয়ালের ওই হুকটার গায়ে দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। ঐ ধূসর দেওয়ালের গায়ে কালো বিন্দুটা থেকে আঁদ্রে কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারল না।

হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল সে: যেন কেউ তাকে কোন একটা অন্যায় করতে দেখে ফেলেছে। দরজার কাছাকাছি পৌঁছবার পর তার মনে চিন্তাটা এল—কে হতে পারে? যদি জার্মানরা হয়.. কিন্তু তার চিন্তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

স্টুডিওর ভেতরে ঢুকল একজন জার্মান; সবুজ ধূসর পোষাকটা দেখে আঁদ্রে হাসল।

বলল, 'যাক, ভালই হয়েছে। কোন্ দিকে যেতে হবে। সঙ্গে আমি কিছু নেব না।'

জার্মানটি বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন না? মাদাম কোয়াদের বাড়ীতে আমি থাকতাম। আপনার আঁকা দৃশ্যপটগুলো আমার ভারী ভাল লাগত। 'তামাকখোর কুকুরে-এ আমাদের পরিচয় হয়েছিল।'

জার্মানটি করমর্দন করতে চাইল, কিন্তু আঁদ্রে হাত বাড়াল না।

'এবার মনে পড়েছে,' আঁদ্রে বলল, 'মাছ সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে। আপনি হচ্ছেন...কি যেন কথাটা ভুলে গেছি।'

'মৎস্যবিজ্ঞানবিদ।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আপনি বলেছিলেন পারী ধ্বংস হবে।'

'এখানে থাকবার সময় আপনার আগ্রহটা মাছের চেয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতেই বেশী ছিল হয়ত। বার্লিনের গুপ্ত খবর আপনার অজানা ছিল না। বেশ খুশি হয়েছেন তো? একথা সত্যি যে আপনারা পারী ধ্বংস করেননি।' জার্মানটির আরও কাছে সে সরে এল, 'কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে পারী আপনারা

অধিকার করতে পেরেছেন ? ভুল, মঁশিয়, ভুল, এটা আপনাদের বিকৃত কল্পনা। পারী আপনাদের মুঠোয় নেই। আপনি হয়ত বলবেন যে ভবিষ্যতে আসবে। তাও আমি স্বীকার করি না। যোসেফিন তার দোকান খুলেছে, একে একে ফিরে আসছে সবাই—কিন্তু পারী নেই। পারীকে আপনারা ফিরে পাবেন না। পারীর অস্তিত্ব মুছে গেছে। একেবারে মুছে গেছে। যাক্ এসব কথা! চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন।'

'কোথায় নিয়ে যাব ?'

'জানি না। আপনিই ভাল জানেন। অধিনায়কের আপিসে, কিংবা বদ্ধ ঘরে, কিংবা পাতালে—যে চুলোয় খুশি।'

জার্মানটি একটিও কথা বলল না। আঁদ্রে সমানে গালাগালি দিয়ে চলল। অবশেষে জার্মানটি বলল, 'এত মেজাজ খারাপ করছেন কেন ?'

'মেজাজ খারাপের প্রশ্নই ওঠে না। প্রথমত—আপনাদের ট্যাঙ্ক আছে। দ্বিতীয়ত—বোমারু বিমান, তৃতীয়ত—মেশিনগান, চতুর্থত—টমিগান। আর পঞ্চমত—আপনাদের ওই মোটা মোটা মাথা। আমার কথা যদি বলেন তো ওই হৃকটা আছে। নিয়ে যাবেন তো চলুন, নইলে আপনার গলা টিপে ধরব।'

'আপনাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া বা না যাওয়া আমার কাজ নয়। আমি কেন যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তা আমি নিজে জানি না। হয়ত আপনাকে মনে আছে বলেই ভেবেছিলাম যে দেখা করলে মন্দ হয় না। আজ লেফটেনেণ্ট আমাকে বলছিল যে আমি নাকি জার্মান হিসেবে পরিচয় দেবার অযোগ্য। কী কাণ্ড বলুন তো—কাল হয়ত ওরা আমাকে গুলি করে মারবে।'

'তাই নাকি ?' আঁদ্রের গলায় বিস্ময়ও ছিল না, সহানুভূতিও ছিল না। ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে সে কাঁধঝাঁকুনি দিল। যেখানে মৃত্যুর জন্যে সে প্রতীক্ষা করছিল, তার পরিণতি হল কিনা এক মৎস্যবিজ্ঞানবিদের ব্যক্তিগত অসন্তোষে। আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, আপনার আপত্তি কিসে ? খাবার ? না চ্যানেল পার হতে গেলে আপনার মাছ আপনাকে খেয়ে ফেলবে ?'

'কি করে বোঝাব জানি না। কিসে আমার আপত্তি জানেন ? আমার আপত্তি পারীর জার্মানদের সম্পর্কে। এই ফৌজী সাজ পরে যে আপনার স্টুডিওতে আমাকে আসতে হয়েছে, তাতেও আমার আপত্তি।'

'তাই নাকি! তাহলে আপনি তো দেখছি রীতিমত সৌন্দর্যরসিক! ছাই রঙা-ধূসর রং, আরো কত কি! কিন্তু মঁশিয়, আপনি কি এটুকুও বুঝতে পারেন না যে আমি এই ফ্রান্সেরই লোক?'

'নিশ্চয়ই বুঝি। আর বুঝি বলেই মন খুলে কথা বলতে পারছি না। আমি মনে করতাম, আমরা একই সংস্কৃতির মানুষ। কিন্তু এখন দেখছি আমাদের ভেতর আকাশ পাতাল তফাৎ। এই তফাৎ যে কি করে ঘুচবে আমি জানি না।'

'আমিও না।' আঁদ্রের গলার স্বর একটু কোমল হল, 'রক্ত দিয়ে এই ফাঁককে ভরাট করতে হবে। রক্ত ছাড়া এখানে এই তফাৎ দূর করা অসম্ভব।'

'যথেষ্ট রক্তপাত কি হয়নি?'

'প্রচুর হয়েছে। কিন্তু ঠিকভাবে হয়নি। আচ্ছা, এবার আপনি যান।'

'জানি আমাকে যেতেই হবে। এ সমস্তই খাপছাড়া। এখানে আমার আসাটাই বোকামি হয়েছে। এবং বোকার মতই একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। কেন জানি না প্রশ্নটা আমি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। প্রশ্নটা ব্যাকরণের। আচ্ছা, এই রাস্তাটার নাম শেরস-মিদি—তার মানে, দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়। কেন?'

'তার কারণ এক সময়ে এই রাস্তার লোকদের ওই নামেই ডাকা হত। কোন কিছু খরচ না করে কোথায় খাবার পাওয়া যায় তারই প্রতীক্ষায় থাকতে হত তাদের। ঠিক আপনাদের হিটলারের মত। কিন্তু নামটা বেশ ভাল। দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়। শুধু এই রাস্তাটাই কোনদিন দ্বিপ্রহরকে চায়নি। এখানকার লোকেরা জানলায় খড়খড়ি বন্ধ করে নরম পালকের লেপ গায়ে দিয়ে আরামে ঘুমোত। রাত্রির প্রতীক্ষায় ছিল এই রাস্তা। আর এখন তো আপনারাই এসেছেন।'

জার্মানটি বলল, 'আপনি কি মনে করেন যে এজন্যে আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। এভাবে বাঁচা যায় না। প্রত্যেকে আমাদের ঘৃণা করে। কাল আমি রু মঁজ দিয়ে হাঁটছিলাম। একটি স্ত্রীলোক আসছিল কিন্তু আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল—যেন আমি স্বয়ং মৃত্যু। ব্যক্তিগতভাবে আমি আজ পর্যন্ত কোন লোককে খুন করিনি কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এ কথাও আমি বলতে পারতাম যে হিটলার দোষী। সেটা সব চেয়ে সহজ কাজ। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়, আমারও দোষ আছে। প্রত্যেককেই সিদ্ধান্ত

নিতে হবে। আমিও সেই চেষ্টাই করব। আচ্ছা আসি, আবার দেখা হবে।'

'বিদায়। কাল হয়ত আপনি সত্যিই খুব ভাল লোক হয়ে উঠবেন। কিন্তু তখন আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আজকের দিনে সৌজন্যতাকে প্রমাণ করতে হবে রক্ত দিয়ে। এমনি সময়েই আমরা বাস করছি। সমস্তই দুর্বোধ্য। আপনি কেন এখানে এসেছেন? কোন অর্থ হয় না! আপনি যদি কমিউনিস্ট হতেন তো অন্য ব্যাপার। ওরাই হয়ত কিছু করতে পারে। আর একটু হলে এখানে ওদেরই জয়লাভ হত, কিন্তু এখন তেদা ও আপনাদের লেফটেনেণ্ট রয়েছে, কি করতে চান আপনি? এখানে আপনি একা। আমিও তাই। আর আমরা দুজনে মিলে দুই হই না, শূন্য হই। জীবন আমাদের বিরুদ্ধে, আপনি যদি ভাল লোক হন তো আপনার প্রতি আমার অভদ্র আচরণের জন্যে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি ছিলেন লুবেকের জার্মান, একটু মাথা-পাগলা গোছের, কালভাদো পান করতেন। আর এখন আপনি ধূসর-সবুজ পোষাকী সৈন্য। অবশ্য এ সমস্তই পারীর নিজস্ব সমস্যা।'

জার্মানটি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আঁদ্রে তার কথা ভুলে গেল—যেন কেউ কখনো আসেনি। কয়েকবার সে পায়চারি করল স্টুডিওর ভেতরে। জানলায় নীল গোধূলির আভাস। আর জানলাটার ঠিক উল্‌টো দিকে একটা দৃশ্যপট। ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে আঁদ্রে তাকিয়ে দেখল : নাগরদোলা, বাদাম গাছ, লণ্ঠন, আর দূরের ছায়া। সেদিনটাও ছিল ১৪ই জুলাই। সেদিন পর্যন্ত হেসেছিল জিনেৎ, নাচ চলেছিল পারীর রাস্তায় রাস্তায়, মিছিল বেরিয়েছিল ঝাণ্ডা উড়িয়ে। আর ছিল আশা। সে এক অন্য জীবন। চমৎকার আঁকা হয়েছে ছবিটা। এই তার শ্রেষ্ঠ ছবি। আর এই ছিল পারী। আর এই পারীই এখনো আছে। ওরা মিউজিয়াম পুড়িয়ে ফেলবে, ছবি নষ্ট করবে—কিন্তু পারী থাকবে ঠিক আগের মতই।

হাসছিল আঁদ্রে। তারপর এগিয়ে গেল জানলার কাছে। রু শেরস্ মিদির জানলার খড়খড়িগুলো তেমনি শক্তভাবে বন্ধ করা, বাড়ীর সামনে জানলার খড়খড়িতে তেমনি কালো কালো দাগ। ওপাশে চিলেকোঠার জানলা থেকে নুয়ে পড়েছে একটা শুকিয়ে যাওয়া ফুল। ঘুরে বেড়াচ্ছে উদাসী বেড়ালগুলো, কাঁদছে ফুলের দোকানের স্ত্রীলোকটি, চিৎকার করছে একটি

নবজাত শিশু। রু শেরস্ মিদি—'দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়'...'এবং এই দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষাতেই থাকব আমি,' ভাবল সে, 'দ্বিপ্রহর আসবেই—আকাশে আলোর উৎসব—মধু, ফুল, আসমানী রং—দিনের পারী...'
লাউড-স্পীকারের গর্জন আঁদ্রে যেন শুনতেই পেল না: 'বাড়ী ফিরে যাও! সময় হয়েছে। সময় হয়েছে!'

আগস্ট ১৯৪০—জুলাই ১৯৪১